কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম
১৬
রকিব হাসান

ভলিউম ১৬

তিন গোয়েন্দা

৫৮, ৫৯, ৬০

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
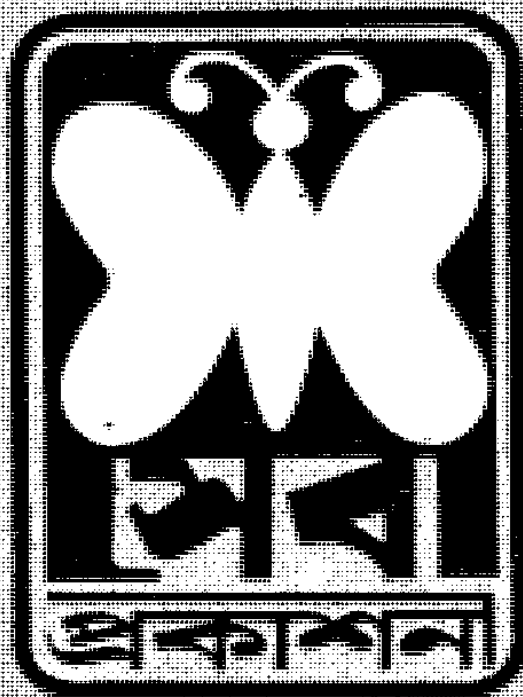
সাতান্ন টাকা

ISBN 984-16-1373-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-16
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-

তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+টুটকি গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪১/-

প্রাচীন মূর্তি
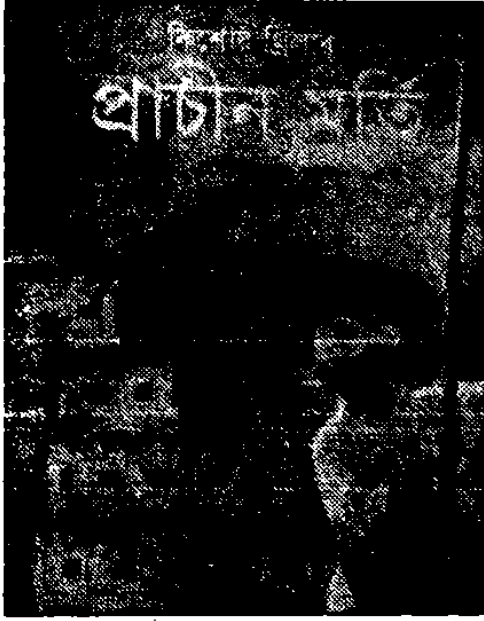
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯২

ভিকটর সাইমনের পিছু পিছু রকি বীচের উকিল মিস্টার নিকোলাস ফাউলারের অফিসে এসে ঢুকলো কিশোর আর রবিন।

'হাল্লো, ভিকটর!' উঠে দাঁড়ালেন ফাউলার। হাত বাড়িয়ে দিলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস্টার সাইমনের দিকে। 'তারপর কেমন আছো? কিশোর, রবিন, তোমরা কেমন?'

'ভালো, স্যার,' ঘাড় কাত করে জবাব দিলো কিশোর।

'তার মানে হাতে সময় আছে তোমাদের,' রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন উকিল সাহেব। 'কেস নিতে পারবে।'

'পারবো,' রবিন বললো। 'মিস্টার সাইমনের কাছে সে-খবর শুনেই তো এলাম।'

'গুড। বসো।'

ডেস্কের সামনে তিনটে চেয়ারে বসলো তিনজনে। ফাউলার বসলেন ডেস্কের ওপাশে তাঁর আগের জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'চা? কফি?'

মাথা নাড়লো রবিন আর কিশোর। খাবে না। মাথা ঝাঁকালেন সাইমন। 'কফি।'

বেল বাজিয়ে খানসামাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন উকিল, 'দু'কাপ কফি।'

ভূমিকা বিশেষ করলেন না তিনি। সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসাকে দেখছি না?'

'ও গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত,' জবাব দিলো কিশোর। 'কোথায় নাকি পুরনো গাড়ির পার্টস পেয়েছে, আনতে চলে গেছে।'

'হুঁ। যাই হোক, তোমাদের কেন ডেকেছি, জানো নিশ্চয়?'

'শুধু জানি, একটা কেস ঠিক করেছেন আমাদের জন্যে। আর কিছু না। মিস্টার সাইমনকে নাকি ফোন করেছিলেন। তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। দারুণ রহস্যময় একটা কেস। সেটার সমাধান করতে হবে। আশা করি পারবে তোমরা;' মাথার টাকে হাত বোলালেন উকিল সাহেব। ছোটখাটো মানুষ। উঁচু ডেস্কের ওপাশে তাঁর শরীরের বেশির ভাগটাই অদৃশ্য। 'মিস্টার চেস্টার রেডফোর্ডের মৃত্যুর খবর নিশ্চয় কাগজে পড়েছো।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর রবিন।

সাইমন বললেন, 'চিরকুমার ছিলেন যদ্দূর শুনেছি। লোকে বলে মাথায় ছিট ছিলো। রকি বীচে এসেছেন বেশিদিন হয়নি।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'একটা কেসে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। হাতির

দাঁতের একটা মূল্যবান মূর্তি হারিয়ে গিয়েছিলো তাঁর। খুঁজে দিয়েছিলাম। মেরিচাচীর বাবার বন্ধু ছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ ছিলো না তার। দূর সম্পর্কের দু'চারজন ভাইটাই বাদে। খামখেয়ালি লোক ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন।'

'অনেক কিছুই জানো দেখছি,' উকিল বললেন। 'উইলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে গেছেন। তবে একটা বিশেষ রহস্যের সমাধান করতে না পারলে কেউই কিছু পাবে না।'

ফাউলার জানালেন, নিজের হাতে উইল লিখেছেন রেডফোর্ড। তবে তাতে আইনগত কোনো বাধা নেই। সাক্ষী ছিলো দু'জন।

'দু'জনেই তাঁর আত্মীয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কাজেই রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য ওরা করবে না। তাতে নিজেদের ক্ষতি,' হাসলেন উকিল। 'তবে আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পুরানো রহস্য খুঁচিয়ে বের করে সমাধান করে ফেলতে পারো। আর এটা তো নতুনই। রহস্যটা কি জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছো, না? দাঁড়াও, আগে উইল থেকে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়ি...'

ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো খানসামা। দুটো কাপ টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'নাও, চা নাও,' সাইমনকে বললেন উকিল। নিজে একটা কাপ তুলে নিলেন। গোটা দুই চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন কাপটা। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা দলিল বের করলেন। পড়তে শুরু করলেন, 'আমি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, মূল্যবান অ্যাজটেক যোদ্ধাকে তারই হাতে দেয়া হবে, যে এসে প্রমাণ করতে পারবে যে সে ওই যোদ্ধার সত্যিকারের বংশধর।'

ফাউলার থামলে রবিন বলে উঠলো, 'এইই? কারো নামটাম নেই?'

'না। আরেক জায়গায় তোমাদের চারজনের নাম লেখা রয়েছে,' বলে শেষ পাতাটা ওল্টালেন ফাউলার। 'সাইমন আর তিন গোয়েন্দার নাম।' পড়লেন, 'আমার অনুরোধ থাকলো রকি বীচের গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন আর তিন গোয়েন্দা কিশোর পাশা, মুসা আমান এবং রবিন মিলফোর্ড যেন অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করে তার সম্পত্তি তাকে প্রদান করে। তদন্তের জন্যে যতো খরচ হবে, সব দেয়া হবে আমার এস্টেট থেকে। কাজ শেষে তাদের পারিশ্রমিকও দেবে এস্টেট। আর যতোক্ষণ অ্যাজটেক যোদ্ধাকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া না হয়, ততোক্ষণ আমার কোনো উত্তরাধিকারী আমার সম্পত্তির একটা কানাকড়িও পাবে না।'

উইলের দুটো অংশ আরেকবার পড়তে বললেন সাইমন। মন দিয়ে শুনলেন। ভ্রূকুটি করলেন। অবাক হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে কোনো সূত্র আছে, নিক? যা দিয়ে শুরু করা যায়?'

'না। যে ক'জন উত্তরাধিকারী আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি আমি নানাভাবে। মিস্টার রেডফোর্ডের পরিচিত যাদেরকে চিনি, তাদেরকেও খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছি। কেউ কিছু বলতে পারেনি। তবে উইলে একটা বাক্য রয়েছে, এটা সূত্র হলেও হতে পারে। এই যে, লেখা আছেঃ গোয়েন্দাদেরকে অবশ্যই পিন্টো

আলভারোকে খুঁজে বের করতে হবে।'

দলিলের একটা কপি দেয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন সাইমন। মাথা ঝাঁকিয়ে উকিল বললেন, 'অবশ্যই। চাইতে পারো ভেবে ফটোকপি করিয়েই রেখেছি,' বের করে দিলেন তিনি। 'এই নাও। যেসব জায়গায় তোমাদের কথা লেখা আছে, তোমাদের প্রয়োজন হবে বুঝেছি, দাগ দিয়ে রেখেছি।'

দলিলটা মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন সাইমন।

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'নাম শুনে তো মনে হচ্ছে স্প্যানিশ, লোকটা কে বলতে পারবেন?'

'না,' জবাব দিলেন উকিল।

অ্যাজটেক যোদ্ধা কে, কি তার সম্পত্তি, এ-ব্যাপারে কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করলো রবিন। কিছুই বলতে পারলেন না উকিল।

'পুরানো কোনো মূর্তি-টুর্তি হতে পারে,' আন্দাজ করলো কিশোর।

'কি জানি। মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে তেমন কোনো মূর্তি নেই,' ফাউলার বললেন।

'স্টাফ করা কোনো পাখি বা জন্তু আছে? ডানাওয়ালা সাপ পবিত্র ছিলো অ্যাজটেকদের কাছে।'

'ওরকম কিছুই পাইনি মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে,' ফাউলার বললেন। 'কোনো ছবিও না। এমন কিছু চোখে পড়েনি, অ্যাজটেক যোদ্ধার সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে।'

জটিল এবং মজার একটা রহস্য। আগ্রহী হলেন সাইমন। বললেন, 'নিক, কেসটা নিলাম। আমি আর তিন গোয়েন্দা মিলে কাজ করলে সমাধান করে ফেলতে পারবো। সময় লাগবে না।'

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। বেশ কিছুদিন ধরে রহস্য না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ করে এরকম একটা পেয়ে যাবে, ভাবতেও পারেনি। পুলকিত হয়ে উঠেছে। সাইমনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন থেকে কাজ শুরু করবো, স্যার?'

'পারলে এখন থেকেই করো।'

'তাহলে রবিনকে নিয়ে একবার রেডফোর্ড এস্টেটে যেতে চাই, এখুনি। দেখা দরকার। কোনো সূত্র মিলতে পারে।'

উকিল বললেন, তিনি ওদেরকে নিয়ে যেতে রাজি আছেন। সাইমন জানালেন, যেতে পারবেন না। আরেক জায়গায় জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দরকার হলে পরে যাবেন রেডফোর্ড এস্টেটে। তাছাড়া কিশোর যখন যাচ্ছে, তাঁর নিজের আর যাওয়ার তেমন প্রয়োজন আছে বলেও মনে করছেন না।

সাইমন চলে গেলেন তাঁর কাজে। দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এস্টেটে রওনা হলেন ফাউলার। শহর ছাড়িয়ে চলে এলেন পার্বত্য এলাকায়। একটা পথের পাশে বিরাট এক প্রাইভেট এস্টেট ছিলো, সেটা ভেঙে এখন হাউজিং ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। এরকম করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন রেডফোর্ড। তাঁর রহস্যের সমাধান হলেই এই হাউজিং সোসাইটির মালিক হয়ে বসবে উত্তরাধিকারীরা।

অনেক টাকার মালিক। কিশোর আর রবিনকে এসব কথা জানালেন উকিল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে মোড় নিলেন ফাউলার। পুরানো পাইনের সারির ভেতর দিয়ে চলে গেছে একটা পথ। সেই পথ ধরে চলে এলেন বিশাল এক বাড়ির সামনে। ভিকটোরিয়ান আমলের বাড়ি। চারপাশ ঘিরে পাতাবাহারের বেড়া গাড়িবারান্দায় গাড়ি রেখে নামলেন উকিল। দুই গোয়েন্দাও নামলো

চওড়া আর অনেক উঁচু সিঁড়ি বেয়ে সামনের বারান্দায় উঠে এলো তিনজনে। সদর দরজার হুড়কো খুললেন ফাউলার। ছেলেদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরটা আকর্ষণীয়। চকচকে পালিশ করা মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। বড় বড় জানালায় টকটকে লাল মখমলের পর্দা। ছাতের সামান্য নিচ থেকে শুরু হয়েছে, নেমে এসেছে মেঝের কাছাকাছি—এতো বড় জানালা। অনেক বড় একটা ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত এক টেবিল, ঘরের এক কোণে।

'ব্যাচেলরদের বাড়ি যা হয় তাই,' ফাউলার বললেন। 'খোঁজো সূত্র খুঁজতে খুঁজতেই বুঝে যাবে, কিভাবে বাস করতে পছন্দ করতেন মিস্টার রেডফোর্ড। বাড়িঘরের কাজ করার জন্যে অনেক লোক রেখেছিলেন তিনি। তাদের মাঝে মহিলাও ছিলো। তবে কোনো কিছুতেই যাতে কোনো মেয়েলী ছাপ না পড়ে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন তিনি। তেমন কিছু করতে গেলেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতেন মহিলা সার্ভেন্টদেরকে।'

প্রথমে একতলার ঘরগুলোতে দ্রুত চক্কর দিয়ে এলো কিশোর আর রবিন। আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কোন্‌খান থেকে খোঁজা শুরু করলে সুবিধে হয়। টেবিল আর ছোট বড় বেদির ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেক ধরনের মূর্তি—মধ্যযুগীয় রোমান যোদ্ধা, আঠারোশো শতকের ওয়েস্টার্ন বন্দুকবাজ কাউবয়, কুস্তিগীর, ঘোড়সওয়ার সৈনিক, এসব।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন ফাউলার। হলে অপেক্ষা করছিলেন ছেলেদের জন্যে। 'নিশ্চয় দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখেছো, চোরকুঠুরি আছে কিনা…'

দড়াম করে কি আছড়ে পড়লো ওপরতলায়। বিকট শব্দ। পুরো বাড়িটা যেন কেঁপে উঠলো।

'কি হলো?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে কিশোর।

'কি জানি!' আনমনে মাথা নাড়লেন ফাউলার। 'চলো তো দেখি!'

একেক বারে দুটো করে সিঁড়ি টপকে দৌড়ে উঠে এলো ওরা দোতলায়। আলাদা হয়ে গিয়ে ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করলো। কোনো ঘরেই কিছু পড়ার চিহ্ন দেখতে পেলো না।

চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িঘরের দরজা খুলে ফেললেন ফাউলার। উঠতে শুরু করলেন। পিছে চললো দুই গোয়েন্দা। চিলেকোঠায় ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। অসংখ্য বাক্স আর পুরানো আসবাব স্তূপ হয়ে আছে। তার মধ্যে বড় একটা মেহগনি কাঠের দেরাজ উল্টে পড়েছে। নিচে চাপা পড়েছে একজন মানুষ। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, পারছে না।

'মরে গেল তো!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

লোকটাকে বের করে আনার জন্যে লাফিয়ে এগোলো কিশোর। তাকে সাহায্য

করতে এগোলো রবিন আর ফাউলার। তুলে সোজা করে রাখলো দেরাজটা। তারপর তাকালো লোকটার দিকে। মাঝবয়েসী একজন লোক। রোগা শরীর। নড়ছে না আর এখন। বেহুঁশ হয়ে গেছে। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। চেহারা ফ্যাকাসে। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলো কিশোর। নাড়ির গতি ক্ষীণ।

'অ্যামবুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার,' ফাউলার বললেন। 'এখানে কি করতে এসেছিলো?'

'চেনেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'আন্দাজ করতে পারছি। শিওর হতে হলে আরও কিছু দেখা দরকার,' অচেতন লোকটার জ্যাকেটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন উকিল। নাম-ঠিকানা লেখা কাগজটা পড়ে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম। এর নাম উইলিয়াম বারোজ। মিস্টার রেডফোর্ডের খালাতো ভাই। উইলে এর নামও রয়েছে।'

'উত্তরাধিকারী!' বিড়বিড় করলো কিশোর। উকিলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিশ্চয় কিছু খুঁজতে এসেছিলো। জরুরী কিছু।'

নিচে টেলিফোন আছে। সেকথা রবিনকে জানালেন ফাউলার। আমবুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করতে বললেন। 'অ্যামবুলেন্স আসুক। আমাদের অপেক্ষা করাই ভালো।'

লোকটার ওপর নজর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিশোর খুঁজতে শুরু করলো। ড্রয়ার, বাক্স, আলমারি, সব জায়গায়। বের করার চেষ্টা করছে লোকটা কি নিতে এসেছিলো।

'দেরাজের মধ্যেও খুঁজতে গিয়েছিলো,' বললো সে। 'হয়তো ঠিকমতো বসেনি। টান লেগে উল্টে পড়েছে গায়ের ওপর।'

'তাই হবে। চুরি করে ঢুকেছে। আমাকে না নিয়ে এবাড়িতে ঢোকার অনুমতি নেই কারো। ভাবছি, ঢুকলো কিভাবে?'

দেরাজের ড্রয়ার পুরানো কাপড় আর বইতে বোঝাই। 'নাহ্, তেমন কিছু তো দেখছি না,' নিরাশ হয়ে মাথা নাড়লো কিশোর। 'অ্যাজটেক যোদ্ধার সূত্র পাবো আশা করেছিলাম।'

রবিন ফিরে এসে জানালো অ্যামবুলেন্স আসছে। আবার ফিরে গেল নিচে, অ্যামবুলেন্স এলে তাদেরকে পথ দেখিয়ে আনার জন্যে।

বেশিক্ষণ লাগলো না। একটু পরেই একজন ডাক্তার আর দু'জন স্ট্রেচার বাহককে নিয়ে এলো রবিন। বারোজকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। বললেন, 'অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

লোকটাকে স্ট্রেচারে তোলা হলো। বাহকদের সঙ্গে চললেন ডাক্তার, উকিল, আর দুই গোয়েন্দা।

অ্যামবুলেন্স চলে যেতেই কিশোর বললো, আবার সে চিলেকোঠায় ফিরে যেতে চায়। খোঁজার কাজটা শেষ করে ফেলবে।

'কেন, কিছু চোখে পড়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'মনে হয়। কয়েক বাক্স পিকচার স্লাইড পড়ে থাকতে দেখেছি। বোধহয় ওগুলোর জন্যেই গিয়েছিলো বারোজ। আর তাহলে ধরেই নেয়া যায়, সূত্র রয়েছে

ওই ছবির মাঝেই।'

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি চলো!'

দুই

'তুমি ভাবছো,' ফাউলার বললেন। 'এর মধ্যে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবিটবি আছে?'

চিলেকোঠার দরজায় পৌঁছে গেল ওরা। কিশোর বললো, 'হ্যাঁ। হয় লোকটার। নয়তো জিনিসটার।'

স্লাইডগুলো কোথায় বসে দেখবে? কিশোর বললো, নিচে গিয়ে দেখাই ভালো। চিলেকোঠায় বসে দেখতে অসুবিধে। কথাটা পছন্দ হলো ফাউলারের। বললেন, 'সেই ভালো। চলো। স্লাইড দেখতে তো প্রোজেক্টর আর পর্দা লাগে। আছে যে তুমি জানলে কি করে?'

'সহজ। স্লাইড যখন আছে, প্রোজেক্টর আর পর্দাও আছে। এ-তো জানা কথা। তবে আমি দেখেছি। নিচতলার ঘরগুলো খোঁজার সময়। চলুন।'

'চলো।'

তিনজনে মিলে বাক্সগুলো নিচে নামিয়ে আনলো। তারপর প্রোজেক্টর আর পর্দা বয়ে নিয়ে এলো লিভিং রুমে। বাক্সের ওপর বিভিন্ন দেশের নাম লেখা রয়েছে। গ্রীস, ইটালি, মিশর, আর ভারত লেখা বাক্সগুলো সরিয়ে রাখলো কিশোর। 'অ্যাজটেক যোদ্ধাকে এগুলোতে পাবো না,' বললো সে। 'আমি শিওর। আমরা যাকে খুঁজছি তাকে পাবো মেকসিকোয়।'

পর্দাটা টেনে নামিয়ে দিয়ে এলো রবিন। প্রোজেক্টর রেডি করে তাতে স্লাইড ঢোকালো কিশোর। একটা বাক্সের ওপরে কিছু লেখা নেই, সেটা থেকেই নিয়েছে প্রথম ছবিটা। দেখলো। তারপর একের পর এক ছবি ঢোকাতে থাকলো।

কিছু ছবি দেখে মনে হলো, সেগুলো রকি পর্বত থেকে তোলা হয়েছে। তারপর এলো হাওয়াই, ক্যানাডা আর ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য।

মেকসিকোতে তোলা একটা ছবিও চোখে পড়েনি এখনও, তবু বিমোহিত হয়ে দেখছে কিশোর রবিন। খুবই ভালো লাগছে ওদের। অজানা অচেনা দুর্গম সব জায়গার ছবি। কিছু কিছু তো বিস্ময়কর। কোন দিক দিয়ে যে একটা ঘন্টা পেরিয়ে গেল টেরই পেলো না ওরা। ফাউলারও মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। হঠাৎ কি মনে হতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আরিব্বাবা, অনেক দেরি হয়ে গেছে! আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না আমি। অফিসে যেতে হবে।'

প্রোজেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছে এখন রবিন। একের পর এক স্লাইড তুলে দিচ্ছে কিশোর, সেগুলো মেশিনে ঢোকাচ্ছে সে। ছবি দেখতে বেশিক্ষণ আর সময় নিচ্ছে না ওরা। দ্রুত দেখছে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফাউলার। 'মেক্সিকো! ওই বিল্ডিংটা মেকসিকো সিটিতে, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়!'

'গিয়েছিলেন নাকি ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

ছবিটা ভালো করে দেখে সরিয়ে দিলো রবিন। আরেকটা ছবি দেখে ফাউলার জানালেন, ওটা পিরামিড অভ দি সান। মেকসিকো সিটির বাইরে বিশাল এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ।

'রবিন, ধরে রাখ ছবিটা,' কিশোর বললো। 'এটাই অ্যাজটেক। কোনো সূত্র আছে কিনা দেখ।'

অনেকক্ষণ দেখেও কিছুই বের করা গেল না ছবিটা থেকে। ছবিতে কয়েকজন লোক রয়েছে। কারোর চেহারাই স্পষ্ট নয়, চেনা যায় না।

বোতাম টিপে দিলো আবার রবিন। চলতে শুরু করলো আবার প্রোজেক্টর। কয়েকটা ছবিতে নানা রকম ক্যাকটাস দেখা গেল, ক্যাণ্ডেল ক্যাকটাসও রয়েছে তার মধ্যে। একটা হ্রদ দেখা গেল। মাছ ধরছে জেলেরা। জালগুলো অদ্ভুত।

'ওটা লেক প্যাজকুয়ারো,' ফাউলার জানালেন। 'আর ওই জালগুলোকে বলে প্রজাপতি জাল। দুনিয়ায় একমাত্র ওই হ্রদেই ওরকম জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়,' আবার ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আর তো বসতে পারছি না আমি। এবার যেতে হয়। বাকি ছবিগুলো দেখার জন্যে আবার নাহয় একসময় ফিরে আসা যাবে।'

'আমরা থাকি?' কিশোর অনুমতি চাইলো। 'ছবিগুলো দেখেই যাই আমি আর রবিন। অসুবিধে আছে?'

হাসলেন উকিল সাহেব। 'ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি একটা দায়িত্ব পালন করছি। একজনের সম্পত্তি আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। লোকে জানলে খুব সমালোচনা করবে।'

কিশোর কথা বলছে, সময় নষ্ট না করে এই সুযোগে আরেকটা স্লাইড ঢুকিয়ে দিয়েছে রবিন। দুটো লোককে দেখা গেল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো কিশোর। একজনকে চিনতে পেরেছে। বাঁয়ের মানুষটি মিস্টার চেস্টার রেডফোর্ড।

'অন্য লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন। 'দেখতে তো অনেকটা ইনডিয়ানদের মতো লাগছে।'

'স্প্যানিশ-ইনডিয়ান!' বিড়বিড় করলো কিশোর। ফাউলারের দিকে তাকালো। 'কে ও? পিন্টো আলভারো?'

'বলতে পারবো না,' মাথা নাড়লেন উকিল সাহেব।

স্থির দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'অ্যাজটেক যোদ্ধার "সত্যিকারের" বংশধর হতে পারে! চেহারা অন্তত তা-ই বলছে।'

কিশোর আর রবিনের মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ফাউলার। যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন ছবিটার দিকে। দ্রুত পরের ছবিগুলো চালিয়ে দিলো রবিন। প্রতিটিতেই দু'জনের ছবি, নানা ভঙ্গিতে, চমৎকার একটা বাগানের মধ্যে তোলা।

'মিস্টার ফাউলার,' আবার অনুরোধ করলো কিশোর। 'ছবিগুলো তো সবই প্রায় এক। একটা নিয়ে গেলে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নিতে পারি? প্রিন্ট করে নেবো।'

ভেবে দেখলেন উকিল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলেন।

সব চেয়ে পরিষ্কার ছবিটা বেছে বের করলো কিশোর। সাবধানে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রাখলো।

প্রোজেক্টর, পর্দা আর বাক্সগুলো যেখানে ছিলো, সেখানে রেখে এলো আবার তিনজনে মিলে। বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। সদর দরজার তালা লাগালেন ফাউলার। তারপর ছেলেদের নিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ভেতরে ঢুকেই সোজা হেডকোয়ার্টারের দিকে এগোলো দুই গোয়েন্দা। পথে দেখা হয়ে গেল রাশেদ পাশার সঙ্গে। পুরানো একটা গার্ডেন চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন তিনি। গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। হাত নেড়ে ডাকলেন, 'দেখে যা।'

গেল দু'জনে। ময়লা পুরানো একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দুটো আঙুলের ছাপ আছে। দেখ তো একরকম না আলাদা?'

অবাক হয়ে চাচার মুখের দিকে তাকালো কিশোর। নীরবে হাত বাড়িয়ে কাগজ আর গ্লাসটা নিলো। ভালোমতো দেখে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আলাদা। একজনের না।'

মুচকি হাসলেন রাশেদ পাশা। 'আমি যদি বলি একজনের?'

চাচার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। 'কি হয়েছে তোমার, চাচা? পুরানো মাল বাদ দিয়ে হঠাৎ এই গোয়েন্দাগিরি!'

'তুই যদি পুরানো মাল আর গোয়েন্দাগিরি একসাথে চালাতে পারিস, আমি পারবো না কেন?'

তা বটে। 'কিন্তু হঠাৎ তোমার এই শখ কেন?'

'হঠাৎ দেখলি কোথায়? তোরা যখন কোনো কেসে কাজ করিস, আমি কি ইনটারেস্টেড হই না? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করি না?'

'তা করো...'

'নতুন একটা খবর শুনবি?' হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে রাশেদ পাশার চোখে। গোঁফের কোণ ধরে টানলেন। 'আমিও একসময় গোয়েন্দা ছিলাম।'

বোমা ফাটলো যেন, এমন ভাবে চমকে গেল কিশোর রবিন।

'গোয়েন্দা!' একই সঙ্গে বলে উঠলো দু'জনে।

'হ্যাঁ, গোয়েন্দা। জীবনে অনেক কাজই করেছি, জানিস। বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসের দলে যোগ দিয়েছি। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি দেশে দেশে। জাহাজের নাবিক হয়েছি। মরুভূমিতে গিয়ে বেদুইনদের সঙ্গে বাস করেছি...'

'সেসব জানি,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'জনতাম না শুধু গোয়েন্দা হওয়ার খবর।'

'ভালো ডুবুরি ছিলাম আমি, সেখবর জানিস? প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে বহুদিন থেকেছি আমি, মুক্তো-শিকারীদের দলে।'

'আশ্চর্য! এতো কিছু ছিলে তুমি...'

'তোর বাপও অনেকটা ওরকমই ছিলো। তোর দাদাও। নইলে রহস্য আর রোমাঞ্চের এই তীব্র নেশা এলো কোত্থেকে তোর রক্তে?'

'হুঁ!' বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন কিশোর। রবিন থ। 'তা গোয়েন্দাটা কবে ছিলে? কোথায়?'

'জাহাজে থাকতে। একদিন এক কোটিপতি মহিলার নেকলেস হারিয়ে গেল। জাহাজের ডিটেকটিভ কিছুই করতে পারলো না। আমার খুব আগ্রহ হলো, দেখি তো চেষ্টা করে? দুই ঘন্টার মধ্যেই বের করে দিলাম নেকলেসটা…'

'এত্তো তাড়াতাড়ি!' চোখ বড় বড় করে ফেললো রবিন।

'হ্যাঁ। সেদিনই আমাকে সহকারী গোয়েন্দার চাকরি দিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। ছ'মাসের মধ্যেই আসল ডিটেকটিভকে ছাড়িয়ে আমাকে তার জায়গায় বহাল করলেন। কিন্তু টিকলাম না। বছরখানেক পরেই পালালাম। আফ্রিকার উপকূল ধরে চলছিলো তখন জাহাজ। সিংহ আর হাতি শিকারের লোভ সামলাতে পারলাম না…'

আচমকা কি হলো কিশোরের কে জানে! চট্ করে বসে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ফেললো চাচাকে। 'এতো কথা কোনোদিন কিন্তু জানাওনি তুমি আমাকে!'

'জানাবো কি? আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের কথা শুনলেই তোর চাচী খেপে যায়। বলে ফালতু সময় নষ্ট করেছি আমি। কে যায় অহেতুক সংসারের শান্তি নষ্ট করতে…'

'হুঁ!' মাথা দোলালো কিশোর। 'তা এই আঙুলের ছাপের ব্যাপারটা কি, বল তো? আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছো নাকি?'

'না। পুরানো ডায়েরী ঘাঁটতে গিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো কাগজটা। অবসর সময়ে ধাঁধার খেলা আমার খুব ভালো লাগতো। বসে বসে খেলতাম। এই আঙুলের ছাপ আমারই। এই যে এটা আসল। আর এটা নকল।'

'নকল!' বুঝতে পারলো না রবিন।

কিশোর বুঝে ফেলেছে। বললো, 'বুঝেছি। রবারের নকল চামড়া লাগিয়ে নিয়েছিলে। এভাবে নকল ছাপ দিয়ে বাঘা বাঘা গোয়েন্দাকে ধোঁকা দিয়ে দেয় অপরাধীরা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। ভাইপোর মুখের দিকে তাকালেন সরাসরি। 'খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোনো কেস পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছি,' খুলে বললো কিশোর। ছবিটা প্রিন্ট করার কথা বললো।

'চল, আমিও দেখি। হাতে কাজটাজ বিশেষ নেই। ভাবছি, পুরানো পেশাটা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেবো। মন্দ হয় না, কি বলিস?'

'একটুও না,' খুশি হয়ে বললো কিশোর। 'স্যালভিজ ইয়ার্ডের পাশাপাশি নতুন কতো ব্যবসাই তো করো। এই যেমন জন্তুজানোয়ার ধরে বিক্রি করার ব্যবসাটা। একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে ফেললেই বা ক্ষতি কি?'

'তোদেরকে দেখে সেকথা ভাবছি অনেকদিন থেকেই। সাহস পাই না, বুঝলি,' অফিসের দিকে তাকালেন তিনি। ভেতরে কাজ করছেন মেরিচাচী। 'তোর চাচীর এসব কাজ একদম পছন্দ না।'

'কই, আমাকে তো কিছু বলে না?'

'তোকে বলে না। আমাকে বলবে। ওই বেরোচ্ছে। নিশ্চয় খেতে ডাকবে।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। হাত নেড়ে সবাইকে যেতে ডাকলেন। ঠিকই আন্দাজ করেছেন রাশেদ পাশা। খেতেই ডাকলেন তিনি।

টেবিলে বসে সবে প্লেট টেনে নিয়েছে কিশোর, মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কিশোর, মিস্টার সাইমন ফোন করেছিলেন কেন রে? নিশ্চয় নতুন কোনো কেস?'

'হ্যাঁ। তেমন কিছু না...' এড়িয়ে যেতে চাইলো কিশোর।

'কেসটা কি?'

মিথ্যে বলে পার পাবে না, বুঝে গেল কিশোর। বলতেই হলো। বারোজের কথায় আসতেই রেগে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, 'শয়তান! ওটাকে আবার সম্পত্তি দিতে গেলেন কেন মিস্টার রেডফোর্ড! ও তো একটা চোর!'

'কিন্তু সত্যিই কিছু চুরি করতে গিয়েছিলো কিনা আমরা জানি না।'

'নিশ্চয় গিয়েছিলো! নইলে লুকিয়ে চিলেকোঠায় উঠতে যাবে কেন? উকিল সাহেবের জায়গায় আমি হলে সোজা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে বারোজের বাড়িতে তল্লাশি চালাতাম। আজই পয়লা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরও চুরি করেছে সে। তার বাড়িতে চোরাই মাল পাওয়া যাবেই।'

'তুমি রেগে যাচ্ছো কেন?' মোলায়েম গলায় বললেন রাশেদ পাশা। 'তবে একেবারে ভুল কথা বলোনি। চোর হতেও পারে। যাই হোক, পালিয়ে তো আর যেতে পারছে না। হাসপাতালে রয়েছে। পুলিশ ছাড়বে না। সুস্থ হলেই গিয়ে প্রশ্ন শুরু করবে।'

'দেখবে তখন, আমার কথাই ঠিক,' বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

খাওয়ার পরে লিভিং রুমে এসে বসলো সবাই। হাসপাতালে ফোন করলো কিশোর। জানা গেল, তখনও হুঁশ ফেরেনি বারোজের।

অ্যাজটেক যোদ্ধার কেস নিয়েই চললো আলোচনা।

'মেকসিকোর পুরানো ইতিহাস ঘাঁটতে হবে,' কিশোর বললো একসময়। 'বিশেষ করে সেই সময়কার, যখন অ্যাজটেকরা ক্ষমতায় ছিলো।'

বাড়িতে বড় একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে কিশোর। অবশ্যই সেটা গড়তে সাহায্য করেছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। বইয়ের ব্যাপারে তিনজনেরই প্রচণ্ড আগ্রহ। মোটা মোটা দুটো বই নিয়ে এলো কিশোর। একটা রবিনকে দিয়ে আরেকটা নিজের কোলের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে নিমগ্ন হয়ে গেল বইয়ের পাতায়।

নীরবে পাইপ টানছেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচী একটা পেপারব্যাক উপন্যাস নিয়ে বসেছেন।

'বাপরে! কি জল্লাদ ছিলো!' হঠাৎ বলে উঠলো রবিন। 'কিভাবে মারতো মানুষগুলোকে! দেবতার ভোগ! স্বাস্থ্যবান দেখে একজন তরুণকে বেছে নিতো। একটা বছর তাকে ভালো ভালো খাবার খাওয়াতো, কাপড় দিতো, আনন্দের যতো রকম উপকরণ আছে, সব দেয়া হতো। তারপর নিয়ে গিয়ে তাকে বলি দিতো যুদ্ধ দেবতার উদ্দেশ্যে।'

'হ্যাঁ, তিক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'ধর্মের নামে ধরে ধরে খুন করতো অসহায় মানুষগুলোকে। সব শয়তানী ওই ধর্ম-গুরুগুলোর। ধর্মযাজক না ছাই! আস্ত পিশাচ একেকটা!'

পুরানো আমলের নরবলি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। তাতে রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীও যোগ দিলেন। অ্যাজটেক যোদ্ধাদের কয়েকটা ছবি রয়েছে বইতে। বিচিত্র পোশাক পরা। একটা দেখিয়ে রবিন বললো, 'দেখ দেখ, কি অদ্ভুত!'

রঙিন ছবি। কাকাতুয়ার পালকের মুকুট মাথায়। গায়ের খাটো জামাটাও তৈরি হয়েছে কাকাতুয়া আর কিছু দুর্লভ পাখির পালক দিয়ে। সোনার সুতো দিয়ে গাঁথা হয়েছে পালকগুলো। এছাড়াও জায়গায় জায়গায় সোনার কারুকাজ।

আরেকটা ছবিতে দেখা গেল পুরো এক স্কোয়াড্রন যোদ্ধা। পরনে জাগুয়ারের চামড়ার তৈরি ইউনিফর্ম। হাতে বর্ম, তাতেও সোনার কারুকাজ। প্রজাপতি আর সাপের প্রতিকৃতি। পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল। তাতে সোনা। সোনার ছড়াছড়ি। প্রচুর স্বর্ণখনির মালিক ছিলো ওরা, বোঝা যায়।

মন দিয়ে দেখছে কিশোর আর রবিন, এই সময় এঞ্জিনের শব্দ হলো। বিকট শব্দ করতে করতে অফিসের কাছে এসে থামলো গাড়িটা।

হাসলো কিশোর। 'নিশ্চয় মুসা।'

উঠে জানালার কাছে চলে গেল রবিন। 'ঠিকই বলেছো।'

দরজায় দেখা দিলো মুসা। 'এই যে আছো। ব্যাপার কি? কেস তাহলে সত্যিই মিললো? মিস্টার সাইমন সেজন্যেই ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' রবিন বললো।

'তা কি কি করে এলে?'

'তেমন কিছু না,' জবাব দিলো কিশোর। 'দেরাজের নিচে চাপা পড়া একজন মানুষকে বের করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। আর একজন অ্যাজটেক যোদ্ধার খোঁজ করছি।'

বড় হয়ে গেল মুসার চোখ। 'কিসের খোঁজ করছো!'

'অ্যাজটেক যোদ্ধার,' মুসাকে কেসটার কথা খুলে বললো কিশোর আর রবিন।

'এই যোদ্ধার ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না আমার। পুরানো ব্যাপার-স্যাপার তো, ভূত বেরিয়ে পড়তে পারে। পুরানো বাড়িতেই ভূত বেশি থাকে জানোই তো,' মুসা বললো। 'তবে মেকসিকোর ব্যাপারটা বেশ ইনটারেসটিং।'

'এই উইলের ব্যাপারটা পাগলামি মনে হচ্ছে আমার,' মুসা বললো। 'তবে মেকসিকো বেশ মজার। কিছু ইতিহাস আমিও পড়েছি। পুরানো ওই অ্যাজটেকরা কি খেতো জানো?'

'না,' মাথা নাড়লো রবিন।

'ফুল মিশিয়ে খাবার রান্না করতো,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো মুসা। রবিন আর কিশোরের কাছে বিদ্যে জাহির করার সুযোগ কমই পায় সে। পেয়ে আর ছাড়তে চাইলো না। 'তাতে নাকি অনেক অসুখ দূরে থাকে। এই যেমন, অ্যাকাশে ফুল নাকি মেলানকালিয়া মানে বিষণ্নতা দূর করে, প্রাচীন অ্যাজটেক ওঝারা বিশ্বাস

করতো। ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে চিনি আর দারুচিনি দিয়ে ভাজা করে খেতো,' ঠোঁট চাটলো সে। 'টেস্ট খারাপ হবে না। ভাবছি একদিন বানিয়ে খেয়ে দেখবো।'

'কেন, তোমাকে মেলানকালিয়া ধরলো কবে থেকে?' হেসে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আর কোনো ফুল খেতো?' রবিনের প্রশ্ন।

'নিশ্চয় খেতো। পাই ফিলিং তৈরি করতো গোলাপ ফুল দিয়ে। তাতে মেশাতো চিনি আর লেবু। একধরনের শরবত বানাতো জ্যামাইকা গাছের লাল কুঁড়ি দিয়ে। আর স্কোয়াশ কুঁড়ি খাওয়ার কথা তো নিশ্চয় শুনেছো। শোনোনি? সূর্যদেবতার পুজোর সময় ওই কুঁড়ি মুখে পুরে পানের মতো চিবাতো।'

'ছাগল ছিলো নাকি ব্যাটারা!' মেরিচাচী বললেন।

'এক কাজ করো, মেরি,' হেসে বললেন রাশেদ পাশা। 'একদিন জেরানিয়াম ফুল দিয়ে স্যুপ বানিয়ে দেখ না। অ্যাজটেকরা খেতে পারলে আমরা কেন পারবো না?'

হাসতে শুরু করলো সবাই।

হাসতে হাসতে মুসা বললো, 'কেন এসেছি, সেটা শুনলে না?'

'নিশ্চয় পার্টসটা পেয়ে গেছ, সেটা বলতে,' কিশোর বললো। 'চমৎকার হয়ে যাবে এবার ভাঙা গাড়িটা। একেবারে নতুনের মতো।'

'মতো না। নতুনই!' তর্জনী নাচিয়ে জোর দিয়ে বললো মুসা। 'আবার যেতে হবে আমাকে। আরেকটা পার্টসের খোঁজে। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, বলেও যাই, জিজ্ঞেসও করে যাই, মিস্টার সাইমন ডেকেছিলেন কেন? যাক, তোমরা অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খোঁজাখুঁজি করো। প্রয়োজন পড়লে আমাকে জানিও। আগে গাড়ির কাজটা শেষ করে নিই...'

'ঠিক আছে, যাও।'

বেরিয়ে গেল মুসা। একটু পরেই শোনা গেল তার জেলোপি গাড়ির ভটভট শব্দ। ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পরেও কিছুক্ষণ শোনা গেল শব্দটা।

বিশ্রাম নেয়া হয়েছে। অফিসে চলে গেলেন মেরিচাচী। ইয়ার্ডের কাজ করতে বেরিয়ে গেলেন রাশেদ পাশা। একা হয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

'তারপর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'এই কেসের ব্যাপারে আর কি করা যায় বলো তো?'

'তোমার গাড়িটা নিয়ে এসোগে। মিস্টার সাইমনের ওখানে যাবো। তাঁকে সব জানাবো। আর ভাবছি, আজ রাতে আরেকবার যাবো রেডফোর্ড হাউসে। ভেতরে ঢোকা নিষেধ, বাইরে থেকে দেখতে তো বাধা নেই।'

'তা নেই। কি দেখবে?'

'দেখি!'

মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলো দু'জনে। রাতের খাবারের পর আবার বেরিয়ে পড়লো। চললো রেডফোর্ড এস্টেটে। গেটের পাশে এনে গাড়ি রাখলো রবিন। 'এখানেই রেখে যাই, কি বলো?'

'আরেকটু সরিয়ে রাখো,' কিশোর বললো।

গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে চললো দু'জনে। আলো রয়েছে তখনও, টর্চ জ্বালার দরকার পড়লো না। বাড়ির বাঁ পাশে পৌঁছে থমকে গেল ওরা। একজন মহিলা, ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মোটাসোটা। মাথায় শাদা চুল।

শব্দ শুনে ফিরে তাকালো মহিলা। একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তারপর হাসলো। 'গুড ইভনিং। চমকে দিয়েছিলে। চোর মনে করেছিলাম। তা নও, দেখেই বুঝতে পারছি। আমার নাম ক্লারা অ্যাডামস। এখানেই কাজ করতাম, বাড়ির মালিক থাকতে।'

'মিস্টার রেডফোর্ড?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালো মহিলা। 'খুব ভালো লোক ছিলেন। তাঁর কাছে কাজ করে শান্তি ছিলো। কি আরামে ছিলাম ভাবলে কষ্টই লাগে এখন।'

কতোদিন আগে কাজ করেছে, জানতে চাইলো কিশোর।

ক্লারা জানালো, 'বছর দুই আগে চলে গিয়েছিলাম। ইদানীং বেশি বেশি বাইরে যেতেন মিস্টার রেডফোর্ড, নিয়মিত কাজের লোক তেমন লাগতো না।'

'মিস অ্যাডামস, অ্যাজটেক যোদ্ধার নাম কখনো বলতে শুনেছেন মিস্টার রেডফোর্ডকে?' প্রশ্ন করে বসলো কিশোর।

শূন্য দৃষ্টি ফুটলো মহিলার চোখে। 'নাহ্।'

'মেকসিকোতে যেতেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'প্রায়ই। অনেক স্যুভনির এনেছেন ওখান থেকে।'

'ওগুলো কি করেছেন?' কিশোর জানতে চাইলো।

'কিছু নিজের কাছে রেখেছেন। কিছু দিয়ে দিয়েছেন একে-তাকে।'

মেকসিকোর কোনো বন্ধু বা পরিচিতজনের নাম উল্লেখ করেছেন কিনা তিনি কখনও, জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা নাড়লো ক্লারা। 'সত্যি বলতে কি, মিস্টার রেডফোর্ড কথা তেমন বলতেনই না। বাড়ির চাকর-বাকরের সঙ্গে তো নয়ই। তবে কার সাথে যেন কথা বলার সময় একবার বলতে শুনেছিলাম, মেকসিকোতে গিয়ে ইনডিয়ান অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা করেন তিনি, সংগ্রহে রাখার জন্যে। ওই সময় একটা লোক ছিলো তাঁর সঙ্গে। নামটা বলেননি।'

'অনেক অস্ত্র সংগ্রহে আছে বুঝি তাঁর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'আছে। মিউজিয়ামে দান করে দেবেন বলতেন। দেখলে বুঝতে কি সব জিনিস! রোজ ওগুলোর ধুলো মুছে পরিষ্কার করে রাখতাম আমি। কয়েকটা অস্ত্র ছিলো ভয়ংকর, দেখলেই হাত-পা সিঁটিয়ে যেতো আমার।'

'কোনো অস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে অ্যাজটেক শব্দটা কি বলেছেন?'

'না, শুনিনি। কিছু কিছু অস্ত্র আনা হয়েছে আফ্রিকা আর ইউরোপ থেকে। মেকসিকো থেকে যেগুলো এনেছেন, সেগুলোর নাম বলার সময়ও কখনও অ্যাজটেক কথাটা বলেননি।...দেরি হয়ে গেল। যাই। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো।'

'আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

কিশোরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ক্লারা। 'সন্দেহ করছো, না?'

'না না, এমনি…'

হাসলো মহিলা। 'করলে অবশ্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। এরকম সময়ে বন্ধ একটা বাড়িতে একজন মহিলাকে দেখলে সন্দেহ হওয়ারই কথা। হ্যাঁ, আসি। মানে, আসতাম। মালিক বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। তাছাড়া বাড়িটার মায়া আমি কিছুতেই কাটাতে পারি না।…ঠিক আছে, চলি। গুড বাই।'

দ্রুত হেঁটে চলে গেল মহিলা।

তাকে নিয়ে খুব একটা ভাবছে না দুই গোয়েন্দা। তাদের মনে তখন অন্য চিন্তা। অ্যাজটেক যোদ্ধা কোনো অস্ত্রের নাম নয় তো?

লনের ধার দিয়ে হেঁটে বাড়ির সামনের দিকে চলে এলো দু'জনে। অনেক বড় বাড়ি। ডান পাশে চোখ পড়তেই থমকে গেল ওরা।

একটা বাক্সের ওপর উঠে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে একজন মানুষ।

তিন

লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটলো দু'জনে। কিন্তু দেখে ফেললো লোকটা। লাফ দিয়ে বাক্স থেকে নেমে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ওদের দিকে। তারপর ঘুরে দৌড় দিলো উল্টো দিকে।

পাথরটাকে এড়ানোর জন্যে ঝট্ করে মাথা সরিয়ে ফেললো কিশোর আর রবিন। চিৎকার করে ডাকলো কিশোর, 'শুনুন! দাঁড়ান!'

কিন্তু লোকটা কি আর শোনে? থামলো না। টর্চ জ্বেলে তার পিছু পিছু দৌড় দিলো দুই গোয়েন্দা। লোকটা বেঁটে, কালো চুল। দৌড়ানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যায় এলাকাটা খুব ভালোমতো চেনে, কোনো রকম দ্বিধা নেই। পেছনের একটা পথ দিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিশোর আর রবিন। একজায়গায় মাটিতে জুতোর ছাপ ছাড়া লোকটার আর কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না।

'পুলিশকে জানানো দরকার,' কিশোর বললো। 'আমি থাকি। পাহারা দিই। তুমি গিয়ে পুলিশকে ফোন করো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলো একটা পেট্রোল কার। লোকটা যেখানে ছিলো, সেই জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগলো। জানালার চৌকাঠে আঙুলের ছাপ ফেলে গেছে লোকটা। সেগুলো তোলার ব্যবস্থা করলো পুলিশের বিশেষজ্ঞ। মাটি থেকে জুতোর ছাপের মডেল তৈরি করলো। আর যে বাক্সের ওপর দাঁড়িয়েছিলো লোকটা, সেটাও তুলে নিলো গাড়িতে।

ছেলেদেরকে ধন্যবাদ দিলেন পেট্রোল কারের অফিসার-ইন-চার্জ। আবার কোনো চোরছ্যাচোড়কে চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানানোর অনুরোধ করে চলে

গেলেন।

পুলিশ চলে গেলে আবার অ্যাজটেক যোদ্ধার সূত্র খুঁজতে শুরু করলো দুই গোয়েন্দা। টর্চের আলো ফেলে ঘুরে ঘুরে দেখলো। কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো কিশোর, 'মনে হয় পেলাম!'

দৌড়ে এলো রবিন। কিশোরের আলোটার পাশে আলো ফেললো। একটা বড় গাছের কাণ্ডে খোদাই করে আঁকা হয়েছে একজন ইনডিয়ান মানুষের প্রতিকৃতি, মাথা থেকে কাঁধের নিচ পর্যন্ত।

'কি বোঝাতে চেয়েছে,' কিশোর বললো। 'বুঝলাম না। তবে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি হতে পারে।'

গাছের পুরো কাণ্ডটাতেই চোখ বোলালো ওরা, আরও সূত্রের আশায়। আরেকটা ছবি। কিংবা ফাঁপা জায়গা। নেই কিছু।

'গাছের কাছে মাটিতে কিছু পুঁতে রাখেনি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

আবার খোঁজা শুরু হলো। গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো দু'জনে। মাটির দিকে চোখ। অনেকখানি জায়গা দেখলো। মাটি খোঁড়ার চিহ্ন চোখে পড়লো না । সমান মাটি। সব জায়গায় সবুজ ঘাস, একরকম হয়ে জন্মেছে। মাটির রঙেরও কোনো পরিবর্তন নেই।

'খোঁড়া হলেও,' কিশোর বললো। 'কিছু দিনের মধ্যে অন্তত হয়নি। অনেক আগে। মাটি না খুঁড়লে কিছু বোঝাও যাবে না আছে কিনা। আজ রাতে হবে না সেটা। তাছাড়া মিস্টার ফাউলারের অনুমতি নিতে হবে।'

'চলো, গিয়ে অনুমতি নিয়ে নিই।'

'আজকে তো আর হবে না। কাল সকালে দেখা যাক।'

'রাত তো বেশি হয়নি। এখন কোথায় যেতে চাও? বাড়িতে?'

'না, চলো, একবার মিস্টার সাইমনের ওখান থেকে ঘুরে যাই। তিনি কিছু করতে পারলেন কিনা জানা দরকার।'

আরেকটা জরুরী কেসে ব্যস্ত মিস্টার সাইমন। অ্যাজটেক যোদ্ধা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই পাচ্ছেন না। দুই গোয়েন্দাকে দেখে খুশি হলেন। রেডফোর্ড এস্টেটে যা যা ঘটেছে তাঁকে জানালো কিশোর আর রবিন।

অস্ত্রের কথা শুনে সাইমন বললেন, 'ইনটারেসটিং! লুকানো থাকতেও পারে। উকিলকে জিজ্ঞেস করবো। গাছের গোড়ায় লুকানো থাকলে অবাক হবো না।'

ফাউলারকে ফোন করলেন তিনি। মাটি খুঁড়তে দিতে আপত্তি নেই উকিল সাহেবের। তাঁকেও বেশ আগ্রহী মনে হলো। জানিয়ে দিলেন, আগামী দিন সকাল ন'টায় রেডফোর্ড এস্টেটে যাবেন তিনি। ইচ্ছে করলে তখন গোয়েন্দারাও যেতে পারে।

অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলেন সাইমন। জবাবে ফাউলার বললেন, 'বছরখানেক আগেই ওই শখ চলে গিয়েছিলো মিস্টার রেডফোর্ডের। তালিকাটা আমি দেখেছি। তাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার নাম নেই।'

পরদিন সকালে সময়মতো এসে রেডফোর্ড এস্টেটে হাজির হলো কিশোর, রবিন আর মিস্টার সাইমন। মুসা আসতে পারেনি। গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। দুটো গাড়ি

সাপ্লাই দেবে বলে দু'জন খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রীম টাকা নিয়েছে, ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে না পারলে ইজ্জত যাবে। সে-কারণে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আসতে পারেনি।

গ্যারেজ থেকে কোদাল আর বেলচা বের করে আনলেন ফাউলার। চারজনে মিলে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। গাছের চারপাশে বড় বড় গর্ত খোঁড়া হয়ে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে সেগুলো আবার মাটি দিয়ে ভরে দিতে লাগলো দুই গোয়েন্দা। হোস পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে, মাটি ডলে সমান করে আগের মতো করে ঘাসের চাপড়াগুলো আবার বসিয়ে দিতে লাগলো। ভীষণ পরিশ্রমের কাজ।

সাইমন বললেন, 'নিক, যদি সময় দিতে পারো, আমি একবার বাড়িটাতে ঢুকতে চাই। মিস্টার রেডফোর্ডের কাছে নিশ্চয় অনেক চিঠিপত্র আসতো। সেগুলো একবার দেখতে চাই, অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

রাজি হলেন উকিল। তবে তেমন কিছু পাওয়া যাবে আশা করতে পারলেন না। রেডফোর্ডের কাগজপত্র নাকি সবই পড়া হয়ে গেছে তাঁর। তবু সাইমন যখন দেখতে চাইছেন...তালা খুলে দিলেন তিনি।

কিশোর বললো, 'আপনারা কাগজ দেখুন। আমি আর রবিন বাকি স্লাইডগুলো দেখে ফেলি।'

'ভালো কথা বলেছো,' উকিল বললেন। 'দেখ। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, পুলিশকে ফোন করেছিলাম সকালে। আঙুলের ছাপের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওদের রেকর্ডে নেই ওই ছাপ। তারমানে অতীতের কোনো অপরাধের ইতিহাস নেই লোকটার। পুলিশের যে রকম ধারণা ছিলো।'

'বারোজের কি খবর?' জানতে চাইলো কিশোর। 'হুঁশ ফিরেছে?'

'না। তবে অবস্থা উন্নতির দিকে। ডাক্তারদের ধারণা তাড়াতাড়িই ফিরবে।'

কাগজপত্র ঘাঁটায় মন দিলেন সাইমন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ফাউলার। কিশোর ও রবিন প্রোজেক্টর আর পর্দা সাজিয়ে বসলো। মেকসিকোতে তোলা ছবির আরেকটা বাক্স পাওয়া গেল। মেশিনে স্লাইড ঢুকিয়ে বোতাম টিপে চালু করে দিলো রবিন। কয়েকটা ছবি পেরোতেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরেকটা সূত্র!'

একটা মেকসিকান পিরামিডের সামনে তোলা হয়েছে ছবিটা। সেই রহস্যময় লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাক।

'স্টিল করে রাখো,' কিশোর বললো। 'আমি মিস্টার সাইমন আর ফাউলারকে ডেকে আনি।'

দৌড়ে এসে লাইব্রেরিতে ঢুকলো সে। গভীর মনোযোগে চিঠি পড়ছেন সাইমন। পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উকিল সাহেব। দু'জনকে খবরটা জানালো কিশোর।

'হুঁম্‌ম্‌!' ছবিটা দেখে মাথা দোলালেন খোঁড়া গোয়েন্দা (এখন আর খোঁড়া নন তিনি, পা ভালো হয়ে গেছে), 'ভালো সূত্র বের করেছো। হয়তো ওই লোকটাই মিস্টার রেডফোর্ডের অ্যাজটেক যোদ্ধা।'

'এবং সেই সম্পত্তির সত্যিকার মালিক,' যোগ করলেন ফাউলার। 'যেটার কথা

লিখে গেছেন তিনি।'

'লোকটা কে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর। 'পিন্টো আলভারো, না অন্য কেউ?'

'এসব ছবি একটা কথাই প্রমাণ করে,' রবিন বললো। 'আমরা যাকে খুঁজছি, তার আসল ঠিকানা রয়েছে মেকসিকোতে।'

হাসলেন সাইমন। 'এতো শিওর হয়ো না। লোকটা মেকসিকোতেই আছে, তা না-ও হতে পারে। অন্য কোনো দেশেও থাকতে পারে। মেকসিকান হলেই যে মেকসিকোতে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই।'

আরেকটা কথা বললেন তিনি, লোকটা যদি অ্যাজটেক যোদ্ধা হয়ও, কি জিনিস খুঁজে বের করে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, ছবি দেখে তা জানার কোনোই উপায় নেই।

'একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' উকিল বললেন মাথা চুলকাতে চুলকাতে। 'লোকটার নাম কেন উইলে উল্লেখ করলেন না মিস্টার রেডফোর্ড? দুটো রহস্য রেখে গেছেন তিনি। এক, অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করা। দুই, যোদ্ধার সম্পত্তি খুঁজে বের করা।'

'রহস্য আরও একটা আছে,' সাইমন বললেন। 'কেসের সমাধান না হওয়াতক কেন সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছেন?'

'এর একটাই জবাব হতে পারে,' কিশোর বললো। 'কোনো বিশেষ কারণে ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি। আর সেই কারণটা হলো, অ্যাজটেক যোদ্ধা আর তার সম্পত্তি রক্ষা করা। উত্তরাধিকারীরা পাওনা দখল করে ফেললে কোনো ভাবে যোদ্ধা আর তার সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' একমত হলেন উকিল সাহেব। 'কিন্তু সেই সম্পত্তিটা কি হতে পারে?'

'নিশ্চয় দামী কোনো জিনিস,' রবিন অনুমান করলো। 'জিনিসটার নাম বললে হয়তো চোর-ডাকাতেরা ছুটে আসবে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। সেই ভয়েই গোপন রেখেছেন।'

'হুঁ,' মিস্টার সাইমনেরও তা-ই মনে হলো। 'আরও সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদের। আরও গোপনে।'

সূত্র খোঁজা চললো। স্লাইড দেখতে লাগলো দুই গোয়েন্দা। সাইমন আর ফাউলার আবার ফিরে গেছেন লাইব্রেরিতে। একের পর এক স্লাইড ঢোকাচ্ছে আর বের করছে রবিন। গভীর মনোযোগে পর্দার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আচমকা হাত চেপে ধরলো রবিনের। স্টিল করতে বললো। আরেকটা ছবি আগ্রহ জাগিয়েছে তার। বিশাল এক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় সেই লোক।

'বাপরে বাপ!' বলে উঠলো রবিন। 'কত্তোবড় গাছ!'

কয়েক মিনিট পরে আরেকটা ছবি পাওয়া গেল।

'আবার সেই লোক!' প্রায় ফিসফিস করে বললো কিশোর, যেন জোরে বললে ছুটে পালিয়ে যাবে মানুষটা।

লাইব্রেরি থেকে ফিরে এলেন সাইমন আর ফাউলার। ওঁদেরকে ছবিদুটো দেখানো হলো। চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়াল ডললেন গোয়েন্দা। 'এখন আমার মনে হচ্ছে, লোকটাকে মেকসিকোতেই পাওয়া যাবে।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর রবিন। কিন্তু তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। পর্দার দিকে চেয়ে কিছু ভাবছেন। চোখ ফেরালেন হঠাৎ। 'শোনো,' ছেলেদের বললেন তিনি। 'আমার এখন যাওয়ার উপায় নেই। একটা সিরিয়াস কেসের তদন্ত করছি। উইলে তোমাদেরকেও দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। যাবে নাকি মেকসিকোতে? আলভারোকে খুঁজতে?'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়লো রবিনের। 'আমি এক্ষুণি যেতে রাজি।'

'তোমার গানের অফিসের চাকরি?'

'ছুটি নিয়েছি কয়েকদিনের। বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্যেই। তবে কোথায় যাবো, ঠিক করতে পারছিলাম না। পেয়ে গেলাম।'

'গুড। কিশোর, তুমি?'

'প্লেনের টিকেট কেটে শুধু হাতে দিন। তারপর আর আমার ছায়াও দেখতে পাবেন না এ-শহরে,' হেসে বললো কিশোর।

সাইমনও হাসলেন। 'তা দিতে আপত্তি নেই। খরচ তো দেবে রেডফোর্ড এস্টেট। তবে তোমাদের বয়েসী, অর্থাৎ, টীনএজারদের মেকসিকোতে যাওয়ায় কিছু সরকারী অসুবিধে আছে। বয়স্ক কারো সঙ্গে ছাড়া এই বয়েসীদের ঢুকতে দেয়া হয় না সাধারণত, খুব কড়াকড়ি। দুটো বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি।'

সাইমনের কাঁধে হাত রাখলেন উকিল। 'ভালোই হবে তাহলে। ওরা গিয়ে ওখানে খুঁজুক, আমরা এখানে খুঁজবো। দেখি, কোন্ দল সেই রহস্যময় সম্পত্তি খুঁজে বের করতে পারে?'

'দেখা যাবে!' কিশোরের কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর। সাইমনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পাস দুটো হলে চলবে না, স্যার, তিনটে।'

'ওহ্ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। মুসা বাদ পড়ে গেছে। ঠিক আছে, তিনটেরই ব্যবস্থা হবে।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

যে স্লাইডগুলোতে রহস্যময় লোকটার ছবি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে গিয়ে প্রিন্ট করার অনুমতি চাইলো কিশোর। রাজি হলেন ফাউলার।

ইয়ার্ডে ফিরে এলো কিশোর আর রবিন। লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো। স্লাইডগুলো নিয়ে ডার্করুমে ঢুকলো রবিন। কিশোর ফোন করতে বসলো মুসাকে।

'কে, কিশোর?' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। খুশি খুশি লাগছে তাকে। 'পেয়ে গেছি! সব পার্টস পেয়ে গেছি!'

'মেকসিকোতে বেড়াতে যাবে?'

'কি বললে!'

'শুনতে চাইলে পার্টসের ভাবনা বাদ দিয়ে এক্ষুণি চলে এসো। আমি আর রবিন আছি।'

'জাহান্নামে যাক গাড়ি! আমি আসছি!'

মিনিট পনেরো পরেই শোনা গেল মুসার গাড়ির বিকট ভটভট। ইয়ার্ডে ঢুকলো। মিস ফায়ার করলো কয়েকবার, যেন পিস্তলের গুলিবর্ষণ করলো। থেমে গেল এঞ্জিন।

চার

'খুব সাবধান হতে হবে তোমাকে, মুসা,' কিশোর বললো। 'মেকসিকোর সব খাবার কিন্তু ভালো না। পাকস্থলী জ্বালিয়ে দেয়ার ওস্তাদ।'

'সব খেতে যাচ্ছে কে?' ভুরু নাচালো মুসা। 'যেগুলোতে ঝাল কম সেগুলো খাবো। টরটিলা খাবো, এনচিলাডা খাবো। ওসব নাকি দারুণ খাবার। তবে লাল মরিচের চকলেট সস, ওরিব্বাপরে,' হাত তুলে ফেললো সে। 'একশো হাত দূরে থাকবো আমি।'

সুর করে গেয়ে উঠলো রবিন,

'ফর মেকিং টরটিলাস ইউ উইল ইউজ আ মিটেট,
অ্যাণ্ড ফর আ বেড উই উইল ইউজ আ পিটেট।'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। 'নাম কি! পিটেট! তা যে-টেটই হোক, আমি বাপু ওই ঘাসের মাদুরে ঘুমোতে পারবো না। আমি অ্যাজটেক নই।'

হেসে উঠলো রবিন আর কিশোর। মুসাও হাসলো।

'রবিন,' কিশোর বললো। 'দেখ, ছবিগুলো শুকালো কিনা।'

ডার্করুমে গিয়ে কয়েকটা ছবি নিয়ে এলো রবিন। ভেজা রয়েছে। বিছিয়ে দিলো টেবিলে। আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো মুসা।

'যেসব জায়গায় ছবি তুলেছেন মিস্টার রেডফোর্ড,' কিশোর বললো। 'সবখানে যাবো আমরা।'

'তারমানে প্রাচীন কীর্তিগুলো দেখার সুযোগ পাচ্ছি?' মুখ তুললো মুসা।

'হ্যাঁ। সবগুলো না হলেও কিছু কিছু।'

হাসি দূর হয়ে গেল মুসার মুখ থেকে। সেই জায়গায় ফুটলো সন্দেহ। ছবির পিরামিডের সিঁড়িতে আঙুল রেখে বললো, 'এখানে আবার ওঠার কথা বলবে না তো? যা সরুরে ভাই, আর যা খাড়া! কোমর ভাঙার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই!'

'আমারও না,' সুর মেলালো কিশোর। 'ইনডিয়ানরা একটা বিশেষ কায়দায় ওপরে ওঠে, হাঁটাচলা করে। সেভাবে চললে আর পড়বো না।'

কিছুক্ষণ পরে ফোন করলেন মিস্টার সাইমন। জানালেন, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিনটে পাস যোগাড় করেছি। মেকসিকো সিটিতে হোটেলও বুক করা হয়েছে। ওখানে উঠবে। তার পর ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি যাবে। কোথায় যাবে, কিভাবে যাবে, সেটা তোমাদেরকেই ঠিক করতে হবে।'

'প্লেনের টিকেট?'

'লাগবে না। আমার প্লেনটাতে করেই যেতে পারবে। ল্যারি কংকলিন গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমাদের। আসার আগে ফোন করে দিও আমাকে। আবার

প্লেন পাঠিয়ে দেবো।'

টাকার অভাব নেই মিস্টার সাইমনের। বই লিখে, গোয়েন্দাগিরি করে অনেক টাকা আয় করেছেন। ব্যক্তিগত বিমান কিনে, পাইলট সহ সেটার খরচ বহন করারও ক্ষমতা আছে তাঁর। ল্যারি কংকলিন হলো তাঁর পাইলট। বিমানটা খুবই ভালো। তাতে উড়েছে তিন গোয়েন্দা। কংকলিনের পাশে বসে কয়েকবার ওটাকে উড়িয়েছেও মুসা।

'কখন রওনা হচ্ছি?' জানতে চাইলো কিশোর।

'কাল সকালে।'

'আচ্ছা,' ফোন রেখে দিলেন সাইমন।

গাড়ির কাজ শেষ করে মুসাকে তৈরি হয়ে নিতে বললো কিশোর। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা। আরও কিছু ছবি প্রিন্ট করার জন্যে ডার্করুমে গিয়ে ঢুকলো রবিন। টেবিলের ছবিগুলো কাছে টেনে নিলো কিশোর। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখবে, নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।

কয়েক মিনিট পর আবার ফোন করলেন মিস্টার সাইমন। জানালেন, বারোজের জ্ঞান ফিরেছে। তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিশোররা চাইলে আসতে পারে।

'এখুনি আসছি,' বলে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। ডাক দিলো রবিনকে।

হাসপাতালের গেটে দেখা হলো সাইমনের সঙ্গে। ওদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ইনফরমেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করতেই জানিয়ে দেয়া হলো বারোজের ঘর কোথায়। এলিভেটরে করে তিনতলায় চলে এলো ওরা। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফাউলার। গোয়েন্দাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ফ্যাকাসে হয়ে আছে বারোজের চেহারা। মলিন হাসি হাসলো। 'আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি। মাপ করে দেবেন। ওই বাড়িতে ঢুকে একটা গাধামি করেছি। বছরখানেক আগে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছিলেন আমাকে রেডফোর্ড।'

টাকার খুব প্রয়োজন তার, জানালো বারোজ। সে-জন্যেই উইলের পাওনাটা তাড়াতাড়ি আদায়ের জন্যে অ্যাজটেক যোদ্ধার খোঁজ করতে গিয়েছিলো। কারণ যোদ্ধাকে বের করে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেই টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 'টাকা তো পেলামই না,' আক্ষেপ করে বললো সে। 'ঘটালাম দুর্ঘটনা। এখন আরো বেকায়দা অবস্থা আমার।'

অ্যাজটেক যোদ্ধা কে, বা কি, সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে কিনা বারোজের জিজ্ঞেস করলেন সাইমন। মাথা নাড়লো অসুস্থ মানুষটা। 'অনেক দিন আগে একবার রেডফোর্ড বলেছিলেন আমাকে, অ্যাজটেকদের একজন উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে একটা দামী জিনিস পেয়েছেন। তবে সেটা কি, বলেননি। আমার ওই ভাইটা ছিলেন সাংঘাতিক চাপা স্বভাবের।'

'জিনিসটা কি আন্দাজ করতে পারেন?'

'না।'

বারোজ জানালো, রেডফোর্ড নাকি বলেছেন, জিনিসটা তাঁকে রাখতে দেয়া

হয়েছিলো পাঁচ বছরের জন্যে। তারপর আবার ফিরিয়ে দেয়ার কথা। 'আমার বিশ্বাস,' বারোজ বললো। 'এই জিনিসটার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে উইলে।'

'তাহলে এমনও তো হতে পারে,' ফাউলার বললেন। 'পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যার জিনিস তাকেই আবার ফেরত পাঠিয়েছেন মিস্টার রেডফোর্ড। উইলে সেকথা লেখার আর সুযোগ পাননি।'

মাথা নাড়লো বারোজ। 'আমার তা মনে হয় না। যদ্দূর মনে পড়ে, বছর তিনেক আগে আমাকে কথাটা বলেছিলেন রেডফোর্ড। আমাকে বিশ্বাস করতেন। অনেক গোপন কথাই বলতেন। বলেছেন, জিনিসটা তিনি যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কি জিনিস, তা বলেননি। আমিও চাপাচাপি করিনি। বাড়িতেও থাকতে পারে ওটা, কিংবা অন্য কোথাও। জানি না।'

আর কিছু বলার নেই বারোজের।

রাস্তায় নেমে কিশোর প্রস্তাব দিলো আরেকবার রেডফোর্ড এস্টেটে যাওয়ার। মেকসিকোতে যাওয়ার আগে আরও একবার খুঁজে দেখতে চায়। ওদেরকে নিয়ে চললেন ফাউলার।

সব সময় কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতি থাকে সাইমনের গাড়ির বুটে। তদন্তের সময় কাজে লাগে। নেমে গিয়ে বুট খুললেন তিনি।

তিনটে গাড়ি নিয়ে এসেছে চারজনে। নিজের গাড়ি থেকে নেমে এলেন ফাউলার। কিশোর আর রবিন নামলো রবিনের ফোক্সওয়াগন থেকে। সাইমনকে যন্ত্রপাতি নামাতে সাহায্য করতে এগোলো।

পোর্টেবল ফ্লোরোস্কোপ আর একটা মেটাল ডিটেকটর বের করা হলো। বাড়ির দেয়াল, মেঝে, ছাত, সব জায়গায় খোঁজা হলো যন্ত্রের সাহায্যে। কয়েকবার মিটমিট করে জানান দিলো যন্ত্রের বাতি, জিনিস রয়েছে। তবে সেগুলোর কোনোটারই কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হলো না।

সারাক্ষণ গোয়েন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন ফাউলার। কিছুই পাওয়া গেল না দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এভাবে হবে না। সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে, আমার ধারণা, পিন্টো আলভারোর কাছে।'

সাইমনও একমত হলেন। মনে পড়লো সেই লোকটার কথা, সন্ধ্যাবেলা যাকে তাড়া করেছিলো কিশোর আর রবিন। তার কোনো খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন উকিলকে।

'না,' জবাব দিলেন ফাউলার। 'বেনিফিশারিদের কেউ হতে পারে ভেবে, উইলে যতোজনের নাম লেখা রয়েছে, সবার খোঁজখবর নিয়েছি আমি। কেউ আসেনি ওরা। সবারই অ্যালিবাই রয়েছে,' হাসলেন তিনি। 'গোয়েন্দা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি অযথা। কিছুই করতে পারলাম না।'

'ভুল বললে,' হেসে বললেন সাইমন। 'অনেক কিছুই করেছো। এই যে খোঁজাখুঁজিটা করলে, এতে অনেক লাভ হয়েছে। আর এতো দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই তোমার। আমরা তো অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। কি করতে পারলাম? এখনও অন্ধকারেই রয়েছি!'

সেদিন আর কিছু করার নেই। অফিসে চলে গেলেন ফাউলার। সাইমন চলে

গেলেন কাজে। দুই গোয়েন্দা ফিরে এলো ইয়ার্ডে।

পরদিন সকালে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো বিমান বন্দরে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের ভেতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এলো একটা খোলা অঞ্চলে। ওখানে রাখা হয় ব্যক্তিগত বিমান। অবশ্যই ভাড়া দিতে হয়। মিস্টার সাইমনের বিমানটা দেখতে পেলো ওরা। রানওয়ের শেষ মাথায়।

হঠাৎ চলতে শুরু করলো ওটা। কিন্তু ছেলেদের দিকে এগিয়ে এলো না। বরং রানওয়ে ধরে উল্টোদিকে রওনা হয়েছে। গতি বাড়ছে দ্রুত। দেখতে দেখতে মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়াল দিলো।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা।

'আমাদের রেখেই চলে যাচ্ছে!' রবিনও কিছু বুঝতে পারছে না।

'আমার তা মনে হয় না!' উত্তেজিত শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'নিশ্চয় কিছু ঘটেছে! হাইজ্যাক করা হয়েছে প্লেনটা!'

পাঁচ

'হাইজ্যাক!' প্লেনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'কি বলছো তুমি!'

রবিনও তাকিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে বিমানটা।

'ঠিকই বলেছি,' বিমানের দিকে আর নজর নেই কিশোরের। ছুটতে শুরু করলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দিকে। 'কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখুনি।'

টাওয়ারের রিপোর্ট শুনে থ হয়ে গেল। ল্যারিই নাকি কন্ট্রোলের কাছে ক্লিয়ারেন্স চেয়েছে। তাড়াতাড়ি দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। কেন, কিছু হয়েছে নাকি? জানতে চাইলো ডিসপ্যাচার। সন্দেহের কথা জানালো কিশোর। প্লেনটাকে ফেরানোর চেষ্টা করবে, বললো ডিসপ্যাচার।

অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো কিশোর রবিন আর মুসা চুপ করে রয়েছে। তবে ওরাও ভীষণ উত্তেজিত। অবশেষে জানানো হলো ওদেরকে, কোনো সাড়াই দিচ্ছে না বিমানটা থেকে।

'হাইজ্যাকই মনে হচ্ছে,' এতোক্ষণে বিশ্বাস করলো ডিসপ্যাচার। 'ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটিকে রিপোর্ট করছি।'

তাকে বললো কিশোর, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড আর চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে গোয়েন্দা পরিচয় দিলো নিজেদের। ফীল্ডে গিয়ে তদন্ত করার অনুমতি চাইলো।

দিয়ে দিলো ডিসপ্যাচার।

তদন্তে নতুন কিছুই বেরোলো না। কয়েকজন মেকানিক ল্যারিকে বিমানে উঠতে দেখেছে। তার সাথে আর কাউকে চড়তে দেখেনি। তবে ফীল্ডে আরেকজন লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখেছে।

'লোকটা দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'চেহারা ভালোমতো দেখিনি,' জবাব দিলো একজন মেকানিক। 'আসলে দেখার প্রয়োজনই মনে করিনি। তাছাড়া অনেক দূরে ছিলো। যেটুকু দেখেছি তা হলো, বেঁটে, কালো চুল। প্লেন নিয়ে পালাবে জানলে কি আর অবহেলা করতাম!' একটা জেট এয়ারলাইনারের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। ওটার এঞ্জিনের কাজ করছিলো।

আর কিছু করার নেই এখানে। রবিন বললো, 'ওই লোকটা আমাদের রহস্যের সঙ্গে জড়িত। সেদিন রেডফোর্ড এস্টেটে তাড়া করেছিলাম যাকে, মনে হচ্ছে সে-ই। জোর করে ল্যারিকে দিয়ে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে প্লেন নিয়ে ভেগেছে।'

'হতে পারে,' কিশোর বললো। 'টাওয়ারে চলো যাই। দেখি কি হলো?'

উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ডিসপ্যাচার। ছেলেদের দেখে বললো, 'কোনো খবরই নেই প্লেনটার। বড় বড় সমস্ত এয়ারপোর্টকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরাও যোগাযোগ করতে পারছে না।'

অনেক কাজ ডিসপ্যাচারের। সাংঘাতিক ব্যস্ত। তার সঙ্গে আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। ওয়েটিং রুমে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা।

'কারণটা কি, কিছু বুঝতে পারছো?' রবিনের প্রশ্ন। 'হাইজ্যাকিং, এবং কিডন্যাপিং!'

'ল্যারির কোনো ক্ষতি না করলেই হয়,' পাইলটকে পছন্দ করে মুসা। তাকে হাতে ধরে অনেক কিছু শিখিয়েছে, বিমান চালনার। 'খাঁটি ভদ্রলোক। কিন্তু ধরে নিয়ে গেল কেন? আর প্লেনটাই বা হাইজ্যাক করলো কেন?'

'এর জবাব জানলে,' কিশোর বললো। 'হয়তো ল্যারি আর প্লেনটার খোঁজ বের করে ফেলতে পারতাম!'

'তো, এখন কি করবো? মেকসিকো যাওয়া বন্ধ?'

জোরে মাথা নাড়লো কিশোর। 'মোটেই না।'

মিস্টার সাইমনকে ফোন করার জন্যে উঠে গেল সে। কিন্তু বাড়িতে নেই ডিটেকটিভ। ধরলো তাঁর ভিয়েতনামী কাজের লোক নিসান জাং কিম। খবর শুনে সে-ও চিন্তিত হলো। বললো, কয়েক জায়গায় ফোন করে মিস্টার সাইমনকে ধরার চেষ্টা করবে। খবরটা জানাবে। তাঁকে বলবে, তিনি যেন এয়ারপোর্টে কিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আবার এসে আগের জায়গায় বসে পড়লো। দীর্ঘ হয়ে উঠলো অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। কথাবার্তা তেমন জমছে না এই উত্তেজনার সময়। খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করলো। কিছুই মাথায় ঢুকলো না। শব্দগুলোকে মনে হলো অর্থহীন।

শেষে বিরক্ত হয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। বললো, ফাউলারকে ফোন করবে। দেখতে চায় তিনি কিছু বলতে পারেন কিনা। কি আর বলবেন তিনি? খবর শুনে চুপ করে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত।

কিশোর বললো, 'কি মনে হয় আপনার? রেডফোর্ড এস্টেটে যে লোকটা এসেছিলো, সে-ই একাজ করেছে?'

'করতেও পারে। কি বলবো, বলো? ওর সম্পর্কেও তো কিছুই জানি না আমরা।'

'তা ঠিক। আপনারা তো দেখেনওনি। পুলিশ আঙুলের ছাপ পেলো, জুতোর ছাপ নিলো, তা-ও তো কিছু করতে পারছে না। ঠিক আছে, রাখলাম।'

ওয়েইটিং রুমে ফিরে এলো কিশোর। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখ। মিস্টার সাইমন চলে এসেছেন। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, ল্যারির জন্যে। প্লেনটাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না, ধারণা করলেন তিনি। 'বড় কোনো এয়ারপোর্টে নামতে সাহস করবে না হাইজ্যাকার,' বললেন তিনি। 'পুলিশের ভয়ে। কোনো খামারের মাঠে কিংবা অব্যবহৃত এয়ারফীল্ডে নামার চেষ্টা করবে।

'আমার কি মনে হয়, জানো? আরও কেউ অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্লেনটা হাইজ্যাক করেছে তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। যাতে তোমরা আর মেকসিকোতে না যাও।'

একই কথা রবিনও ভাবছে। রেগে গেল সে। 'তাই যদি হয়, তাহলে তো আরও বেশি করে যাবো আমরা। একটা হাইজ্যাকারের ভয়ে পিছিয়ে থাকবো?'

'ঠিক!' মুঠো তুলে ঝাঁকালো মুসা। 'একটা প্লেন নিয়েছে। সব তো আর নিতে পারেনি। টিকেট কেটে চলে যাবো।'

হাসলেন সাইমন। 'আমিও সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম। প্লেন নিয়ে গিয়ে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না। খুঁজে বের করে ফেলবোই। তার জন্যে তোমাদের পিছিয়ে আসার কারণ নেই। তোমরা চলে যাও।'

টিকেটের খোঁজ নিতে রিজারভেশন কাউন্টারে চলে এলো কিশোর। রবিন আর মুসা এলো খানিক পরে। ততোক্ষণে জানা হয়ে গেছে কিশোরের। মাঝরাতে একটা প্লেন ছাড়বে। মেকসিকো সিটিতে যাবে। সেটার টিকেট পাওয়া যাবে।

তাতেই রাজি তিন গোয়েন্দা। মোট কথা, যখনই হোক, যেতে পারলেই খুশি। মিস্টার সাইমনকে জানানো হলো। টাকা বের করে দিলেন তিনি, 'তিনটে টিকেট কেটে নাও।'

প্লেন ছাড়তে অনেক দেরি। ততোক্ষণ বসে থাকতে হবে। এছাড়া আর কিছু করারও নেই। বই পড়ে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো ওরা। এয়ারপোর্টের বুক কাউন্টার থেকে তিনটে পেপারব্যাক বই কিনলো তিনজনে। রবিন কিনলো একটা মিউজিকের ওপর লেখা বই। মুসা কিনলো দেশীবিদেশী খাবারের বই। আর কিশোর কিনলো মেকসিকান ইতিহাসের ওপর লেখা বই। অ্যাজটেক যোদ্ধাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা আছে ওতে।

একসময় মুখ তুলে মুসা বললো, 'প্লেন হাইজ্যাকের খবরটা বাড়িতে জানাবো ফোন করে?'

'না না, দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো কিশোর। 'শুনলেই যাবে ঘাবড়ে। আমাদের যাওয়াও বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা চলে যাওয়ার পর শুনলে শুনুকগে, তখন আর ফেরাতে পারবে না। চাচী এখন শুনলে একদম যাওয়া বন্ধ।'

অনেকক্ষণ হলো মিস্টার সাইমন চলে গেছেন। ফোন করলেন তিনি। কিশোর গিয়ে ধরলো। একটা জরুরী খবর জানালেন। 'একজন সত্যিকারের অ্যাজটেক যোদ্ধার বংশধরকে খুঁজে বের করেছি। না না, চমকে উঠো না। আমরা যাকে খুঁজছি এ-লোক সেই লোক নয়। অ্যাজটেক তো আর একজন নয় মেকসিকোতে।

কিছু তথ্য জানতে পারলাম ওর কাছে। তোমাদের কাজে লাগবে। ও হ্যাঁ, আগে আরেকটা কথা বলে নিই। লোকটা বিমানের মেকানিক। বাহুতে উল্কি দিয়ে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি আঁকা।

'অনেক প্রশ্ন করেছি লোকটাকে। বাড়ি মেকসিকোতে। পিন্টো আলভারো নামে কাউকে চেনে না। তবে টিকা আলভারো নামটা পরিচিত। ট্যাক্সকোর কাছে চমৎকার একটা হ্যাসিয়েণ্ডার নাম টিকা আলভারো। ওখানে নাকি কয়েক বছর কাজ করেছে সে। ইচ্ছে হলে ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করতে পারো।

'সত্যিকারের অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে করতে আরেকটা নাম জানলাম। সিনর ডা স্টেফানো। লোকটাকে দেখেনি সে, নাম শুনেছে।'

'কোথায় থাকে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'বলতে পারলো না। পুরানো প্রত্নতাত্ত্বিক স্পটগুলোতে নাকি ঘুরে বেড়ান। প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেন।'

'প্রত্নতাত্ত্বিক?'

'হ্যাঁ।'

আরও কয়েকটা কথার পর লাইন কেটে দিলেন ডিটেকটিভ। ফিরে এসে তথ্যগুলো বন্ধুদের জানালো কিশোর।

'সিনর ডা স্টেফানো, না? আরকিওলজিস্ট!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। 'তারমানে তাঁকে খুঁজে তুমি বের করবেই। আর তার অর্থ হলো, আমার নিস্তার নেই। পুরানো ওই পিরামিডগুলোর মাথায় আমাকে চড়িয়েই ছাড়বে।'

প্লেন ছাড়ার সময় হলো অবশেষে। ছাড়ার পর পরই চমৎকার খাবার দেয়া হলো। অনেক রাত। খাওয়া শেষ করেই ঘুমিয়ে পড়লো ওরা। ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে। রোববার। স্টুয়ার্ডেস ঘোষণা করলো, বিশ মিনিটের মধ্যেই মেকসিকো সিটিতে ল্যাণ্ড করবে বিমান। দ্রুত বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, বিমান বন্দরের ওপরে চক্কর মারছে বিশাল বিমানটা। ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নামলো বিমান।

মুসা প্রস্তাব রাখলো, 'চলো, ট্যাক্সি নিয়ে শহরটা আগে ঘুরে দেখি। এখুনি হোটেলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।'

কাজ চালানোর মতো কিছু শব্দ শিখে এসেছে তিনজনেই। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে কথা বললো একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে। হাসলো লোকটা ওদের উচ্চারণ শুনে। দেখেই বুঝে গেছে টুরিস্ট। মেকসিকোতে স্বাগত জানালো। বললো, কোনো অসুবিধে হবে না। দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে তারপর নিয়ে যাবে হোটেলে।

গাড়িতে চড়লো তিন গোয়েন্দা। এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় উঠলো ড্রাইভার। দু'পাশে পুরানো স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়িঘর, খোলা বাজার। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রেখেছে বিরাট উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।

'খুব বেশি পুরানো লাগছে না,' মুসার কণ্ঠে হতাশার সুর। যেন আশা করেছিলো, এক লাফে হাজার কিংবা পনেরোশো বছর আগের পৃথিবীতে চলে

যেতে পারবে।

'তাই নাকি?' হাসলো ড্রাইভার। 'পুরানো এলাকায় যেতে চাও? নিয়ে যাবো।'

কিছুক্ষণ এপথ ওপথ ঘুরে, অসংখ্য মোড় নিয়ে মস্ত একটা চত্বরে এসে পৌঁছলো ওরা। ড্রাইভার বেশ গর্বের সঙ্গে জানালো, 'উত্তর দিকে ওই যে গির্জাটা দেখছো, অনেক পুরানো। ১৬৬৭ সালে মহান অ্যাজটেক মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর তৈরি হয়েছিলো।'

বিশাল বাড়িটাকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। চত্বরের আরেক ধারে লম্বা আরেকটা বাড়ি দেখালো ড্রাইভার। ওটা ন্যাশনাল প্যালেস। তার উল্টো দিকে চত্বরের অন্য একধারে রয়েছে প্যালাসিও মিউনিসিপাল, এবং একটা তোরণ। তোরণের নিচে একসারি ছোট ছোট দোকান।

'হ্যাঁ,' খুশি হয়ে বললো মুসা। 'এ-জায়গাটা বেশ পুরানো!'

হঠাৎ আরেকটা ট্যাক্সি ওদের গাড়ির পাশ কাটালো। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা হাত। শাদা একটা রুমাল নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো যেন তিন গোয়েন্দার।

'সংকেত!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো কিশোর।

ছয়

'জলদি ওই গাড়িটার পাশে নিয়ে যান!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো কিশোর।

প্যাডালে চেপে বসলো ড্রাইভারের পা। লাফ দিয়ে আগে বাড়লো গাড়ি। শাঁ করে চলে এলো অন্য গাড়িটার পাশে। ভেতরে কে আছে দেখার চেষ্টা করলো তিন গোয়েন্দা।

পলকের জন্যে লোকটাকে চোখে পড়লো কিশোরের। অবাক হয়ে গেছে। 'ল্যারি কংকলিন!' বন্ধুদেরকে বললো সে। 'অন্য লোকটা মনে হয় মেকসিকান।'

এই দু'জন বসেছে পেছনের সীটে। সামনের সীটে রয়েছে আরও দু'জন। একজন ড্রাইভ করছে। হঠাৎ সামনের গাড়িটা সরে এসে কিশোরদের গাড়ির পথ রুদ্ধ করে দিলো। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতে বাধ্য হলো ড্রাইভার।

সামনের গাড়িটাও থেমে গেল। এক ঝটকায় খুলে গেল সামনের প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা। নেমে এলো ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা। কিশোরদের গাড়ির কাছে এসে ওদের ড্রাইভারের নাকের সামনে একটা ব্যাজ আর একটা আইডেনটিটি তুলে ধরে বললো, 'পুলিশ! দরজা খোলো!'

আস্তে করে হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিলো বিস্মিত ড্রাইভার। উঠে বসলো লোকটা। 'তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো!'

'কে-কেন!' তোতলাতে শুরু করলো ড্রাইভার। 'আমি বেআইনী কিছু করিনি...'

'থানায় গেলেই বুঝবে কি করেছো!' ধমক দিয়ে বললো লোকটা। 'চালাও!'

ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকালো কিশোর আর রবিন। ঢোক গিললো

মুসা। ব্যাপারটা কোনো চালবাজি? কংকলিনকে গ্রেপ্তার করবে কেন পুলিশ? বেআইনী ভাবে বিমান নামানোর দায়ে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না কিশোরের। ফিসফিসিয়ে বন্ধুদেরকে বললো, 'মনে হয় শয়তানী! পালাতে হবে! নামো!'

মাথা ঝাঁকালো মুসা। সামনের লোকটা কিছু বোঝার আগেই নিজের ব্যাগের হাতল চেপে ধরে এক ঠেলায় খুলে ফেললো দরজা। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো রাস্তায়। তার পর পরই রবিন, সবার শেষে কিশোর। তিনজনের হাতেই ব্যাগ। নেমে আর একটা মুহূর্ত দেরি করলো না। পেছন ফিরে দিলো দৌড়। চেঁচিয়ে উঠলো ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা।

ফিরেও তাকালো না তিন গোয়েন্দা। ঢুকে পড়লো গাড়ির ভিড়ে। সবই চলমান। প্রায় একসঙ্গে একাধিক হর্ন বেজে উঠলো। ব্রেক কষার পর টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠলো। ধাক্কা দেয়া থেকে ছেলেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে গাড়িগুলো। এঁকেবেঁকে দৌড় দিয়েছে ছেলেরা। যে করেই হোক ওপাশের চত্বরে গিয়ে পৌছতে চায়। কিন্তু যানবাহনের জন্যে অসম্ভব মনে হচ্ছে কাজটা।

বুঝলো এভাবে হবে না। শেষে এক বুদ্ধি বের করলো কিশোর। রবিন আর মুসাকে নিয়ে হাত তুলে একসারিতে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ির নাকের সামনে। থেমে গেল সামনের কয়েকটা গাড়ি। পেছনেরগুলোও আর এগোতে পারলো না। অবাক হয়েছে চালকেরা। কেউ কেউ গাল দিয়ে উঠলো। যারা কিশোরদেরকে দেখছে, তারা বুঝতে পারলো, রাস্তা পেরোনোর চেষ্টা করছে ওরা। যদিও এভাবে রাস্তা পেরোনো নিয়ম নয়। টীনএজারগুলো সব সময়ই খেপাটে, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। তাছাড়া এই তিনটেকে মনে হচ্ছে বিদেশী। বোধহয় আমেরিকান। অকাজ তো করবেই।

যাই হোক, সুযোগ পেয়ে একটা মুহূর্ত আর দেরি করলো না কিশোর। ছুটতে শুরু করলো। রবিন আর মুসা তার পেছনে। রাস্তা পেরিয়ে এলো একদৌড়ে।

আবার চলতে শুরু করলো গাড়ির সারি। ল্যারি যে গাড়িটাতে রয়েছে, সেটাকে কোথাও আর দেখা গেল না।

একটা স্যুটকেসের ওপর বসে কপালের ঘাম মুছে বললো মুসা, 'খাইছে! আরেকটু হলেই চাকার নিচে চলে যেতাম! এমন কাজ আর করতে বলবে না কখনও!'

'ঠিক! আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলাম!' রবিন বললো হাঁপাতে হাঁপাতে।

কিশোরও হাঁপাচ্ছে, 'এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না। বাদ দাও এখন। বেঁচে তো আছি,' হাত নাড়লো সে। 'আসল কথা বলো। গাড়িটার নাম্বার নিয়েছো?'

মাথা নাড়লো মুসা। পারেনি।

'আমি নিয়েছি,' রবিন জানালো।

'আমি শুধু দেখেছি,' মুসা বললো। 'হলুদ রঙের একটা সেডান। বাঁ পাশে পেছনের দরজায় মোটা একটা আঁচড়ের দাগ। কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা লাগিয়েছিলো।'

'আমিও দেখেছি,' কিশোর বললো। 'যাক, চমৎকার কিছু সূত্র মিললো।

গাড়িটা বের করা যাবে। পুলিশকে জানানো দরকার। চলো।'

খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে ডাকতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা গাড়ি এসে থামলো ওদের পাশে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা পরিচিত মুখ। সেই ড্রাইভার, যার গাড়িতে বিমান বন্দর থেকে উঠেছিলো ওরা। হাত নেড়ে ডাকলো, 'এসো।'

গাড়ি চালাতে চালাতে লোকটা বললো, 'কিছুদূর পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর নেমে ওদের গাড়িতে উঠে চলে গেল। হারামজাদা!'

'তারপর আমাদের খুঁজতে এলেন আপনি?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।'

'যদি এখানে না পেতেন?'

'হোটেলে চলে যেতাম। নাম তো জানিই হোটেলের।'

'লোকটা তাহলে পুলিশ নয়?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'আরে না। আস্ত শয়তান! কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো? আমাকে নয়, আসলে তোমাদেরকে আটকাতে চেয়েছিলো লোকটা।'

সব গোপন না করে কিছু কিছু কথা ড্রাইভারকে জানালো কিশোর। প্লেন হাইজ্যাক আর কংকলিনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, বললো। হলুদ গাড়িটাতে যে আমেরিকান লোকটাকে আটকে রাখা হয়েছে সে-ই ল্যারি কংকলিন, একথাও জানালো।

'হুঁ!' মাথা দোলালো ড্রাইভার। 'তাহলে তো পুলিশকে জানানো দরকার।'

'তাই জানাবো। থানায় চলুন।'

'আমার মনে হয়,' মুসা বললো। 'রুমাল নেড়ে আমাদেরকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলো ল্যারি। আমাদের নজরে পড়তে চাইছিলো।'

'কিশোর,' রবিন বললো। 'ব্যাপারটা বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়লো ল্যারি, আর জায়গা পেলো না!'

'মোটেও কাকতালীয় নয়,' কিশোর বললো। 'হয়তো ওকে রেখে আসার সময় পায়নি ব্যাটারা। তাই গাড়িতে নিয়েই ঘুরছে। আমাদের পিছে লেগেছিলো। এয়ারপোর্ট থেকেই অনুসরণ করেছে। এখানে এসে গাড়ি থামিয়ে নকল পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে আমাদেরকেও কিডন্যাপ করতে চেয়েছে।'

'হ্যাঁ, এইটা হতে পারে,' তুড়ি বাজালো রবিন। 'তা-ই করেছে। আরেকটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম। এতো কিছু যখন করছে, তার মানে অ্যাজটেক যোদ্ধা সত্যিই খুব দামী।'

গেটের কপালে বড় করে লেখা রয়েছে 'পুলিশিয়া'। ভেতরে গাড়ি ঢোকালো ড্রাইভার। পুলিশ চীফ ডা মারকাসের সঙ্গে দেখা করলো তিন গোয়েন্দা। মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন তিনি। রিপোর্ট লিখে নিলেন। তারপর জানালেন, 'স্টেটসের রিপোর্ট আমরাও পেয়েছি। প্লেন সহ পাইলট ল্যারি কংকলিনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। প্লেনটা আমাদের এয়ারপোর্টে নামেনি। তোমরা বলছো, ল্যারিকে দেখেছো। তার মানে অন্য কোথাও নেমেছে। ছোট প্লেন তো, নামার জায়গার অভাব হয় না। ঠিক আছে, আর বেশিক্ষণ লাগবে না। গাড়ির নম্বর রেখে কাজই

করেছো। ল্যারি কংকলিনের ছবিও আমরা পেয়েছি। এখুনি অ্যালার্ট করে দিচ্ছি সমস্ত পয়েন্টগুলোতে। নিশ্চিন্তে হোটেলে চলে যাও।'

'আরেকটা অনুরোধ করবো, স্যার,' কিশোর বললো। 'দু'জন লোককে খুঁজে দিতে বলবো, যদি এ-শহরে থাকে। একজনের নাম পিন্টো আলভারো,' স্যুটকেস থেকে ছবি বের করে দেখালো। 'আরেকজনকে চিনি না, শুধু নাম শুনেছি। আরকিওলজিস্ট। সিনর ডা স্টেফানো। ছবিটা কার, বলতে পারবো না। তবে ওই দুজনেরই কোন একজন হতে পারে।'

চেষ্টা করবেন, কথা দিলেন চীফ। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো ড্রাইভারকে।

সাত

ঘুমিয়ে পড়েছিলো, টেলিফোনের শব্দে জেগে গেল কিশোর। ফোন এসেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে। চীফ মারকাস। 'কে, কিশোর পাশা? এখুনি চলে এসো। তোমাদের পাইলট ল্যারি কংকলিনকে পাওয়া গেছে।'

'তাই! কোথায়?'

'এখানেই বসে আছে।'

'আসছি।'

মুসা আর রবিনকেও খবরটা জানালো কিশোর। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বললো। মুসা মন্তব্য করলো, 'বাহ্, দারুণ পুলিশ ফোর্স তো! সাংঘাতিক দক্ষ!'

নিচে নেমে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো তিনজনে। থানায় চললো।

'ল্যারি!' পাইলটকে দেখে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা।

আন্তরিক হ্যাণ্ডশেক চললো। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালো ল্যারি। সমস্ত ঘটনাটা শুনতে চাইলো কিশোর।

বিধ্বস্ত লাগছে লম্বা, একহারা লোকটাকে। মুখে চওড়া হাসি। বললো, 'লোকটা যে কোনদিক দিয়ে উঠলো, দেখিইনি। ঘাড়ের ওপর পিস্তল ঠেসে ধরে বললো, টুঁ শব্দ না করে প্লেন চালাতে। কি আর করবো। অনুমতি নিলাম। তারপর উড়লাম। তবে আমি শিওর ছিলাম, আমাকে খুঁজে বের করবেই তোমরা। কিছুতেই পিছু ছাড়বে না।'

'আজ সকালে রুমালটা দেখিয়ে একটা কাজের কাজ করেছিলেন,' কিশোর বললো। 'নইলে কিছু বুঝতে পারতাম না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো ল্যারি। 'ওরা আমাকে হুমকি দিলো, পালানোর চেষ্টা করলে মরবো। মরতাম কিনা জানি না, তবে বেরোনোর কোনো সুযোগই পাইনি। তাই তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করার পয়লা সুযোগ যেটা পেলাম, কাজে লাগালাম।'

টেলিফোন বাজলো। তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন চীফ। কথা বলতে লাগলেন। কিশোরের কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করে ল্যারি বললো, 'লোকগুলো অ্যাজটেক যোদ্ধার জিনিসের পেছনে লেগেছে। আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করেছে। আমি জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছে। ওদের কথা

থেকে বুঝলাম, জিনিসটা খুবই দামী।'

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চীফ। ল্যারি বলতে থাকলো, 'যে লোকটা আমাকে কিডন্যাপ করেছে, তার নাম বলতে পারবো না। শহরের বাইরে একটা বাতিল খামারের কাছে মাঠে নামার নির্দেশ দিলো। মুখোশ পরা আরও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিলো ওখানে। প্লেন থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে তুললো। শহরে নিয়ে এলো। একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে প্রশ্ন শুরু করলো। ওদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে আমাকে। তোমাদের কথাও জিজ্ঞেস করেছে। তোমরা মেকসিকোতে আসবে, একথা বলতে আমাকে বাধ্য করেছে ওরা।

'তারপর বের করে নিয়ে গিয়ে আবার গাড়িতে তোলা হলো আমাকে। বোধহয় বাড়িতে একা ফেলে যেতে সাহস হচ্ছিলো না। যদি পালাই। এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। বসে রইলো তোমাদের আসার অপেক্ষায়। তোমরা এলে। তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছে। তোমাদেরকেও ধরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো। ভাবলাম, সেটা ঠেকাতে হবে। বেপরোয়া হয়ে গিয়েই রুমাল দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলাম, যাতে হুঁশিয়ার হয়ে যাও।'

'খুব ভালো কাজ করেছিলেন,' রবিন বললো। 'তা না করলে লোকটাকে সত্যি সত্যিই পুলিশ অফিসার ভাবতাম আমরা। আটকা পড়তাম।'

'ওই লোকটাও ওদের দলের একজন,' ল্যারি বললো।

'আমরা তো বেরিয়ে পালালাম। তারপর কি করলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হলুদ গাড়িটা চলতে শুরু করলো। তোমাদের গাড়িটাকে কিছুদূর আসতে বাধ্য করলো নকল পুলিশ অফিসার। তারপর নেমে আবার আগের গাড়িতে উঠলো। আমাকে নিয়ে গেল ল্যাগুনিলা মার্কেটে। ওখান থেকেই পুলিশ আমাকে উদ্ধার করেছে। ভাগ্যিস, গাড়ির নম্বরটা রাখতে পেরেছিলে।'

'লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

'মনে হয় না। আমাকে বাড়িটাতে ঢোকানোর পর অন্য ঘরে গিয়ে মুখোশ খুলে ছদ্মবেশ নিয়ে ছিলো সব ক'জন। এটা আমার ধারণা। তবে ওগুলো ওদের আসল চেহারা হলে চিনতে পারবো। একটু আগে চীফকে বললাম সেকথা।'

'ও। আচ্ছা, যে লোকটা আপনাকে কিডন্যাপ করলো, তাকে চিনেছেন?'

'না। ও একবারের জন্যেও মুখোশ খোলেনি। তবে তার কথায় বুঝলাম, মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো।'

'হুঁ। লোকটা বেঁটে, কালো চুল। চেহারা আমরাও দেখতে পারিনি। আপনি আর কিছু লক্ষ্য করেছেন?'

'করেছি। দাঁত। স্বাভাবিক নয়। তেড়াবেঁকা। একটার ওপর আরেকটা উঠে এসেছে।'

এই কথাটা ধরলেন চীফ। 'দাঁতের রঙ কেমন, বলুন তো? লাল? আর সামনের দুটো দাঁত পোকায় খাওয়া? ফ্যাসফ্যাস করে কথা বলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! আপনি জানলেন কি করে?'

মাথা দোলালেন মারকাস। 'বোধহয় চিনতে পেরেছি। ওর নাম গুডু টেরিয়ানো। একটা অপরাধী দলের নেতা। হেন কুকর্ম নেই যা ওরা করে না। জেল খেটেছে কয়েকবার। পুলিশের খাতায় নাম আছে। যে বাড়িটা থেকে আপনাকে উদ্ধার করা হয়েছে মিস্টার কংকলিন, ওটা ওদের বাড়ি নয়। এক বুড়ির। পুলিশ দেখেই বুড়ি ওদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, পালানোরও সুযোগ করে দিয়েছে সে-ই। নইলে দু'একটাকে অন্তত ধরতে পারতামই। যাই হোক, বললেন যখন চোখকান সজাগ রাখবো। ধরা না পড়ে যাবে কোথায়।'

ল্যারির কথামতো সেই মাঠে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। যেখানে নামিয়েছিলো, সেখানেই রয়েছে বিমানটা। সেটা নিয়ে আবার রকি বীচে ফিরে যাবে সে। ওড়ার জন্যে অনুমতি দরকার। ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে চীফকে অনুরোধ করা হলো।

'ঠিক আছে,' বললেন চীফ। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

আরেকবার ফিসফিস করে কিশোরকে বললো ল্যারি, 'তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না, সরি।'

'যা করেছেন, অনেক করেছেন,' কিশোর বললো। 'আপনার কিডন্যাপের ঘটনাটা না ঘটলে পুলিশ এতো আগ্রহ দেখাতো না। বিপদে পড়ে যেতাম আমরা।'

পুলিশের গাড়িতে করে চলে গেল ল্যারি। তাকে বিমানটার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। তিন গোয়েন্দা থানা থেকে বেরিয়ে এলো। আলোচনা করে ঠিক করলো, ইউনিভারসিটি অভ মেকসিকোতে যাবে। খোঁজখবর করবে ডা স্টেফানো নামে আরকিওলজির কোনো প্রফেসর আছেন কিনা। শহরের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়টা। ট্যাক্সি নিলো ওরা।

পথে অনেকগুলো বাড়ি চোখে পড়লো। সুন্দর রঙ। কংক্রীটের ওপরেও লাল রঙ করা হয়েছে। চমৎকার লন আর বাগান। উজ্জ্বল রঙের ফুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি গাড়ি পৌঁছলো। অবাক বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা, 'খাইছে! দেখ, দেখ, কি সুন্দর!' হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে সে বাড়িটার একধারের মোজাইকের কাজ করা দেয়ালের দিকে। লাইব্রেরিটা রয়েছে ওখানটাতেই।

মোজাইকে আঁকা রয়েছে মস্ত এক দানবীয় মূর্তি। একজন ইনডিয়ানের। মেকসিকোর ইনডিয়ান আর স্প্যানিশ ইতিহাসের কিছুটা আন্দাজ করা যায় বাকি ছবিগুলো দেখলে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের কাছে এসে ড্রাইভারকে থামতে বললো কিশোর। নেমে ভেতরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করলো আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টটা কোথায়। ওই ডিপার্টমেন্টের আরেকজন প্রফেসর ডক্টর হ্যাসিয়ানোর কথা বলে তাকে বলা হলো তিনি হয়তো জানতে পারেন।

ভালো মানুষ প্রফেসর হ্যাসিয়ানো। বেশ আন্তরিক। তিনি বললেন, সিনর ড স্টেফানোকে চেনেন। ছবি দেখে সনাক্তও করলেন। বললেন, 'অনেক দিন দেখা হয় না। বেশি ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। স্থায়ী

কোনো ঠিকানাও নেই, অন্তত আমার জানা নেই।'

তাঁকে খুঁজে বের করার উপায় আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর বললেন, 'পাওয়া খুব মুশকিল। বেশিরভাগ সময়ই কাটায় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ-গুলোতে। ইনটারেসটিং অনেক প্রাচীন নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বের করেছে। তবে নিজে গিয়ে কখনও সরকারী লোকের কাছে কিংবা মিউজিয়ামকে দিয়ে আসেনি ওসব জিনিস, অন্য সব আরকিওলজিস্টরা যা করে। সব সময় অন্য লোকের হাতে পাঠায়।'

কিশোর বললো, ডক্টর স্টেফানোকে তার খুব দরকার। জরুরী কাজে। হেসে বললো, 'কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে পাওয়াটা খুব কঠিন হবে।'

'তা হবে। কারণ মেকসিকোতে ধ্বংসস্তূপের অভাব নেই। তার অনেকগুলোই এখনও খোঁড়া হয়নি। কোনটাতে গিয়ে বসে আছে এখন ডক্টর কে জানে।'

প্রফেসরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর বললো, 'ঠিক আছে, যাই। খুঁজে দেখিগে। ভাগ্য ভালো হলে পেয়ে যাবো।'

ওদেরকে গুড লাক জানালেন হ্যাসিয়ানো। বললেন, 'স্টেফানোকে পেলে আমার কথা বোলো। যেন দেখা করে। কয়েকটা ক্লাস নিতে বলবো। কিছু কিছু বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান তার।'

বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'আজ আর কোথাও যাওয়ার সময় নেই। কাল বেরোবো। সবচেয়ে কাছের ধ্বংসস্তূপটা হলো টিওটিহুয়াকান।'

'ওখানেই বন্ধুর ছবিটা তুলেছেন মিস্টার রেডফোর্ড, তাই না?' মুসার প্রশ্ন। 'অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাক পরিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

ফেরার পথে বইয়ের দোকান থেকে একটা ম্যাপ আর একটা চার্ট কিনলো কিশোর। হোটেলে বসে বসে তিনজনে মিলে চার্ট দেখে বের করতে লাগলো, কোন্ কোন্ ধ্বংসস্তূপে গাড়িতে করে যাওয়া যায়। রেডফোর্ডের তোলা যে ছবিগুলোর প্রিন্ট করে নিয়েছে রবিন, সেগুলোও মন দিয়ে দেখতে লাগলো। যদি কিছু বের করতে পারে!

'যেসব জায়গায় গাড়ি যায়, আগে সেখানে যাই,' রবিন বললো। 'না পেলে তারপর অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা ভাববো। কি বলো?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

টিওটিহুয়াকানের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালো মুসা। এসব পুরানো ধ্বংসস্তূপ দেখতে খুব ভালো লাগে তার। মানুষের প্রাচীন ইতিহাস জানার প্রচণ্ড কৌতূহল। মাঝে মাঝে তো দুঃখই প্রকাশ করে ফেলে, প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে জন্মালো না বলে। তার জানা আছে, টিওটিহুয়াকান হলো টোলটেকদের ধর্মমন্দির, যেটা পরে জোর করে দখল করে নেয় অ্যাজটেকেরা।

একটা ছবির ওপর আঙুল রেখে বললো সে, 'এই পিরামিডগুলো খুব উঁচু।'

'হ্যাঁ,' রবিন মাথা ঝাঁকালো। 'পিরামিড অভ দি সান।'

'সূর্যের পিরামিড,' কিশোর বললো। 'অদ্ভুত নাম, না?'

'নাম যা-ই হোক,' হাত নাড়লো মুসা। 'দয়া করে আমাকে অন্তত ওখানে চড়তে বলো না। পা পিছলালে গেছি। চূড়ায় গিয়ে বসে নেই তো সিনর স্টেফানো?'

'কি জানি,' হাসলো রবিন। 'থাকেই যদি, যাবে। আচ্ছা, পাহাড়-টাহাড় তো খুবই বাইতে পারো। ভয় লাগে না। তার মানে উচ্চতা নিয়ে কোনো ফোবিয়া নেই তোমার। পিরামিডে চড়ার ব্যাপারে এতো ভয় কেন?'

'সত্যি কথা বলবো?'

'বলো।'

'পিরামিড হলোগে প্রাচীন রাজারাজড়াদের কবর। ওখানে ভূত থাকবেই...'

'একেবারে রাজকীয় ভূত,' কিশোর বললো। 'হাহ্ হাহ্ হা!'

'না না, ঠাট্টা করো না, সত্যি আছে...'

'ভালোই তো হবে তাহলে। কখনও তো সত্যিকারের ভূত দেখনি। এবারে দেখা হয়ে যাবে।'

'তারমানে আমাকে পিরামিডে চড়িয়েই ছাড়বে!'

'তুমি তো আর একা উঠবে না। প্রয়োজন হলে আমরাও তোমার সঙ্গে থাকবো।'

গুম হয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারলো, ওরা তার কথা শুনবে না।

পরদিন সোমবার। সকালে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। হোটেলের কাছেই একটা রেন্ট-আ-কার সার্ভিস রয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলো। একটা কনভারটিবল গাড়ি। টিওটিহুয়াকানে চললো।

দুপুরের দিকে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে নাম পড়লো মুসা, 'গ্রোটো রেস্টুরেন্ট। হুঁ, খাবার-দাবার ভালোই হবে মনে হচ্ছে। চলো, ঢুকে পড়া যাক।'

রেস্টুরেন্টটা কোনো বাড়ির মধ্যে নয়। পাহাড়ের একটা গুহার ভেতরে। একসময় প্রাচীন ইনডিয়ানদের একটা গোত্র বাস করতো এখানে।

গাড়ি সরিয়ে এনে রাস্তার পাশে পার্ক করলো কিশোর। তিনজনে মিলে ঢুকে পড়লো গুহার ভেতর। মুসার অনুমান ভুল হয়নি। খাবার সত্যিই চমৎকার। একবার খেয়ে আরেক প্রস্থ খাবারের অর্ডার দিলো মুসা। তাকে সাবধান করলো কিশোর, 'বুঝেশুনে খেও। অনেক ওপরে উঠতে হবে আমাদের। পেট বোঝাই থাকলে অসুবিধে হতে পারে।'

'সে দেখা যাবে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা।

অবশেষে পিরামিডের কাছে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা। মিশরীয় পিরামিডের মতো তিনটে দেয়াল নয় মেকসিকান পিরামিডের, দেয়ালগুলো সমানও নয়। চারটে দেয়াল, এবং ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ক্রমশ সরু হয়ে। যতোই ওপরে উঠেছে, চেপে এসেছে দুই পাশ, ফলে চূড়াটা হয়ে গেছে একেবারে চোখা। শত শত ধাপ সিঁড়ি। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ওরা। দর্শকের যেমন অভাব নেই, প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও কমতি নেই। অসংখ্য জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। মুসার আশঙ্কা হতে লাগলো, এভাবে চলতে থাকলে কোনোদিন ধসিয়েই দেবে পিরামিডটা। তবে তার আশঙ্কা অমূলক। কোনো কিছু নষ্ট না করে কিভাবে খুঁড়তে হয় জানা আছে

আরকিওলজিস্টদের।

'কি সর্বনাশ!' মুসার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো রবিন। 'এসেছিলাম একটা ভূতুড়ে শহর দেখতে। কিন্তু এ-যে বাজার বানিয়ে ফেলেছে।'

রবিনের কথায় কান নেই মুসার। তাকিয়ে রয়েছে চূড়ার দিকে। 'আরিব্বাপরে, কি উঁচু। সূর্যের পিরামিড নামটা ভুল রাখেনি। মনে হয় একেবারে সূর্য ছুঁতে চাইছে। ওখানে উঠতে হবে আমাকে?'

'ভয় পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ভূতের ভয় আর পাচ্ছি না এখন। এতো লোকের সামনে ভূত আসবে না। উচ্চতার ভয়ই পাচ্ছি। এতো উঁচুতে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরেই না পড়ে যাই!'

'পড়বে না,' কিশোর বললো। 'যদি ইনডিয়ান কায়দায় ওঠো। ওরা কক্ষণো সিঁড়ির দিকে মুখ করে উঠতো না। পাশ থেকে উঠতো। নামার সময়ও একই ভাবে নামতো।'

'ছাগল ছিলো আর কি,' মুসা বললো। 'পাশ থেকে ওঠা তো আরও কঠিন।'

'হয়তো। কিন্তু তাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সিঁড়িগুলো কি সরু দেখছো না?'

'তাহলে উঠবেই?'

'হ্যাঁ। সবাই ওঠো। ডা স্টেফানোকে পাই আর না পাই, এতোদূরে এসে পিরামিডে চড়ার সুযোগ ছাড়বো না।'

এগিয়ে গিয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। দেখাদেখি রবিনও গেল। সবার শেষে মুসা। কিছুদূর উঠে আর পাশ থেকে ওঠার কথা মনে রইলো না তার। কিংবা পরোয়া করলো না। সামনের দিকে মুখ করে উঠতে আরম্ভ করলো। বড় জোর পাঁচ কি সাতটা ধাপ পেরিয়েছে, তার পরই পা পিছলালো। সোজা থাকার অনেক চেষ্টা করলো। পারলো না কিছুতেই। পড়ে গেল। গড়াতে শুরু করলো শরীরটা।

সরাসরি উঠতে গিয়ে সবার আগে চলে গিয়েছিলো সে। পেছনে পড়েছিলো কিশোর আর রবিন। কারণ ওরা তাড়াহুড়ো করেনি। মুসার পতন ঠেকাতে চেষ্টা করলো ওরা। পারলো তো না-ই, ওরাও পড়ে গেল।

গড়াতে গড়াতে নিচে পড়তে লাগলো তিনটে শরীর।

চেঁচামেচি শুনে একবার ফিরে তাকিয়েই আবার যার যার কাজে মন দিলো যারা মাটি খুঁড়ছিলো। গুরুত্বই দিলো না। বোঝা যায়, এভাবে গড়িয়ে পড়াটা এখানে নতুন নয়। দেখে দেখে গা সওয়া হয়ে গেছে ওদের।

আট

বিশাল পিরামিডের একেবারে গোড়ায় এসে বন্ধ হলো গড়ানো। হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে বসলো তিনজনেই। হাঁটু আর কনুই ছড়ে গেছে। আরও কয়েক জায়গায় ব্যথা পেয়েছে, তবে হাড়টাড় ভাঙেনি।

'বলেছিলাম না ভূত আছে!' কোলাব্যাঙের স্বর বেরোলো মুসার কণ্ঠ দিয়ে। 'ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে!'

'তোমার মাথা!' রেগে গেল কিশোর। 'কতোবার সাবধান করলাম ওভাবে

উঠতে পারবে না! ইনডিয়ানদের শত শত বছরের অভিজ্ঞতাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে গিয়েই এই বিপদটা বাধালে। ভাগ্যিস বেশি ওপরে উঠে অকাজটা শুরু করোনি!'

রবিন কাঁপছে। মুখ থেকে ধুলো আর মাটি মুছে বললো, 'মুখ-টুখ মোছো না। ভাঁড়ের মতো লাগছে তো।'

কিশোর আর রবিনের মুখের অবস্থা দেখেই নিজেরটা কেমন হয়েছে আন্দাজ করে ফেললো মুসা। মুছতে মুছতে বললো, 'বাপরি বাপ! মনে হলো গত একহাজার বছর ধরে একটানা গড়াগড়ি খেয়েছি। জাহান্নামে যাক সূর্যের পিরামিড। আমি আর এর মধ্যে নেই,' দু'হাত নাড়লো সে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'কিন্তু আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

উঠতে শুরু করলো আবার সে। পিছু নিলো রবিন। পুরো আধ মিনিট সেদিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুসা। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ওরা দু'জনে পারলে সে পারবে না কেন? উঠতে শুরু করলো সে-ও। তবে এবার আর তাড়াহুড়ো করলো না। নিয়মও লঙ্ঘন করলো না। ধীরে ধীরে উঠে এলো ওরা চূড়ার কাছে চওড়া বেদিমতো জায়গাটায়।

'এক সময় একটা শহর ছিলো বটে!' অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে রবিন। 'আর এসব মন্দির এতো কষ্ট করে তৈরি হয়েছে শুধু মানুষ খুনের জন্যে! ভাবতে কেমন লাগে না? এখানে এনে বলি দেয়া হতো মানুষকে।'

'বইয়ে পড়েছি,' হাত তুলে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে মুসা বললো। 'একসময় ওখানে নাকি লক্ষ লোকের বাস ছিলো। ওটাই পিরামিড অভ দি মুন। চাঁদের পিরামিড, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর রবিন।

যেটাতে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে অবিকল একই রকম ওই পিরামিডটাও, কেবল আকারে ছোট।

একটা মন্দির দেখিয়ে কিশোর বললো, 'ওটা তৈরি হয়েছিলো একজন বিদেশীর সম্মানে।'

'কী!' মুসা বললো। 'আমি তো জানতাম, হাজার বছর আগেই তৈরি হয়েছে ওটা। স্প্যানিয়ার্ডরা এখানে আসার আগে।'

'তা-ই হয়েছিলো। কেন, কিংবদন্তীটা শোনোনি? শাদা চামড়া, নীল চোখ, লম্বা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ এসে হাজির হয়েছিলো সাত সাগরের ওপার থেকে, পালকে ঢাকা সাপের পিঠে চড়ে? সেজন্যেই সাপ ছিলো প্রাচীন মেকসিকানদের কাছে পবিত্র। ওই মানুষটার নাম দিয়েছিলো ওরা কোয়েৎজাল-কোয়াটল। তখনকার ইনডিয়ানদের চেয়ে অনেক অনেক জ্ঞানী ছিলো সেই লোক। তাদেরকে শিখিয়েছিলো কি করে বিল্ডিং তৈরি করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, পাথর কুঁদে শিল্প সৃষ্টি করতে হয়।'

এই গল্প খুব ভালো লাগছে মুসার। 'অ্যাজটেকদের সঙ্গে বাস করতো সেই লোক?'

'না। ওরা আসার অনেক আগে থেকেই সেই লোক ছিলো সেখানে। তার মৃত্যুর পর তাকে দেবতা বানিয়ে ফেললো ইনডিয়ানরা। কোয়েৎজালকোয়াটল ইনডিয়ানদের অনেক দেবতার একজন।'

দেখা হয়েছে। আবার নামতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। অর্ধেক নামার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, 'এই দেখ দেখ! ওই যে! ছবির লোকটার মতো লাগছে না?'

'সিনর স্টেফানো!' মুসা বললো।

'হতে পারে,' বললো রবিন। তবে নামার গতি বাড়ানোর কোনো চেষ্টা করলো না। এতো ওপর থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরতে চায় না।

গোড়ায় নেমে আর লোকটাকে দেখতে পেলো না ওরা। ভাবলো, আরেক পাশে চলে গেছে। দ্রুত হেঁটে আরেক পাশে চলে এলো তিনজনে। নেই লোকটা। প্রায় দৌড়াতে শুরু করলো তিনজনে। পুরো পিরামিডের চারপাশে এক চক্কর দিয়ে এলো। আশ্চর্য! কোথাও দেখা গেল না লোকটাকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লো মুসা। 'পাগল হয়ে গেছি আমরা! কি সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি! এসবের কোনো মানে হয়? পুরো মেকসিকো শহর ঘুরে এলেও এতো কষ্ট লাগতো না।'

তিনজনের মধ্যে মুসাই সব চেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে। তারই যখন এই অবস্থা, কিশোর আর রবিনের অবস্থা অনুমানই করা যায়। এক জায়গায় সামান্য ঘাস দেখে তার ওপর শুয়েই পড়লো রবিন। 'ওই অ্যাজটেক ব্যাটাদের ফুসফুসের ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ!'

কিশোরও বসে হাঁপাচ্ছে। সে ভাবছে লোকটার কথা। বললো, হয়তো অন্য পিরামিডটার কাছে চলে গেছে সে। দেরি করলে আর পাওয়া না-ও যেতে পারে। তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠলো তিন গোয়েন্দা। ছুটলো চাঁদের পিরামিডের দিকে। সেখানেও পাওয়া গেল না লোকটাকে। এর পর গেল ওরা কোয়েৎজালকোয়াটলের মন্দিরের কাছে। এটাকেও ছোটখাটো আরেকটা পিরামিডই বলা চলে। চারপাশে চক্কর দি[illegible] এলো একবার।

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'লোকটা বে[illegible] কে জানে! সিনর স্টেফানো না-ও হতে পারে। আমাদের দেখলে পালাবেন কেন ডক্টর?'

'তা-ও তো কথা,' বললো মুসা। 'কিন্তু তিনি যদি স্টেফানোই হন, আর আমাদের দেখে এভাবে পালাতে থাকেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো কিভাবে? রবিন, ঠিক দেখেছো তো?'

'দেখলাম তো আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে,' রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'তবে সিনর স্টেফানোই কিনা, শিওর নই। মনে হলো তাঁরই মতো।'

'হুঁ। সব মেকসিকানের তো একই চেহারা! অন্তত আমার আলাদা মনে হয় না।'

আবার মন্দির দেখায় মন দিলো ছেলেরা। পাথর কুঁদে দারুণ সব দৃশ্য আর কল্পিত জীবজন্তুর মূর্তি আঁকা হয়েছে। ফণা তুলে রেখেছে মস্ত এক সাপ। হাঁ করা। ভয়ংকর দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে। কয়েকটা সাপ রয়েছে ওরকম। ওগুলোর মাঝে

দেখা গেল একজন মানুষকে। বোধহয় ওই লোকই কোয়েৎজাল-কোয়াটল। সেই প্রাচীনকালে এরকম শিল্প সৃষ্টি কি করে সম্ভব হয়েছিলো, যখন পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ছিলো না, ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। বিড়বিড় করে বললো, 'এর সামনেই ছবি তুলেছিলেন মিস্টার রেডফোর্ড। এখানে অ্যাজটেক যোদ্ধার কোনো সূত্র লুকিয়ে নেই তো?'

বিশাল মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে রবিন বললো, 'এখানে চিঠি কিংবা দলিল লুকানো আছে ভাবছো? এক মাস লেগে যাবে খুঁজে বের করতে।'

তবে আপাতত সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না ওরা। যে কোনো সময় ফিরে আসতে পারবে কোয়েৎজালকোয়াটলের মন্দিরে। এখন জরুরী কাজ হলো সিনর স্টেফানোকে খুঁজে বের করা। এখানে যখন নেই, অন্য কোনো ধ্বংসস্তূপে রয়েছেন হয়তো।

আবার গাড়িতে এসে উঠলো ওরা। হোটেলে ফিরে চললো।

নয়

হোটেলে ফিরে কাপড় ছেড়েও সারতে পারলো না কিশোর। টেলিফোন বাজলো। পুলিশ চীফ মারকাস ফোন করেছেন। বললেন, 'এক ঘন্টা যাবৎ তোমাদেরকে ধরার চেষ্টা করছি। কোথায় গিয়েছিলে?'

'টিওটিহুয়াকানে। কেন?'

'একটু আগে খবর পেলাম, একটা গুজব নাকি ছড়িয়ে পড়েছে; মনটি অ্যালবানে একজন আরকিওলজিস্ট একটা বিরাট আবিষ্কার করেছেন। তিনিই তোমাদের লোক নন তো?'

'সিনর স্টেফানো?'

'বুঝতে পারছি না। রিপোর্ট পেয়েছি, একজন লোক নাকি শহরে এসে ঢুকেছে। বলে বেড়াচ্ছে খবরটা। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বললো, আরকিওলজিস্ট নাকি তাঁর পরিচয় ছড়াতে নারাজ। সে-জন্যেই মনে হচ্ছে আমার, তিনি সিনর স্টেফানো।'

'তাহলে আর দেরি করবো না,' কিশোর বললো। 'এখুনি বেরিয়ে পড়বো। দেখি তাঁকে ধরতে পারি কিনা। তা আবিষ্কারটা কি করেছেন?'

'লোকটা বলতে চাইলো না। অনেক চেষ্টা করলাম,' একটু থামলেন মারকাস। তারপর বললেন, 'এখুনি যাবে? মনটি অ্যালবানের রাস্তা কিন্তু ভালো না। আমি অবশ্য কখনও যাইনি। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। অনেক দূর। আজকে না গিয়ে কাল সকালেই যাও।'

'আচ্ছা।'

লাইন কেটে গেল।

রবিন আর মুসাকে খবরটা জানালো কিশোর। তারপর ম্যাপ খুলে বসলো। মেকসিকোর উত্তরপুবে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল দূরে ছোট একটা শহর আছে।

নাম অকজাকা। যেতে হবে ওই শহরের ভেতর দিয়ে।

রবিন বললো, 'একদিনে মনটি অ্যালবানে যাওয়া সম্ভব না। এক কাজ করবো। অকজাকায় গিয়ে হোটেলে উঠবো। ওখান থেকে আবার রওনা হওয়া যাবে।'

পরদিন খুব সকালে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে ধরে যেতে হয়। প্রচণ্ড ভিড়। দুই ঘন্টা লেগে গেল পর্বতের কাছাকাছি আসতেই। ভিড় না থাকলে আরও অনেক আগেই চলে আসতে পারতো। সরু একটা শাখা পথ ঢুকে গেছে পর্বতের ভেতরে। সেই পথ ধরে চললো ওরা। একটু পর পরই তীক্ষ্ণ মোড়। ওপাশ থেকে সাড়া না দিয়ে গাড়ি এলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মোড় ঘোরার সময় তাই বার বার হর্ন দিতে লাগলো কিশোর। তার পরেও আরেকটু হলেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছিলো একবার। ওপাশ থেকে তীব্র গতিতে ধেয়ে এলো একটা গাড়ি। এরকম মোড়েও গতি কমায়নি। শাঁই শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পর্বতের দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে গেল কিশোর। অন্য গাড়িটা পড়ে যাচ্ছিলো পাশের গভীর খাদে, নিতান্ত কপাল জোর আর ড্রাইভারের দক্ষতার কারণে বেঁচে গেল।

অপূর্ব দৃশ্য পর্বতের। দেয়াল কোথাও খাড়া, কোথাও ঢালু। বেরিয়ে রয়েছে গ্র্যানাইটের বিচিত্র স্তর। ছোটবড় চূড়ার কোনো কোনোটাতে রোদ পড়ে জ্বলছে। যেন কড়া লাল রঙে রাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। ছবির মতন।

ঢালে জন্মে রয়েছে নানা জাতের ক্যাকটাস। টিউলিপ ফুলের মতো দেখতে খাটো ম্যাগুই ক্যাকটাস থেকে শুরু করে দৈত্যাকার ক্যানডেল ক্যাকটাস, সবই আছে। যেমন বিচিত্র চেহারা, তেমনি রঙ।

ছড়ানো, সমতল একটা জায়গায় পৌঁছলো ওরা। জায়গাটা পর্বতের ওপরেই। ক্যাকটাসের এক ঘন ঝাড় হয়ে আছে ওখানে।

'এই, দাঁড়াও তো!' কিশোরের কাঁধে হাত রাখলো মুসা।

গাড়ি থামালো কিশোর। গরুর গাড়ির চাকার মতো সমব্রেরো হ্যাট পরা একজন মানুষ মাটিতে ঝুঁকে বসে কি যেন করছে একটা ম্যাগুই কাকটাসের গোড়ায়। তার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারলো কি করছে লোকটা। ক্যাকটাসের ভেতরে এক ধরনের রস হয়। পানির বিকল্প হিসেবে সেটাকে খাওয়া যায়। তা-ই বের করছে লোকটা।

এদিকে অনেক টুরিস্ট আসে। এখানকার লোকেরা তাই ইংরেজি বোঝে, বলতেও পারে কিছু কিছু। এই লোকটাও পারে। সহজেই তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললো মুসা।

রবিন আর কিশোরও নেমে এলো। খিদে পেয়েছে তিনজনেরই। গাড়িতে লাঞ্চ প্যাকেট আর পানির বোতল রয়েছে। নামিয়ে আনা হলো। ক্যাকটাসের ছায়ায় খেতে বসলো তিনজনে। লোকটাকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজি হয়ে গেল সে।

লেখাপড়া মোটামুটি জানে লোকটা। তার নাম ডিউগো। মেকসিকো সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারলো সে। অনেক মজার মজার গল্প, ইতিহাস।

ইনডিয়ানদের সামাজিকতা, দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলির কাহিনী, এসব অনেক কিছুই জানে সে। বলে গেল গড়গড় করে। আর বলতেও পারে বেশ গুছিয়ে, সুন্দর করে। শুনতে ভালোই লাগে।

একসময় পিন্টো আলভারোর কথা জিজ্ঞেস করে বসলো কিশোর।

'না, চিনি না,' মাথা নাড়লো ডিউগো। 'অকজাকায় থাকে?'

'জানি না,' পকেট থেকে ছবি বের করে দেখালো কিশোর। 'এই আরেকজন লোক, সিনর স্টেফানো। আরকিওলজিস্ট। নাম শুনেছেন?'

'সি. সি.' দ্রুত জবাব দিলো লোকটা। 'দেখিনি কখনও। তবে শুনেছি, সিনর স্টেফানো নামে একজন লোক এখানকার ধ্বংসস্তূপগুলোতে খুঁড়তে আসে। বহুবার এসেছে।'

'মনটি অ্যালবানে যায়?'

'তা বলতে পারবো না।'

লোকটাকে আরও কিছু প্রশ্ন করে, ধন্যবাদ এবং গুডবাই জানিয়ে উঠে এলো তিন গোয়েন্দা। গাড়িতে উঠলো। এবার ড্রাইভিং সীটে বসলো মুসা।

'নাহ্, একবিন্দু এগোতে পারছি না,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। 'লাভের মধ্যে শুধু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, রহস্যের কিছুই করা যাচ্ছে না!'

অকজাকাতে একটা হোটেলে উঠলো ওরা। ম্যানেজারের সঙ্গেও আলাপ করে দেখলো কিশোর। কিছুই জানতে পারলো না। মনটি অ্যালবানে যে একটা বড় আবিষ্কার হয়েছে, এই খবরটা জানে না পর্যন্ত ওই লোক।

রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'আজই যাবে?'

ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'ছ'টা বাজে। এখুনি খেয়ে নিলে যাওয়া যায়।'

'তাহলে দেরি করছি কেন?' ভুরু নাচালো মুসা। 'বসে গেলেই হয়।'

খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। এবারের গন্তব্য মনটি অ্যালবানের ধ্বংসস্তূপ, যেখানে সিনর স্টেফানো যুগান্তকর এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছেন বলে গুজব ছড়িয়েছে।

'যেতে নিশ্চয় রাত হবে না, কি বলো?' দুই সহকারীর উদ্দেশ্যে বললো কিশোর।

'হলেই বা কি?' রবিন বললো। 'শুনেছি, রাতে ওসব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখার আলাদা মজা। আর চাঁদ থাকলে তো কথাই নেই।'

ওরা যখন বেরোলো তখন সাতটা বাজে। অচেনা পথঘাট। শুরুতেই পথ হারালো। ব্যাপারটা ধরতে পারলো প্রথমে রবিন। ম্যাপ দেখে। ঠিক পথে এসে ওঠার জন্যে এবড়োখেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা ধরতে হলো।

প্যান প্যান শুরু করলো মুসা, 'এভাবে চললে ঘন্টাখানেক পরেই আবার খিদে পাবে। নাহ্, ঘোড়ার ডিমের অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে আর বের করা হলো না এযাত্রা!'

গতি খুব ধীর। কিশোরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলো, 'আসল রাস্তায় উঠতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'এঞ্জিনটা এখন বন্ধ না হলেই হয়,' মুসা বললো।

'কিংবা টায়ার পাংচার,' পেছনের সীট থেকে বললো রবিন।

তবে এঞ্জিন বন্ধ কিংবা টায়ার পাংচার কোনোটাই হলো না। খোয়া বিছানো একটা পথে এসে উঠলো গাড়ি। গতি বাড়ালো মুসা। পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত ধ্বংসস্তূপের দিকে উঠে চললো। পথ ভুল করায় বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। সেটা পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করছে মুসা। কিন্তু তার পরেও দিনের আলো থাকতে থাকতে পর্বতের ওপরের চ্যাপ্টা সমতল জায়গাটায় পৌঁছতে পারলো না, যেখানে রয়েছে মনটি অ্যালবানের ধ্বংসস্তূপ। সূর্য ডুবে গেছে। চাঁদ উঠেছে।

'টর্চ না নিয়ে নেমো না,' সতর্ক করলো কিশোর, 'যতোই চাঁদ উঠুক। মুসা, ভূতের ভয় লাগছে না তো?'

'লাগলেই আর কি করবো?'

হাসলো কিশোর। রবিন কিছু বললো না।

চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে মনটি অ্যালবানের পিরামিড আকৃতির মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, আর বাড়িঘরগুলোকে। গা ছমছমে পরিবেশ। বিশাল এক চত্বর দেখতে পেলো ওরা। চারপাশ ঘিরে তৈরি হয়েছে পাথরের বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝের ফাঁকে গাড়ি রাখলো মুসা। টর্চ হাতে নেমে পড়লো তিনজনে। জায়গাটার বিশালত্বের কাছে অনেক ক্ষুদ্র মনে হলো নিজেদেরকে। স্তব্ধ, নীরব। অথচ এককালে নিশ্চয় গমগম করতো লোকজনে।

ডানে বাঁয়ে তাকালো মুসা। রবিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার বুক অভ নলেজ, এর ইতিহাস কিছু জানো নাকি?'

'কিছু কিছু। পনেরোশো শতকের গোড়ার দিকে গড়ে উঠেছিলো এই শহর। তারপর হাত বদল হলো। স্প্যানিশরা এসে দখল করে ফেললো। নতুন মনিবেরা অনেক কিছু রদবদল করে তৈরি করলো নতুন শহর। মূল জায়গা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে। আর পুরানো শহরটাকে ব্যবহার করতে লাগলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজে। তাদের বড় বড় নেতাকেও কবর দিলো এখানে।'

'তার মানে পুরোপুরিই ভূতুড়ে শহর!'

একটা পাথরের দেয়ালের পাশে চলে এলো ওরা। নাচের দৃশ্য আঁকা হয়েছে খোদাই করে। 'খাইছে!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা। 'দেখ দেখ!'

ঝট্ করে ঘুরে গেল অন্য দুটো টর্চের আলো। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'কি?'

'জ্যান্ত! ওগুলো জ্যান্ত!'

হাসতে শুরু করলো কিশোর আর রবিন। 'এই ভূতই তোমার সর্বনাশ করবে! মাথাটা একেবারেই খারাপ করে দিয়েছে!' একটা মূর্তির গায়ে হাত বোলালো কিশোর। 'এই দেখ, একেবারে মরা! পাথর!'

'যতো যা-ই বলো,' হাসিতে যোগ দিতে পারলো না মুসা। 'আমি কিছু নড়তে দেখেছি! মনে হচ্ছে চারপাশের কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে সমস্ত প্রেতাত্মা! আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে!'

'বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো কিশোর। 'কি কাজে এসেছি ভুলে গেছ? সিনর স্টেফানোকে খুঁজতে।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে না। অন্তত এই বেলা। ধ্বংসস্তূপে যদি কাজ

করেনও রাতের বেলা এখন কি করতে আসবেন?'

'কোথায় ঘুমান, সেটা খুঁজে বের করবো,' বললো বটে, কিন্তু জোর নেই কিশোরের গলায়। জায়গাটায় এসেই তার মনে হয়েছে, কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। স্টেফানো এখানে সত্যি আছেন কিনা, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই গুজব ছড়িয়ে ওদেরকে টেনে আনা হয়েছে এখানে, কে জানে!

'অ্যাই, দেখ!' বলে উঠলো রবিন। হাত তুলে দেখালো।

সামনে পিরামিডের মাথায় একটা আলো মিটমিট করছে। লণ্ঠনের আলোর মতো।

'পেয়েছি!' উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বললো রবিন। 'নিশ্চয় সিনর স্টেফানো! কাজ করছেন ওখানে!'

সন্দেহ গেল না কিশোরের। কেন যেন মনে হতে লাগলো, পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁকিবাজি। ধোঁকা। মনটি অ্যাল-বানেতে এসে ডা স্টেফানোর প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ির গল্পটা ভুয়া। ওরকম কিছু হলে, আর এতো বড় একটা আবিষ্কার ঘটলে, হোটেলের ম্যানেজারের অন্তত না জানার কথা নয়। তার সন্দেহের কথাটা বললো দুই সহকারীকে।

'কিন্তু কেন এই গল্প বানিয়ে বলতে যাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'শুধু আন্দাজ করতে পারি,' জবাব দিলো কিশোর। 'নিশ্চিত হয়ে এখনও কিছু বলতে পারবো না। আমার বিশ্বাস, টোপ দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই একাজ করা হয়েছে। আমাদের শত্রুরা জানে, শুনলে তদন্ত করতে আসবোই আমরা। হয়তো কোনো কারণে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কিংবা ভুল পথে ঠেলে দিয়ে সময় নষ্ট করাতে চেয়েছে। যা-ই হোক,' আলোটার দিকে দেখালো সে। 'ওটা দেখতে যাবো। কিসের আলো জানা দরকার। খুব সাবধানে থাকবে।'

ওই আলো দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না মুসার। দশজন ষণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে লাগতেও ভয় পায় না সে। কিন্তু 'রোগাটে একটামাত্র ভূত' হলেও তার ধারেকাছে যেতে রাজি নয় সে। তবে কিছু করার নেই। কিশোর যখন যেতে বলেছে, যেতেই হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। তার পেছনে রইলো রবিন। আরেকবার দ্বিধা করে যা থাকে কপালে ভেবে মুসাও পা রাখলো সিঁড়িতে। চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ। 'কিশোর, সাবধান, ব্যাটারা…'

কথা শেষ করতে পারলো না সে। প্রচণ্ড বাড়ি লাগলো মাথায়। বেহুঁশ হয়ে গেল।

দশ

ঝট্ করে ঘুরে তাকালো কিশোর আর রবিন। চোখে পড়লো দুটো ছায়ামূর্তি। ওদেরই দিকে আসছে। দু'জনের হাতেই হকিস্টিক।

পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। রুখে দাঁড়ালো দুই গোয়েন্দা। লোকদুটোকে আরও কাছে আসার সময় দিলো। তারপর ওরা আঘাত হানার আগেই নড়ে উঠলো কিশোর আর রবিন। একজন ব্যবহার করলো জুডোর কৌশল, আরেকজন চালালো কারাত। ফেলে দিলো লোক দুটোকে। তারপর উঠতে শুরু করলো সিঁড়ি বেয়ে। চূড়ায় কি আছে দেখতেই হবে।

কথাটা রবিনের মনে পড়লো প্রথমে। 'ফাঁদ নয়তো? হয়তো আলোর টোপ জ্বেলে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে ব্যাটারা!'

'তা-ও দেখবো, কি আছে!' বলে পেছন ফিরে তাকালো কিশোর, লোকদুটো আসছে কিনা দেখার জন্যে। তাকিয়েই থমকে দাঁড়ালো। লোকগুলো নেই। মুসাও নেই। তার মাথায় যে বাড়ি মারা হয়েছে, একথা জানে না কিশোর কিংবা রবিন। ভেবেছে, সে-ও আসছে পেছনে। উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি, লোকগুলোর সঙ্গে মারপিট করার সময় মুসা সেখানে ছিলো না। 'মুসা কই?'

রবিনও ফিরে তাকালো। বেশ উজ্জ্বল হয়েছে জ্যোৎস্না। ভালোমতোই চোখে পড়ছে নিচের সিঁড়িগুলো। কোথাও দেখা গেল না মুসাকে। 'হয়তো কোথাও লুকিয়েছে। লোকগুলোকে দেখেই আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।'

'তা হতেই পারে না!' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'তুমিও মুসাকে চেন। মানুষের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানোর বান্দা ও নয়।'

'তাহলে গেল কোথায়?'

চাঁদের আলোয় যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলো দু'জনে। কোথাও মুসাকে দেখা গেল না। কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো মানুষ নেই। যে দু'জন লোক বাড়ি মারতে এসেছিলো, তাদেরও চোখে পড়লো না। আশ্চর্য!

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো দুই গোয়েন্দা। 'মেরে বেহুঁশ করে ধরে নিয়ে যায়নি তো!' রবিন বললো।

'দু'জন বাদেও আরও লোক থাকতে পারে,' কিশোর বললো। 'নিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

চূড়ায় উঠে কিসের আলো জ্বলছে দেখার আগ্রহটা আপাতত চেপে রাখতে বাধ্য হলো কিশোর। মুসার কি হয়েছে দেখা দরকার আগে। তাড়াতাড়ি নেমে চললো সিঁড়ি বেয়ে। শুধু চাঁদের আলোর ওপর ভরসা না করে টর্চও জ্বাললো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে খুঁজতে লাগলো মুসাকে। চিহ্নই নেই। তবে কি সত্যিই কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল?

'ব্যাপারটা কি···' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

পাথরের একটা বাড়ির দরজায় দু'জন লোককে দেখা গেল। সোজা সেদিকে দৌড় দিলো দুই গোয়েন্দা। কিন্তু হারিয়ে গেল লোকগুলো। এই এলাকা ওদের পরিচিত। যখন খুশি বেরোচ্ছে, যখন খুশি লুকিয়ে পড়ছে। বাড়িটার কাছে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করলো দু'জনে, লোকগুলোকে পেলো না। কয়েক মিনিট পরে একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো।

'চলে যাচ্ছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। 'তবে একটা ব্যাপার শিওর।

মুসা ওদের সঙ্গে নেই।'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'যে বাড়িটা থেকে বেরোলো, তাতে ঢুকিয়ে রেখে যায়নি তো?'

'চলো, দেখি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললো দু'জনে। শূন্য ঘর। মুসার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলো রবিন। পাথরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুললো সে চিৎকার। কিন্তু মুসার সাড়া নেই।

'দু'জনকে যেতে দেখেছি,' কিশোর অনুমান করলো। 'আরও লোক থাকতে পারে।ওরা হয়তো টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলেছে মুসাকে। তাহলে এখানে চেঁচামেচি করে লাভ হবে না।'

তবু চুপ করলো না রবিন। চেঁচিয়েই চললো মুসার নাম ধরে। কিশোর খুঁজে চলেছে। ভালো মতো না খুঁজে বেরোবে না এখান থেকে।

পায়ের ওপর শরীরের ভার বদল করলো সে। 'কি যেন শুনলাম!'

কান পাতলো দু'জনেই।

চাপা একটা গোঙানির মতো শব্দ শোনা গেল।

'বাড়ির আরও ভেতরে!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর।

পাথরের দেয়াল। দরজা খুঁজতে লাগলো ওরা। ঢোকার পথ। একজায়গায় বুক সমান উঁচু চারকোণা একটা ফোকর দেখতে পেলো। কয়েকটা পাথর পড়ে রয়েছে আশেপাশে। এককালে দরজাই ছিলো, এখন আর সেটা বোঝার উপায় নেই। পাল্লা-টাল্লা কিছু নেই। আর কোনো পথ না দেখে সেটা দিয়েই ঢুকে পড়লো দু'জনে। আরও স্পষ্ট হলো গোঙানিটা।

আরেকটা ফোকর চোখে পড়লো। সেটা দিয়ে ছোট আরেকটা ঘরে চলে এলো ওরা। মুসাকে দেখতে পেলো। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জ্ঞান পুরোপুরি ফেরেনি।

হাঁটু গেড়ে তার দু'পাশে বসে পড়লো দু'জনে। মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছে। একপাশ ফুলে উঠেছে গোল আলুর মতো। এছাড়া শরীরের আর কোনো জায়গায় জখম নেই।

'পানি দরকার ছিলো,' কিশোর বললো। 'তাহলে তাড়াতাড়ি হুঁশ ফেরানো যেতো।'

যেন তার কথা কানে যেতেই চোখ মিটমিট করলো মুসা। শূন্য দৃষ্টি।

'মুসাআ!' একই সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠলো রবিন আর কিশোর। কিশোর যোগ করলো, 'ভালো আছো তো, মুসা?'

কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না যেন মুসা। তবু কনুইয়ে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে বসলো।

'চলো, বাইরে চলো,' কিশোর বললো। 'তাজা বাতাস পেলে ভালো লাগবে। চলো, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

দু'দিক থেকে ধরে মুসাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো কিশোর আর রবিন। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে বাইরে বেরোলো মুসা। কয়েকবার জোরে

জোরে শ্বাস টানলো। অনেকটা সুস্থ বোধ করলে ভার সরিয়ে আনলো বন্ধুদের কাঁধ থেকে।

'বাড়ি মেরেছিলো, না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ম-মনে হয়,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলো মুসা। ঝাড়া দিয়ে যেন ঘোলাটে মগজ পরিষ্কার করতে চাইলো। 'তোমরা ভালোই আছো মনে হয়। ভালো। লোকদুটোকে দেখলাম, হকিস্টিক হাতে তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করেও সারতে পারলাম না। ধাঁ করে মেরে বসলো আমাকে। তারপর সব কালো। আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলে, না?'

'হ্যাঁ,' রবিন বললো। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। নিজে মার খেয়ে আমাদের বাঁচিয়েছো।'

'আরে না,' হাত নাড়লো মুসা। 'অতোটা হীরো নই আমি। চিৎকার না করলেও আমাকে মারতো ওরা। কারণ আমিই ছিলাম সবার পেছনে,' আবার টলে উঠলো সে।

তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললো কিশোর আর রবিন। একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিলো জিরিয়ে নেয়ার জন্যে। আপাতত হোটেলে ফেরারই সিদ্ধান্ত নিলো। মুসাকে ধরে ধরে নিয়ে এগোলো গাড়ির দিকে। কিশোর আশঙ্কা করছে, লোকগুলো কোথাও লুকিয়ে থেকে ওদের ওপর চোখ রাখছে। সুযোগ পেলেই হয়তো বেরিয়ে এসে আবার হামলা চালাবে।

কিন্তু না, কেউ বেরোলো না। নিরাপদেই গাড়িতে উঠতে পারলো ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসলো কিশোর। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলো, কে লোকগুলো? কোথা থেকে এলো? কেন পিছু লেগেছে ওদের? অ্যাজটেক যোদ্ধাকে যারা খুঁজছে, তাদেরই কেউ? তদন্ত করা থেকে বিরত করতে চাইছে ওদেরকে?

একই ভাবনা চলেছে মুসা আর রবিনের মনেও। মুসা বললো, 'আমি সব ভজঘট করে দিলাম। কিশোর, পিরামিডের ওপরে কে আলো জ্বেলেছিলো, জেনেছো? শয়তান লোকগুলোই গিয়ে উঠেছিলো ওখানে?'

'মনে হয় না,' কিশোরের দৃষ্টি রাস্তার ওপরে নিবদ্ধ। 'ওরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে চায়। অতো খোলা জায়গায় যাবে না। কাল দিনের বেলা আবার যাবো মনটি অ্যালবানে। দেখি কোনো জবাব মেলে কিনা।'

আর কিছু বললো না মুসা। আহত জায়গাটা ব্যথা করছে। মাথা ঘুরছে অল্প অল্প। আগামী দিন রবিন আর কিশোরের সঙ্গে বেরোতে পারার শক্তি পাবে বলে মনে হলো না তার। তবে রাতের বেলা ভালো একটা ঘুম দিতে পারলে বলা যায় না, সুস্থও হয়ে যেতে পারে সকালে।

হোটেলে ঘরে পৌঁছেই বিছানায় গড়িয়ে পড়লো মুসা। 'কাপড় খোলারও শক্তি নেই!'

'দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি,' কিশোর বললো।

সে আর রবিন মিলে প্রথমে মুসার জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর খুললো জুতো আর মোজা। সবশেষে প্যান্ট। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো মুসা। মাঝে মাঝে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললো, 'কি করো, কি করো!'

শার্ট খুলতে গিয়ে বুক পকেটে একটা কাগজ পেলো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যাই মুসা, এটা কি? এই কাগজটা?'

'আমি কোনো কাগজ রাখিনি...'

ভাঁজ খুলে ফেললো রবিন। পড়ে বিস্ময় ফুটলো চোখে। তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। ব্যাপারটা নজর এড়ালো না তার। জিজ্ঞেস করলো, 'কি?'

নীরবে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো রবিন।

কিশোরও পড়লোঃ বাড়ি যাও। আমাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। কথা না শুনলে মরবে।

এগারো

'পুলিশকে জানানো দরকার,' কিশোর বললো চিন্তিত ভঙ্গিতে। আলোচনা করে দু'জনেই একমত হলো। মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে, সে এসবের কিছু জানলো না।

হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, রাতে এখন রাস্তায় বেরোনো উচিত হবে কিনা। প্রশ্নটা অবাক করলো লোকটাকে। যেন বুঝতে পারছে না, রাতের বেলা আর দিনের বেলা রাস্তায় বেরোনোর কি তফাৎ থাকতে পারে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে কিনা, একথা কিশোর বুঝিয়ে বললে ম্যানেজার জবাব দিলো, অকজাকার পুলিশ খুবই সতর্ক। এখানে কোনো রকম অঘটন ঘটে না।

'তাই নাকি?' না বলে পারলো না রবিন। 'এই তো খানিক আগেই আমার বন্ধুকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে দিলো কয়েকটা ডাকাত। ঘটে না মানে?'

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে ম্যানেজার বললো, 'তাহলে ওরা বাইরের লোক। এখানকার লোক খারাপ না।'

এই লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, বুঝতে পেরে, থানাটা কোথায় জেনে নিয়ে রবিনকে সহ বেরিয়ে এলো কিশোর। তখন ডিউটিতে রয়েছেন ক্যাপ্টেন ডগলাস। মনটি অ্যালবানে যা যা ঘটেছে খুলে বললো তাঁকে দু'জনে।

ভ্রূকুটি করলেন অফিসার। 'তাই! এখানে অপরাধ খুব কমই ঘটে! আশ্চর্য! কাগজটা এনেছো?'

বের করে দিলো রবিন। পড়তে পড়তে ভাঁজ পড়লো ডগলাসের কপালে। মুখ তুলে বললেন, 'হুঁ, বুঝতে পারছি। একদল তরুণ আছে এই এলাকায়, "বেশি দেশপ্রেমিক"। তাদের উদ্দেশ্যটা ভালোই, তবে মাঝেসাঝে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে দেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে। আইন বিরোধী কাজ করে বসে।'

'ওরা কি করে,' জানতে চাইলো কিশোর।

ক্যাপ্টেন জানালেন, 'বাইরে থেকে কেউ এলেই তাদের পেছনে লাগে। তাদের ধারণা, যে-ই আসুক, মেকসিকো থেকে প্রাচীন নিদর্শন সব বের করে নিয়ে যাবে। ঠেকানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগে ওরা। বাইরের কেউ কিছু আবিষ্কার করলে কেড়ে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে জমা দেয়,' হাসলেন তিনি। 'অকজাকার স্টেট মিউজিয়াম সাংঘাতিক। দেখলে বুঝবে। অনেক অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে ওখানে।'

'বাইরে থেকে কেউ এলেই যে তারা চোর হবে,' প্রতিবাদের সুরে বললো রবিন। 'তা ঠিক নয়।'

'আমরা সেটা বুঝি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কিন্তু ওই মাথা গরম ছেলেগুলোকে বোঝানো শক্ত। ফ্যানাটিক।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো কিশোর, তথ্য বের করে নিতে চাইলো ডগলাসের কাছ থেকে, 'দু'জন লোককে খুঁজতে এসেছি আমরা। ঠিক বেড়াতে আসিনি। সে-জন্যেই গিয়েছিলাম মনটি অ্যালবানে। একজনের নাম পিন্টো আলভারো, আরেকজন ডা স্টেফানো। তিনি আরকিওলজিস্ট।'

'আরকিওলজিস্ট? নাম শুনেছি,' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'আর পিন্টো আলভারো অনেক আছে এদেশে। ক'জনের কথা বলবো? কাছেই থাকে একজন। পিন্টো আলভারো রবার্টো হারমোসা আলবার্টো সানচেজ।'

চোখ কপালে তুললো রবিন। 'একজনের নাম, না তিনজনের?'

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'একজনেরই। ম্যাটাডর।'

'মানে বুল ফাইটার?' ভুরু কোঁচকালো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ডগলাস।

'না, তাকে আমাদের দরকার নেই। আমরা যাকে খুঁজছি, ও আর যাই হোক, বুল ফাইটার নয়।'

'তবে কি আরেকজন আরকিওলজিস্ট?'

'তা হতে পারে।'

'হুঁ। আরকিওলজিস্টেরও অভাব নেই এদেশে। মেকসিকান তো আছেই, বাইরে থেকেও প্রচুর আসে। শুনেছি, খুব বড় একজন আরকিওলজিস্ট কাজ করছেন এখন মনটি অ্যালবানে। তিনিই ডা স্টেফানো হতে পারেন, জানি না।'

কয়েকটা সেকেণ্ড নীরবে ভাবলেন পুলিশ অফিসার। 'তোমাদেরকে খুব একটা সাহায্য করতে পারছি না। দেখ, তোমরা যদি কিছু বের করতে পারো। তবে নোটটা রেখে দিলাম। অতি দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ রইলো। আবার যদি কিছু করে ধরতে পারবো। খুব সাবধান। ওরা ডেনজারাস। বুঝেই তো গেছ সেটা।'

হোটেলে ফেরার সময় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কিশোর। আসলেই কি দেশপ্রেমিক তরুণেরা হামলা করেছে ওদের ওপর? নাকি অ্যাজটেক যোদ্ধাকে যারা খুঁজছে, তারা?

'কাল সকালেই বেরোতে হবে,' রবিন বললো। বোঝা গেল একই ভাবনা চলেছে তার মাথায়ও। 'আর দেরি করা যায় না। মনটি অ্যালবানে গিয়ে তদন্ত করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় এই রহস্যের সমাধান করে ফেলা উচিত।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।

পরদিন সকালে রাক্ষুসে খিদে পেয়ে গেল যেন মুসার। ফল, সিরিয়াল, ডিম, গরুর মাংস ভাজা, আর বড় বড় দুটো পাঁউরুটি দিয়ে নাস্তা সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুললো। অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। তাকে নোটটার কথা জানালো রবিন আর

কিশোর। রাতে যে থানায় গিয়েছিলো সেকথাও বললো। চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মনটি অ্যালবানে যাচ্ছো নাকি?'

'নিশ্চয়,' কিশোর বললো।

'চলো, আমিও যাবো। ব্যাটারা এলে বাড়ি মারার শোধ না নিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়।'

'না, তোমার আজ ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। শরীর এখনও ঠিক হয়নি। ওখানে ঘোরার অনেক ধকল, সহ্য করতে পারবে না। ঘরে বসে থাকতে ভালো না লাগলে বরং আরেক কাজ করো, শহরে স্টেট মিউজিয়ামে চলে যাও। কিউরেটরের সঙ্গে আলাপ করতে পারো ইচ্ছে হলে। জানার চেষ্টা করবে অ্যাজটেক যোদ্ধা সম্পর্কে। সূত্র পেয়েও যেতে পারো।'

'তা মন্দ বলোনি। মিউজিয়াম দেখতে ভালোই লাগে আমার।'

কাপড় পরে দুই সহকারীকে নিয়ে নিচে নামলো কিশোর। রকি বীচের খবর জানা দরকার। মিস্টার সাইমনকে ফোন করলো। এখানকার সমস্ত খবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কতখানি এগিয়েছেন। ডিটেকটিভ বললেন, 'প্রায় কিছুই না। জ্যাক আর আমি কয়েকবার করে গিয়েছি রেডফোর্ড এস্টেটে, লাভ হয়নি।' জ্যাক ফাইবার তাঁর সহকারী, আরেকজন তুখোড় গোয়েন্দা।

সাইমনের কথা থেকে নতুন একটা খবরই জানতে পারলো কিশোর, তা হলো, যে গাছটায় অ্যাজটেক যোদ্ধার মাথা আঁকা আছে, তাতে আরও একটা ছবি আঁকা রয়েছে। 'ছোট একটা তীর,' জানালেন তিনি। 'খুব ভালো করে না তাকালে চোখেই পড়ে না। দেখে মনে হলো কোনো কিছু নির্দেশ করতে চেয়েছে। আমি আর জ্যাক অনেক জায়গায় খুঁড়েছি, পাইনি কিছু।'

আর কাউকে এস্টেটে রহস্যজনক ভাবে ঢুকতে দেখা গেছে কিনা, কিশোরের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'না। পুলিশ কড়া নজর রাখছে।' তারপর কিশোরদেরকে সাবধান থাকতে বলে, গুড লাক জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। শহরের দিকে চলে গেল মুসা। কিশোর আর রবিন মনটি অ্যালবানের দিকে। হোটেলের নিউজ স্ট্যাণ্ড থেকে মনটি অ্যালবানের ওপর লেখা একটা পুস্তিকা কিনে নিয়েছে কিশোর।

দিনের আলোয় পুরানো শহরটাকে অনেক বেশি জমকালো মনে হলো রাতের চেয়ে। সত্যি, দেখার মতো। এতো প্রাচীন কালে যখন যান্ত্রিক সুবিধা বলতে গেলে ছিলোই না, তখন কিভাবে এরকম একটা শহর গড়া হয়েছিলো, দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো দু'জনে। বিরাট বিরাট মন্দির, স্তম্ভ, প্রাকার, পিরামিড তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। প্রাকারের গায়ে নানারকম চিত্র আঁকা হয়েছে পাথর কুঁদে। পাথরের তৈরি মূর্তিও রয়েছে অনেক। রাতের বেলা যে পিরামিডের ওপরে আলো দেখা গিয়েছিলো, তার নিচে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। চ্যাপ্টা চূড়ায় উঠে এলো। ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে পুরো শহরটা দেখা যায়।

একবার তাকিয়েই সূত্র খুঁজতে শুরু করলো কিশোর। একটা ভাঙা পাথরের

টুকরো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার। আস্ত বড় কোনো পাথর থেকে ভেঙে আনা হয়েছে টুকরোটা, দুই বাই তিন ফুট, চার ইঞ্চিমতো পুরু। একটা কোণ ভাঙা। একটা ছবি খোদাই করা রয়েছে ওটাতে।

'অ্যাজটেক যোদ্ধা!' উত্তেজনায় স্বাভাবিক স্বর বেরোলো না রবিনের, ফিসফিসিয়ে বললো। 'আশ্চর্য! এটা এখানে কেন?'

'হয়তো এটাই নিতে উঠেছিলো লোকটা। তাড়াহুড়োয় বা অন্য কোনো কারণে ফেলে গেছে। হয়তো মূল্যবান কোনো আবিষ্কার।'

'কি জানি!' পাথরটা তোলার চেষ্টা করলো কিশোর। বেজায় ভারি। দু'জনের পক্ষে বয়ে নেয়াই মুশকিল। হাত থেকে ফেলে দিলে ভেঙে নষ্ট হতে পারে। খুব সাবধানে জিরিয়ে জিরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো ওরা। নিরাপদেই নামিয়ে আনলো অবশেষে। আর কেউ নেই তখন। একেবারে নির্জন। বোধহয় দর্শকদের আসার সময় হয়নি এখনও।

পাথরটাকে গাড়ির বুটে রেখে দিয়ে এলো ওরা। মুসাকে যেখানে বাড়ি মারা হয়েছিলো, সেজায়গাটায় এসে দেখতে লাগলো কিছু পাওয়া যায় কিনা। 'গাইড বুক বলছে,' কিশোর বললো। 'এটা সাত নম্বর কবর। অনেক মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। স্টেট মিউজিয়ামে রাখা আছে ওগুলো।'

আরও অনেক খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। যে ঘরটায় মুসাকে ফেলে রাখা হয়েছিলো, সেটাতেও খুঁজলো। কিছু পাওয়া গেল না।

আর থাকার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। তাছাড়া পাথরটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। হতো না, যদি ওটাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি আঁকা না থাকতো।

হোটেলে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, ওদেরকে চোর ভেবে বসতে পারে। সোজা অকজাকার মিউজিয়ামে চলে এলো ওরা। কিউরেটরের সঙ্গে দেখা করলো।

পাথরটা অফিসে এনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর আরও নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন কিউরেটর। অবশেষে মুখ তুললেন, 'ভালো। খুব ভালো। তবে সাংঘাতিক কিছু না। এরকম জিনিস পাওয়া যায়।'

'কোনোই বিশেষত্ব নেই?' নিরাশই হয়েছে কিশোর।

'আছে,' ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিউরেটর বললেন। 'কোণের কাছে খরগোশের ছবি আর কয়েকটা বৃত্ত আঁকা আছে দেখ। এটা একটা অ্যাজটেক ক্যালেণ্ডার। খরগোশ দিয়ে বছর গুনতো ওরা। একে বলে খরগোশ বছর। আমাদের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী এটা পনেরোশো দশ সাল।'

'কিন্তু এটা বের করলো কে?' রবিনের প্রশ্ন। 'পিরামিডের মাথায় নিশ্চয় আপনাআপনি ওঠেনি?'

'না, তা তো নয়ই,' মাথা নাড়লেন কিউরেটর। 'হয়তো কোনো কবরের ভেতরে পেয়েছে কেউ।'

'কিন্তু ওখানে গেল কি করে?' কিশোর বললো। 'পিরামিডের ওপরে?'

একথার জবাব দিতে পারলেন না কিউরেটর। তাঁর কাছেও রহস্যময় লাগলো ব্যাপারটা।

মিউজিয়াম থেকে ফেরার পথে বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই বোঝালো কিশোর, 'জবাব একটাই হতে পারে। আমাদেরকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। পেয়েছে কোনো কবরের ভেতর। ভেঙে এনেছে। ফেলে রেখেছে আমাদেরকে বোঝানোর জন্যে, যে এটাই অ্যাজটেক যোদ্ধা। যাতে আমরা এটা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যাই।'

'কারা?'

'আর কারা? যারা আমাদের পিছে লেগেছে। যারা মুসাকে বাড়ি মেরেছে। যারা হুমকি দিয়ে নোট লিখেছে। এভাবে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই মনটি অ্যালবানে টেনে এনেছে আমাদের।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে, যারা নোট লিখেছে তারা দেশপ্রেমিক তরুণের দল নয়?'

'না। ওটাও আরেকটা চালাকি। তরুণদের ওপর নজর ফেলতে চেয়েছে। আমাদের এবং পুলিশের। নিজেরা আড়ালে থাকতে চেয়েছে।'

বারো

খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে হোটেলে ফিরলো মুসা। হাতে একটা মূর্তি। ছোট। জানালো, এক স্যুভনিরের দোকান থেকে অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তিটা কিনে এনেছে সে। কিশোরকে দেখিয়ে বললো, 'এটাই, কি বলো?'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'এ-হতেই পারে না। সাধারণ মূর্তি। এখনকার কুমোরদের তৈরি...'

'কিন্তু সেলসম্যান যে বললো, কবর খুঁড়ে পাওয়া!'

'ফাঁকি দিয়েছে। মিথ্যে কথা বলেছে বিক্রি করার জন্যে। আসল জিনিস হলে ওটা দোকানে যেতো না, মিউজিয়ামে থাকতো।'

'চোরাই মালও তো হতে পারে?'

'উঁহুঁ। তাহলে অতো খোলাখুলি বেচতে পারতো না। পুলিশের ভয় তো আছেই। সব চেয়ে বেশি ভয় তরুণ দেশপ্রেমিকদের।'

'তা বটে! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। নইলে একরকমের এতো মূর্তি আসতো না দোকানে...'

'মানে?'

'লোকটা বললো, আরও অনেকগুলো মূর্তি নাকি ছিলো। এটার মতোই। অ্যাজটেক যোদ্ধা। কাল একটা লোক সব কিনে নিয়ে গেছে। এটা পড়ে ছিলো বাক্সের তলায়, কাল পাওয়া যায়নি। আজ বাক্সের খড়টড় ফেলতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।'

'কাল পেলে এটাও কিনে নিয়ে যেতো?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাই তো মনে হয়,' জবাব দিলো মুসা।

'কে কিনেছে, জিজ্ঞেস করেছো?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'এতো আগ্রহ কেন অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তির ওপরে?'

'না তো!'

'ভুল করেছো। চলো।'

'কোথায়?'

'দোকানে। লোকটা কেমন দেখতে, জিজ্ঞেস করবো। আমার বিশ্বাস, এই লোকই আমাদের পেছনে লেগেছে। আমাদের মতোই অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজছে সে-ও।'

মনটি অ্যালবানে গিয়ে কি পেয়েছে, খুলে বললো মুসাকে রবিন আর কিশোর। মুসা জানালো, সে-ও মিউজিয়ামে গিয়েছিলো। খোঁজখবর করেছে অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে। তদন্তের কাজে লাগতে পারে তেমন কিছু জানতে পারেনি।

'দোকানে গেলে জানতে পারবো,' কিশোর বললো। 'যোদ্ধার ব্যাপারে না হোক, লোকটার ব্যাপারে পারবোই। চলো।'

নানারকম স্যুভনিরে ঠাসা দোকানটা। ছোটখাটো আরেকটা মিউজিয়ামের মতোই লাগে। কাঁচের শো-কেসে সাজানো রয়েছে নানারকম প্রাচীন অস্ত্র, আধুনিক নির্মাতাদের তৈরি। পিস্তল আর ছুরি রয়েছে নানারকম। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে শিরস্ত্রাণ, ধাতব পোশাক আর বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন আকৃতির তলোয়ার, ভোজালি।

ডাক শুনে পেছনের ছোট একটা ঘর থেকে বেরোলেন মাঝবয়েসী একজন হাসিখুশি মানুষ। কি চায়, জিজ্ঞেস করলেন।

কাউন্টারের দিকে নির্দেশ করে মুসা জানতে চাইলো, 'ওই লোকটা কোথায়?'

'কে? ও, হুগো? খেতে গেছে। আমি এই দোকানের মালিক। বলো, কি চাই?'

'না, কিছু চাই না। খানিক আগে একটা পুতুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাজটেক যোদ্ধা। ওটা কি আসল?'

হাসলেন দোকানের মালিক। একই সাথে বিরক্তও হলেন। 'তাই বলেছে বুঝি? এই হুগোটাকে নিয়ে আর পারি না। কতোবার মানা করেছি, মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রির দরকার নেই। শোনে না। তো, আসল নয় জেনে নিরাশ হয়েছো? ফেরত দিতে চাও?'

'না, সেজন্যে আসিনি,' এগিয়ে এলো কিশোর। 'আসলে, অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।'

'তা বাবা, আমি তো সেটা ভালো বলতে পারবো না। আমি সামান্য দোকানদার। আরকিওলজিস্ট নই। বলতে পারবে আরকিওলজিস্টরা। সব চেয়ে ভালো হয়, মিউজিয়ামে চলে যাও, কিউরেটরের সঙ্গে দেখা করো…'

'করবো। আচ্ছা, খুব মাল বিক্রি হয় আপনার দোকানে, তাই না?'

'মোটামুটি।'

'কি ধরনের জিনিস বেশি চলে?'

'এই ছুরি, পিস্তল, এসব। অস্ত্র।'

'মূর্তি?'

'খুব বেশি না। তবে কাল একটা আজব ব্যাপার ঘটেছে। প্রায় দেড় ডজন অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তি কিনে নিয়ে গেছে একজন। মনে হলো, আরও থাকলে আরও কিনতো। পাগল! অথচ ওই মূর্তি খুব একটা বিক্রি হয় না এখানে।'

সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা কেমন? ওরকম একজনকে চিনি আমরা, মূর্তি কেনার পাগল,' শেষ কথাটা মিথ্যে বললো সে। কথা আদায়ের জন্যে। তবে জবাব শুনে বুঝলো, একেবারে মিথ্যে বলেনি। লোকটা ওদের পরিচিতই। অন্তত দেখেছে ওকে। ল্যারি কংকলিনকে যে লোক কিডন্যাপ করেছিলো, ভুয়া পুলিশ অফিসার সেজে যে ওদের ট্যাক্সিতে চড়েছিলো, তার সঙ্গে মূর্তি কিনেছে যে লোক, তার চেহারার বর্ণনা হুবহু মিলে গেল।

অ্যানটিক আর স্যুভনির নিয়ে আরও কয়েকটা কথা বলার পর আচমকা প্রশ্ন করে বসলো কিশোর, 'আচ্ছা, পিন্টো আলভারো নামে কাউকে চেনেন আপনি? আপনার বাড়ি তো এখানে। নামটা শুনেছেন?'

'ওরকম নামে তো কতো লোকই আছে এখানে।'

'তা আছে। তবে একজন বিশেষ লোককে খুঁজছি আমরা,' পকেট থেকে ছবি বের করে দেখালো কিশোর।

চশমা লাগিয়ে ভালো করে ছবিটা দেখলেন মালিক। ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন। 'বোধহয় চিনি। কয়েকবার দেখেছি একে। আমার দোকানেও ঢুকেছে। টুলেট্রীর কাছে থাকে। ওখান থেকে মিটলা খুব কাছে তো, গিয়ে খুঁড়তে সুবিধে হয় বোধহয়। মেকসিকান ধ্বংসস্তূপের একজন বিশেষজ্ঞ এই লোক।'

টুলেট্রী কী এবং কোথায় জিজ্ঞেস করলো কিশোর। শুনে ধক্ করে উঠলো বুক। বুঝলো, পেয়ে গেছে। এই লোককেই খুঁজছে। মনে পড়লো, স্লাইডের বিশাল গাছটার কথা।

মিটলা হলো একটা ধ্বংসস্তূপ, মালিকের কাছে জানতে পারলো কিশোর। ওই দোকানে ম্যাপও আছে। ওখানকার একটা ভালো ম্যাপ কিনে নিয়ে, ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলো হোটেলে।

ডা স্টেফানোর কথা জিজ্ঞেস করেছে দোকানদারকে, কিছু বলতে পারেননি তিনি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না, বুঝতে পারছে কিশোর। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি করে আলভারোকে বের করতে পারলেই বেরিয়ে আসবেন ডা স্টেফানো। কোনো সন্দেহ নেই আর এখন তার।

তেরো

হোটেলে ফিরে ম্যাপ নিয়ে বসলো কিশোর। আর গাইডবুক পড়তে লাগলো রবিন। মুসা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিটলা ধ্বংসস্তূপে যাওয়ার পথেই পড়ে টুলে ট্রী। ম্যাপ থেকে মুখ তুলে কিশোর বললো, 'দরকার হলে একেবারে মিটলাতেই চলে যাবো। মনে আছে, একটা ছবিতে ছিলো, বিশাল এক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক?'

'সিনর স্টেফানোকেও ওখানেই পাবে ভাবছো?' মুসার প্রশ্ন। 'টুলেট্রীতে?'

'পেতেও পারি। কিংবা মিটলাতে। টুলেট্রী থেকে মিটলা বেশি দূরে নয়।'

গাইডবুক থেকে মুখ তুলে রবিন বললো, 'জানো, গাছটা তিন হাজার বছরের পুরানো! আমেরিকান কন্টিনেন্টের সম্ভবত সব চেয়ে পুরানো গাছ ওটা।'

'কি গাছ?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'সাইপ্রেস। সবুজ সাইপ্রেস।'

'এত্তো বছর বেঁচে আছে! খাইছে! ইস্, আমি যদি এতোদিন বাঁচতাম! কতো কিছু দেখতে পারতাম, খেতে পারতাম!'

তার কথায় হেসে ফেললো কিশোর। 'তোমার খালি খাওয়ার কথা। এক কাজ করলেই পারতে। গাছ হয়ে গেলেই হতো। মাটির ওপর শেকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, আর খালি রস টানতে মাটি থেকে…'

'নাহ্, গাছ হয়ে লাভ নেই। বেঁচে থাকে বটে। নড়তেচড়তে পারে না, পাখিরা বাসা বাঁধে, পায়খানা করে। লোকে মড়াৎ করে ডাল ভেঙে ফেলে, পাতা ছেঁড়ে। না, বাপু, মানুষ হয়ে বাঁচতে পারলেই খুশি হতাম আমি…'

'ভূত হলে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

ভেবে দেখলো মুসা। 'তা হতাম। মানুষ হওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। কেউ দেখতে পেতো না আমাকে। যা ইচ্ছে করতে পারতাম। যেখানে খুশি যেতে পারতাম। আর খাওয়া! সে তো যখন যা খুশি! যে রেস্টুরেন্টে যা পাওয়া যায়, যা খেতে ইচ্ছে করতো…নারে ভাই, ভূতই হওয়া উচিত ছিলো।'

বেরোনোর সময় ম্যানেজার জানতে চাইলো, আবার কোথায় যাচ্ছে ওরা। এতো তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছে দেখে কৌতূহল হয়েছে লোকটার। জানালো কিশোর।

টুলেট্রীর দিকে গাড়ি চালালো মুসা। ম্যাপ দেখে রাস্তা বাতলে দিতে থাকলো কিশোর। শহর ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল আসার পর মস্ত গাছটার দেখা মিললো। মুসা বললো, 'ওই যে, সাইপ্রেস গাছের দাদার দাদা।'

পেছন থেকে রবিন মন্তব্য করলো 'শুধু দাদার দাদা না, তারও অনেক বেশি।'

গাছটাকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে একটা পার্ক। দর্শনীয় জিনিস। টুরিস্টরা আসে। গাড়ি থেকে নেমে হাঁ করে গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করছে না, তিন হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে ওই গাছ। পৃথিবীর কতো পরিবর্তনের নীরব সাক্ষি। ওই গাছের বিশালত্ব আর বয়েসের কাছে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র মনে হতে লাগলো ওদের।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলো রবিন।

গাছের কাণ্ডে একটা সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে, তাতে গাছটা সম্পর্কে তথ্য। কাণ্ডের বেড় একশো ষাট ফুট। বয়েস, তিন হাজার বছর। জাত, সবুজ সাইপ্রেস।

চারদিকে অনেকখানি ছড়িয়ে রয়েছে ডালপালা। গোড়ার চারপাশ ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা।

নীরবে গাছের কাছে এগিয়ে এলো বারো বছরের এক কিশোর। তিন গোয়েন্দাকে গাছের গোড়ায় চক্কর দিতে দেখে অবাক হয়নি। এই দৃশ্য বহুবার

দেখেছে সে। বুঝতে পেরেছে, ওরা বিদেশী, টুরিস্ট। তার জানা আছে, টুরিস্ট-দেরকে তথ্য জানাতে পারলে খুশি হয়ে পয়সা দেয়। সেই লোভেই এসেছে সে।

ঠিক যা ভেবেছিলো ছেলেটা, তা-ই ঘটলো। তাকে দেখেই কাছে ডাকলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'কি নাম তোমার?'

'পিকো।'

'এই গাছটার কথা কি জানো তুমি?'

'সঅব। কয়েক পেসো পেলে বলতে পারি।'

'পাবে,' বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। কয়েকটা মুদ্রা বের করে ফেলে দিলো ছেলেটার বাড়ানো হাতে। দাত বের করে হাসলো পিকো। পয়সাগুলো ময়লা প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়ে বললো, 'কি জানতে চান?'

'এই গাছের পুরো ইতিহাস।'

সত্যিই জানে ছেলেটা। গড়গড় করে বলে যেতে লাগলো। গাইডবুকের সঙ্গে তার কথার সামান্যতম অমিল হলো না। আরও নতুন তথ্য দিলো সে, 'হনডুরাসে যাওয়ার পথে এই গাছের নিচেই জিরোতে বসেছিলেন বিখ্যাত স্প্যানিশ যোদ্ধা করটেজ।'

কথায় কথায় অ্যাজটেক যোদ্ধার কথায় চলে এলো কিশোর।

'অনেক যোদ্ধাই আছে। কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'তা তো জানি না। বিশেষ কার নাম জানো তুমি?'

'অনেক অনেক আগে একজন নামকরা যোদ্ধা ছিলেন, অ্যাজটেকদের মহান নেতা। ম্যাক্সিল ডা স্টেফানো।'

চট্ করে দৃষ্টি বিনিময় করলো তিন গোয়েন্দা। একটা জরুরী তথ্য জানতে পেরেছে। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'একজন ডা স্টেফানোকে খুঁজছি আমরা। আধুনিক স্টেফানো। আরকিওলজিস্ট। এদিকে বেশ খোঁড়াখুঁড়ি করেন। চেনোটেনো নাকি?'

'না,' মুখ কালো হয়ে গেল ছেলেটার। প্রশ্নের জবাব জানা না থাকা যেন বিরাট অপরাধ তার কাছে।

'পিন্টো আলভারোকে চেনো?' চেহারার বর্ণনা দিলো কিশোর।

হাসি ফিরে এলো ছেলেটার মুখে। 'সবাই চেনে তাঁকে। এই তো, কাছেই থাকেন সিনর আলভারো,' পুবে হাত তুললো সে। 'ওদিকে যাবেন। বাঁয়ের প্রথম গলিটাতে ঢুকবেন। সোজা এগিয়ে গিয়ে থামবেন শাদা রঙ করা উঁচু দেয়ালওয়ালা বাড়িটার সামনে। ওরকম বাড়ি একটাই আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না।'

ছেলেটার হাতে আরেকটা পেসো গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'আলভারোর কথা আর কিছু বলতে পারবে?'

'খুব ভালো খুঁড়তে পারেন তিনি। বড় বড় আরকিওলজিস্টরা এসেই তাঁর খোঁজ করেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক জায়গায় চলে যান সিনর আলভারো।'

আর কোনোই সন্দেহ থাকলো না তিন গোয়েন্দার, এই পিন্টো আলভারোকেই খুঁজছে ওরা। তার কাছে হয়তো জানা যাবে অ্যাজটেক যোদ্ধার বংশধরের খবর। রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে তাহলে।

উত্তেজিত হয়ে এসে গাড়িতে উঠলো তিনজনে। গাড়ি ছাড়লো মুসা। পিকো ঠিকই বলেছে. বাড়িটা খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। দরজার কড়া নাড়লো কিশোর। খুলে দিলো মোটাসোটা এক মহিলা পরনে কালো পোশাক। কালো একটা ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। নিশ্চয় আলভারোর হাউসকীপার।

'কি চাই?'

'সিনর আলভারো আছেন?'

'মিটলা ধ্বংসস্তূপে গেছেন।'

'ও। সেখানে গেলে তাঁর দেখা পাবো?'

'পেতে পারো। যদি অন্য কোথাও চলে না গিয়ে থাকেন। মিটলা থেকেও খুঁজে বের করা কঠিন। অনেক বড় জায়গা। কোথায় যে কখন থাকবেন, বলা যায় না,' হাসলো মহিলা। 'তবে কাছাকাছি যদি চলে যেতে পারো, তোমাদের আর খুঁজে বের করা লাগবে না। তোমাদেরকেই খুঁজে বের করবে।'

'মানে?' বুঝতে পারলো না রবিন।

'সিনরের কুত্তাগুলো বড় সাংঘাতিক। ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। কাজ করতে গেলে লোকে বিরক্ত করে। ইদানীং তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই বোধহয় এই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।'

গাড়িতে এসে উঠলো আবার ওরা। মিটলায় চললো। টুলেট্রী ছাড়িয়ে কিছুদূর আসার পর চোখে পড়লো ধ্বংসস্তূপ। 'দেখ, কতো পিরামিড!' বলে উঠলো মুসা।

আরও খানিকদূর এগিয়ে গাড়ি থামালো সে। তিনজনেই নামলো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা। এর কাছে মনটি অ্যালবান কিছু না। মহিলা একটু ভুল বলেছে, 'খুঁজে বের করা কঠিন!' আসলে বলা উচিত ছিলো, 'অসম্ভব!' কিশোরের তা-ই মনে হলো। যেদিকেই তাকায়, সবই একরকম লাগে দেখতে। আলাদা করা মুশকিল।

তবে, আলভারোকে সহজেই খুঁজে বের করে ফেললো ওরা। কিংবা ওদেরকেই খুঁজে বের করলো কুকুরগুলো।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে এগোলো তিন গোয়েন্দা। ধ্বংসস্তূপে ঢুকে ঘোরাঘুরি করছিলো, এই সময় কানে এলো ডাক। একটা সমাধি মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই জোরালো হলো চিৎকার। মনে হলো ভেতর থেকে আসছে।

দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়েই ছিটকে সরে এলো মুসা। ঘেউ ঘেউ করে বেরিয়ে এলো বিশাল এক অ্যালসেশিয়ান। ওটার পেছনে বেরোলো আরও দুটো। ঘিরে ফেললো তিন গোয়েন্দাকে। কামড়ালো না, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। সেরকমই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, ওগুলোকে। জোরে জোরে ডাকলো কিশোর, 'সিনর আলভারো আছেন? সিনর আলভারো! আপনাকে খুঁজছি আমরা! আমেরিকা থেকে এসেছি!'

চোদ্দ

দরজায় বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে উঠলো। ডেকে

সরিয়ে নিলো কুকুরগুলোকে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাও?'

মেকসিকান লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, 'আপনি সিনর পিন্টো আলভারো?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আমেরিকা থেকে এসেছি আমরা, আপনার খোঁজে। কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো আলভারো। তিন গোয়েন্দাকেও পাথর দেখিয়ে বসতে বললো। জানতে চাইলো, 'কি প্রশ্ন?'

'চেস্টার রেডফোর্ড নামে একজন কোটিপতি আমেরিকানকে চেনেন? লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে রকি বীচে বাড়ি।'

'চিনি। আমার এক বন্ধুর বন্ধু।'

'আপনার বন্ধুর নাম ডা স্টেফানো?'

বিস্ময় ফুটলো মেকসিকান মানুষটির চোখে। 'হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, আলভারো আর স্টেফানো কি শুধুই বন্ধু, না বিজনেস পার্টনার।

হেসে জবাব দিলো আলভারো, 'দুটোই বলতে পারো। আজকাল আর খুব একটা দেখা হয় না তার সঙ্গে। তবে কয়েক বছর আগে একসঙ্গে খুঁড়েছি আমরা। তারপর কি জানি কি হলো। আমাকে বাদ দিয়ে একাই খুঁড়তে লাগলো।'

'এখন কোথায় আছে জানেন?' রবিন জানতে চাইলো।

মাথা নাড়লো আলভারো। 'জানি না। তবে বেশি জরুরী হলে খুঁজে বের করতে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি। মিস্টার রেডফোর্ডের কথা কি যেন বললে?'

পকেট থেকে ছবির খামটা বের করলো কিশোর। দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে স্টেফানোকে চিনতে পারলো আলভারো। সাথের অন্য লোকটাকেও।

কিশোর বললো, 'উইলে পিন্টো আলভারো নামটা লিখে গেছেন মিস্টার রেডফোর্ড। আমার মনে হয় আপনিই সেই লোক।'

'উইলে আমার কথা লিখেছেন!' বিশ্বাস করতে পারছে না আলভারো।

'ব্যাপারটা আমাদেরকেও অবাক করেছে। আমরা গোয়েন্দা। আমাদের কথাও লিখেছেন তিনি। অনুরোধ করেছেন, যেন অ্যাজটেক যোদ্ধার সত্যিকার উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিই। কোনো একটা জিনিসের কথা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।'

এতোই অবাক হয়েছে আলভারো, কথা বলতে পারলো না পুরো তিরিশ সেকেণ্ড। তারপর বললো, 'তাহলে তোমরা ডিটেকটিভ?'

নিজেদের পরিচয় দিলো কিশোর। কার কি নাম, বললো।

'হুঁ,' আলভারো বললো। 'কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন। খোঁড়াখুঁড়ির সময় আগে কুকুর সঙ্গে নিতাম না। কয়েক দিন ধরে নিচ্ছি। কারণ গত দুই হপ্তায় কয়েকবার রহস্যজনক ভাবে হামলা হয়েছে আমার ওপর। কয়েকজন লোক, যাদেরকে আগে কোনোদিন দেখিনি, আমাকে ধরে হুমকি

দিয়েছে। অ্যাজটেক যোদ্ধার জিনিস কোথায় আছে না বললে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছে।'

চট্ করে আবার একে অন্যের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা।

'ওরা কি বলছে বুঝতে পারিনি তখন,' বলছে আলভারো। 'বার বার বলেছি আমি কিচ্ছু জানি না। ভুল লোককে ধরেছে। মনে হয় ওরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে। আর আসছে না। তা এই জিনিসটা কি, তোমরা কিছু বলতে পারবে?'

'পুরানো অস্ত্রশস্ত্র হতে পারে,' মুসা বললো।

'কিংবা প্রাচীন কোনো অ্যাজটেক মূর্তি,' বললো রবিন।

'আসলে,' কিশোর বললো। 'কিছুই জানি না আমরা। জানার চেষ্টা করছি।'

পিন্টো আলভারোকে বিশ্বাস করা যায়, মনে হলো তার। একবার দ্বিধা করে রেডফোর্ডের উইলের কথাটা বলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ শোনার পর হঠাৎ হাত তুললো আলভারো। বললো, ডা স্টেফানো একটা জিনিস পেয়েছিলো। মিউজিয়ামকে দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তার আগে মিস্টার রেডফোর্ডকে ধার দিতে বাধ্য হলো, এমন করেই চেপে ধরেছিলো তাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা আবার স্টেফানোকে ফেরত দেবে কথা দিয়েছিলো আমেরিকান লোকটা। দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করেছে, জিনিসটা পাওয়ার কথা চেপে রাখবে, যতোদিন না মিউজিয়ামকে দেয়া হয়।

'তবে জিনিসটা কি,' কথা শেষ করলো আলভারো। 'আমি বলতে পারবো না।'

'সেই নির্দিষ্ট সময়টা নিশ্চয় অনেক দীর্ঘ ছিলো,' কিশোর বললো। 'ওই সময়ের মধ্যে মারাও যেতে পারে দু'জনের যে কোনো একজন। এবং তা-ই হয়েছে। মিস্টার রেডফোর্ড মারা গেছেন।'

'আর মজার ব্যাপার হলো, মধ্যস্থতা করার জন্যে রাখা হয়েছিলো আমাকে। জিনিস দেয়ার জন্যে কেউ খোঁজ করতে এলে যাতে চিনিয়ে দিতে পারি ডা স্টেফানোকে, অ্যাজটেক যোদ্ধার সত্যিকার উত্তরাধিকারী বলে। তবে জিনিসটা যে কি, কিচ্ছু জানানো হয়নি আমাকেও। তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছো?'

'যেহেতু,' জবাব দিলো কিশোর। অ্যাজটেক যোদ্ধা বলা হয়েছে, প্রাচীন মূর্তি-টূর্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূর্তি কালেকশন করতেন না মিস্টার রেডফোর্ড, সেরকম কোনো আভাস পাইনি। পেয়েছি অস্ত্রের ব্যাপারে। পুরানো অস্ত্র জোগাড় করাটা নাকি তাঁর নেশা ছিলো। স্টেফানো ওরকম কোনো অস্ত্রের আভাস আপনাকে দিয়েছেন কখনও?'

'না,' চুপ করে কি ভাবলো আলভারো। তারপর বললো, 'মিস্টার রেডফোর্ডের উইলের কথা জেনে গেছে লোকগুলো, যারা আমার ওপর চড়াও হয়েছিলো। তার মানে জিনিসটার কথাও জানে ওরা। কি করে জানলো?'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'উইলের কথাটা গোপন রাখা হয়েছে। শুধু আমরা কয়েকজন জানি।'

ভ্রূকুটি করলো আলভারো। 'এসব ব্যাপারে জড়াতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কি আর করবো, কথা যখন দিয়েছি···দেখি, খোঁজখবর করে। ডা স্টেফানো

এখন কোথায় খুঁড়ছে বের করতে পারি কিনা।'

'থ্যাংকস।...আচ্ছা, অনেক আগে নাকি একজন মহান অ্যাজটেক নেতা ছিলেন, নাম মাক্সিল ডা স্টেফানো?'

'হ্যা। কেন জিজ্ঞেস করেছো বুঝতে পেরেছি। ঠিকই অনুমান করেছো তুমি। আজকের আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানো সেই স্টেফানোরই বংশধর।'

উত্তেজনা চাপতে কষ্ট হলো তিন গোয়েন্দার। কিশোর বললো, সে আলভারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। হোটেলের নাম বললো, রুম নম্বর দিলো, টেলিফোন নম্বর দিলো। কিছু জানতে পারলে যেন দেরি না করে তাদেরকে জানানো হয়। জানাবে কথা দিলো আলভারো। আন্তরিক হ্যাণ্ডশেক করলো তার সঙ্গে তিন গোয়েন্দা।

হোটেলে ফিরেই আগে মিস্টার সাইমনকে ফোন করলো কিশোর। তদন্তের অগ্রগতির কথা জানালো ডিটেকটিভকে।

ওদের কাজের অনেক প্রশংসা করলেন তিনি। কিভাবে ডা স্টেফানোকে খুঁজে বের করা যেতে পারে, কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। একটা খুব মনে ধরলো কিশোরের। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া। বলতে হবে, খুব জরুরী একটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানোকে খোঁজা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন পড়ে থাকলে তিনি যেন অবিলম্বে সাড়া দেন এই অনুরোধ করা হবে।

গোসল আর খাওয়া শেষ করেই আবার বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। অকজাকা থেকে যে ক'টা দৈনিক বেরোয়, সব ক'টার অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্যে ফিস জমা দিয়ে এলো। সবাই বলে দিলো, সকালের খবরেই বেরোবে বিজ্ঞাপনটা।

পরদিন সকালে হোটেলের ঘরে বসে নাস্তা সেরে নিচে নামলো তিন গোয়েন্দা। নিউজ স্ট্যাণ্ডে এসে প্রথম কাগজটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলো কিশোর। হেডলাইন করা হয়েছেঃ পাহাড় থেকে পড়ে বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানোর মৃত্যু!

পনেরো

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে খবরটা পড়তে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা।

পুরোটা পড়ার পর বোঝা গেল, মারা গেছেন তিনি, এটা অনুমান করা হচ্ছে। একেবারে নিশ্চিত নয় কেউ। পার্বত্য এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলো তিনজন আমেরিকান টুরিস্ট–নীল হ্যামার, রবার্ট জনসন, আর ডেভিড মিলার। এমিল স্টেফানোকে ওখানে দেখেছে তারা।

পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন আরকিওলজিস্ট। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। দৌড়ে যায় তিন টুরিস্ট। কিন্তু যেখানে স্টেফানোর দেহ পড়ে থাকার কথা সেখানে পৌছে কিছুই দেখতে পায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এসেছে তিনজনে।

এসেই হ্যামার ফোন করেছে পুলিশকে। জনসন করেছে পত্রিকা অফিসকে। একটা উদ্ধারকারী দল ছুটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। আরকিওলজিস্টের লাশ পাওয়া

যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, গিরিখাতে আছড়ে পড়েছেন স্টেফানো, সেখান থেকে নদীতে গড়িয়ে পড়েছে তাঁর লাশ। ভেসে চলে গেছে।

দু'বার করে খবরটা পড়লো ওরা। অবশেষে মুসা বললো, 'সর্বনাশ হয়েছে! আমাদের রহস্যের কিনারা বুঝি আর হলো না!'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' কিশোর বললো।

'পত্রিকা কি আর মিথ্যে খবর ছাপবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওদের রিপোর্টার নিজে গিয়ে তো আর খবর আনেনি। অন্যের কথা শুনে লিখেছে।'

'তোমার কি মনে হয়?' মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'স্টেফানো মারা যাননি?'

'হয়তো গেছেন। তবে পা পিছলে পড়েছেন, একথা বিশ্বাস হচ্ছে না। হয়তো ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে। অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি পুরোপুরি গোপন করে ফেলার জন্যে। আর আরেকটা প্রশ্ন। ডা স্টেফানো ঘোরাঘুরি করেন ধ্বংসস্তূপ-গুলোতে। পর্বতের ওপরে তিনি যাবেন কি করতে?'

প্রশ্নটা রবিন আর মুসা দু'জনকেই ভাবিয়ে তুললো।

'তাহলে কি যাননি?' রবিনের প্রশ্ন।

জবাব দিলো না কিশোর। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কয়েকবার। বিড়বিড় করে বললো, 'ব্যাটারা ভুয়াও হতে পারে। চলো, ফোন করি।'

'কোথায়?' মুসা অবাক।

'মেকসিকান টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে। জানবো, ওই নামের তিনজন আমেরিকান টুরিস্ট সত্যিই এসেছে কিনা।'

'ঠিক বলেছো!' রবিন বললো। 'চলো।'

ফোন করলো কিশোর। ফোন ধরেছে যে লোকটা, সে কথা দিলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাবে। ফোনের কাছে অপেক্ষা করতে বললো কিশোরকে।

অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তিনজনে। এতোই উত্তেজিত হয়ে আছে, আলোচনা পর্যন্ত করতে পারছে না। শেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো মুসা, 'দূর, এতো দেরি কেন...'

ঠিক এই সময় বাজলো ফোন।

ওপাশের কথা শুনলো কিশোর। ধীরে ধীরে বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে। রিসিভার রেখে দিয়ে বন্ধুদেরকে বললো, 'যা ভেবেছিলাম। ওই নামে কোনো আমেরিকানই মেকসিকোতে ঢোকেনি গত কয়েক দিনে। মনে হচ্ছে মারা যাননি ডা স্টেফানো। কিডন্যাপ করা হয়েছে। মৃত্যুর খবর ছড়ানো হয়েছে আমাদেরকে ফেরানোর জন্যে। আর কোনো কারণ নেই। লোকগুলো ভেবেছে, এখবর পেলে আমেরিকায় ফিরে যাবো আমরা। এটা সেই দলের কাজ, যারা আমাদের এবং অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তির পিছে লেগেছে।'

'এখন তাহলে কি করবে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'ডা স্টেফানোকে খুঁজতে বেরোবো।'

'কোথায়?'

'অবশ্যই সেই পার্বত্য এলাকায়। আমি শিওর, ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে।'

কোন এলাকায় মারা গেছেন স্টেফানো, ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। ম্যাপ নিয়ে বসলো কিশোর। জায়গাটা চিহ্নিত করলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো দুই সহকারীকে নিয়ে।

জায়গাটা অকজাকার উত্তর-পুবে। সরু একটা আঁকাবাঁকা পথে এসে পড়লো ওদের গাড়ি। ধীরে ধীরে উঠে চললো পর্বতের ওপরে। অনেক উঁচু একটা চূড়া চোখে পড়ছে। মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঢালের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের কুঁড়ে।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিচে দেখা যায় নদী। সিনর স্টেফানো ওটাতে পড়েই ভেসে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পর্বতের গোড়ায় বড় বড় গাছের জঙ্গল, কিন্তু যতোই ওপরে উঠছে ঢাল, কমে গেছে বড় গাছ। তার জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছে ঝোপঝাড় আর লতা। তবে পাথর আছে সর্বত্রই। বড়, ছোট, মাঝারি সব রকমের, সব আকারের।

'হুঁ,' মাথা দোলালো মুসা, 'কেন এসেছিলেন এখানে বোঝা যায়। ধ্বংসস্তূপ এখানেও আছে।'

বেশ কিছু কুঁড়ে পেরিয়ে এলো গাড়ি। তারপর শেষ হয়ে গেল পথ।

গাড়ি থামিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মুসা। 'এবার?'

ম্যাপ দেখতে লাগালো কিশোর। আন্দাজ করলো, যে জায়গা থেকে পড়ে গেছেন স্টেফানো, বলা হয়েছে, সেটা আরও ওপরে। 'গাড়ি রেখে যেতে হবে।'

'সবার যাওয়া কি ঠিক হবে?' মুসা বললো। 'লোকগুলো বেপরোয়া। লুকিয়ে রেখে এখন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কিনা তাই বা কে জানে। এক কাজ করো, তোমরা দু'জন যাও। আমি গাড়ির কাছে থেকে পাহারা দিই। বলা যায় না, তোমাদের পেছনে যাওয়ার আগে গাড়িটাও এসে নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে।'

ঠিকই বলেছে মুসা। একমত হলো কিশোর। বললো, 'থাকো। যদি কোনো বিপদে পড়ি, জোরে জোরে শিস দেবো দু'বার। যদি মনে করো, একা আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে থানায় চলে যাবে।'

'আচ্ছা।'

ঢাল ওখান থেকে বেশ খাড়া। এবড়োখেবড়ো। পাথরে বোঝাই। সে-জন্যে আরও ওপরে রাস্তা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। উঠে চললো কিশোর আর রবিন। সন্দেহ হতে শুরু করেছে, সত্যিই এরকম একটা জায়গায় এসেছিলেন কিনা সিনর স্টেফানো। কোনো ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছে না তো! আরও কিছুটা উঠে থেমে আলোচনা করতে লাগলো দু'জনে। ঠিক করলো, এতোটাই যখন এসেছে, একেবারে চূড়ায় না উঠে ফেরত যাবে না।

'আরিব্বাবা! কি ঠাণ্ডা!' চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে রবিন বললো।

চূড়ায় পৌঁছলো দু'জনে। সাধারণত পাহাড়ের চূড়া যেমন হয় তেমন নয় এটা। কয়েকশো গজ জুড়ে একেবারে সমতল। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এলো। নিচে চোখে পড়লো গিরিখাত। হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে ওদের নিচ

দিয়ে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে পাহাড়ী নদীর চকচকে জলস্রোত।
'পড়লে একেবারে ভর্তা!' নিচের পাথরস্তূপের দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের। 'নিশ্চয় ওখানেই খুঁজেছে ওরা স্টেফানোকে। এখানে আসেনি।'
'দরকার মনে করেনি।'
সমতল চূড়াটায় চষে বেড়ালো দুজনে। কোনো সূত্র চোখে পড়লো না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো আরেক প্রান্তে, যেখান থেকে নেমে গেছে আরেকটা ঢাল। যেটা দিয়ে উঠেছে ওরা, তার চেয়ে কম খাড়া।
কিশোরের হাত খামচে ধরলো রবিন। আরেক হাত তুলে দেখালো। 'জুতোর ছাপ! অনেকগুলো!'
'ধস্তাধস্তি হয়েছে!' কিশোর দেখে বললো।
ছাপগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। চারপাশে ভালোমতো নজর করে তাকাতেই চোখে পড়লো ভারি জিনিস হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ। পাশে জুতোর ছাপও রয়েছে, অন্তত দুই জোড়া। তিন জোড়াও হতে পারে, বোঝা গেল না ঠিক। তবে অনুসরণ করা সহজ।
একজায়গায় এসে হারিয়ে গেল দাগ। এর কারণ মাটি ওখানে নরম নয়। বেশি রকম পাথুরে। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলো দু'জনে। আবার পেলো দাগ। একটা কাঁচা পায়েচলা পথে উঠে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে আবার হারিয়ে গেল দাগটা। তবে জুতোর ছাপ ঠিকই রয়েছে।
সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো কিশোর। এখান থেকে নিশ্চয় বয়ে নেয়া হয়েছে স্টেফানোকে। তার মানে কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে।
আরও শ'খানেক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো দু'জনেই। সামনেই পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কুঁড়ে। পাতার ছাউনি।
'ওখানে!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।
মাথা নাড়লো শুধু কিশোর, মুখে কিছু বললো না।
খুব সাবধানে, চারপাশে নজর রেখে, পা টিপে টিপে এগোলো দু'জনে। চলে এলো কুঁড়েটার কাছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, আরেকবার চারদিকে দেখলো কাউকে দেখা যায় কিনা। নেই।
আস্তে দরজায় ঠেলা দিলো কিশোর। সরে গেল বাঁশের ঝাঁপ।
ভেতরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। হাত-পা বাঁধা।
মুখ দেখা না গেলেও মানুষটা কে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। দ্রুত এসে ভেতরে ঢুকলো দু'জনে। বাঁধন খুলতে লাগলো রবিন। টেনে মুখে গোঁজা কাপড়টা বের করে আনলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি সিনর এমিল ডা স্টেফানো, তাই না?'
দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে বসলেন ছিপছিপে মানুষটা। মাথায় ধূসর চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন। এতোই দুর্বল, কথা বলতেও বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা লাউয়ের খোল দেখে উঠে গিয়ে নামালো রবিন। এগুলোতে পানি রাখে পাহাড়ী অঞ্চলের মেকসিকানরা। এটাতেও পানি রয়েছে। বাড়িয়ে দিয়ে

বললো, 'নিন। পানি খান। ভালো লাগবে।'

খুব আগ্রহের সঙ্গে খোলটা নিয়ে পানি খেলেন স্টেফানো। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে করে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, তোমরা এসেছো।'

ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইলো না কিশোর। কাজের কথায় চলে এলো। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার আরেক নাম কি অ্যাজটেক যোদ্ধা, সিনর স্টেফানো? মানে, অ্যাজটেক যোদ্ধা নামে ডাকা হয় আপনাকে?'

অবাক হলেন আরকিওলজিস্ট। 'হ্যাঁ। তোমরা জানলে কিভাবে? কে তোমরা?'

'আমার নাম কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড। আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'তাহলে কথা না বলে জলদি আমাকে নিয়ে চলো। ডাঁকাতগুলো ফিরে আসার আগেই।'

প্রশ্ন করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। তবে সেটা পরেও করা যাবে। আগে স্টেফানোকে এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার। দু'দিক থেকে তাঁকে ধরে তুললো ওরা। রবিন আর কিশোরের কাঁধে ভর রেখে বাইরে বেরোলেন আরকিওলজিস্ট। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

ঢাল বেয়ে যেখান দিয়ে নেমেছে ওরা, স্টেফানোকে নিয়ে সেখান দিয়ে ওঠা যাবে না। তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ঘুরে আরেক পাশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাতে সময় লাগবে বেশি। লোকগুলোর সামনে পড়ারও ভয় আছে। কারণ ওরা এলে ওদিক দিয়েই আসবে। চূড়ায় উঠে আবার নামার কষ্ট করতে যাবে না। তবু ঝুঁকিটা নিতে বাধ্য হলো গোয়েন্দারা।

এমনই একটা জায়গা, স্টেফানোকে বয়ে নেয়াও কষ্টকর। অগত্যা হাঁটিয়েই নিয়ে যেতে হলো। তবে শরীরের ভর বেশির ভাগটাই কিশোর আর রবিনের কাঁধে দিয়ে রেখেছেন তিনি।

কিন্তু এতো চেষ্টা করেও পার পেলো না। ধরা পড়তেই হলো। বড় জোর একশো ফুটও যেতে পারলো না, বিশাল এক পাথরের চাঙরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। ওদের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল, এক মুহূর্তের জন্যে, তার পরেই পেছন ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো। বেরিয়ে এলো আরও দু'জন।

কিছুই করার সময় পেলো না কিশোর আর রবিন। তিনটে ল্যাসো উড়ে এলো ওদের দিকে। এভাবে ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে ছুটন্ত বুনো জানোয়ারকে বন্দী করে ফেলে মেকসিকানরা, আর ওরা তো দাঁড়ানো মানুষ। মাথা গলে কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে এলো দড়ির ফাঁস। হ্যাঁচকা টান পড়লো দড়িতে। বুকের কাছাকাছি চেপে বসলো ফাঁস, এমন ভাবে, হাত নাড়ানোরও ক্ষমতা রইলো না কারো। আটকা পড়লো দুই গোয়েন্দা। আবার বন্দি হলেন সিনর স্টেফানো।

শিস দিতে গিয়েও দিলো না কিশোর। মুসা একা এসে কিছু করতে পারবে না তিনজনের বিরুদ্ধে। তাকেও আটকে ফেলবে। তার চেয়ে মুক্ত থাকুক। ওদেরকে পরে উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

দড়ির ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জোরাজুরি করলো অবশ্য কিশোর আর

রবিন। বৃথা। সামান্যতম ঢিলও করতে পারলো না।

খকখক করে হাসলো একজন লোক। স্প্যানিশ আর ভাঙা ভাঙা ইংরেজি মিলিয়ে বললো, 'খামোকা নড়ো, খোকা। ষাঁড় ছুটতে পারে না এই ফাঁস থেকে, আর তোমরা তো ছেলে মানুষ। ভ্যাকুয়ারোর হাতে পড়েছো তোমরা, ছোটার আশা বাদ দাও।'

'আমাদের কেন ধরেছেন?' রাগ দেখিয়ে বললো কিশোর।

হেসে উঠলো লোকটা। 'তোমাদের দেশে তোমরা হলে কি করতে, যদি তোমাদের বন্দিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইতো?'

'কিন্তু এই মানুষটাকে আটকে রাখার কোনো অধিকার আপনাদের নেই,' স্টেফানোকে দেখিয়ে রাগ করে বললো রবিন।

'সেটা তোমরা ভাবছো, আমরা না,' হেসে জবাব দিলো লোকটা। 'শুরুতে ভেবেছিলাম, ছোট মাছ ধরেছি। এখন বুঝতে পারছি, দু'জনেই তোমরা বড় মাছ। তবে প্রজাপতি জাল দিয়ে না ধরে ধরেছি ল্যাসো দিয়ে। পালাতে আর পারবে না!' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে উঠলো সে। বেরিয়ে পড়লো নোংরা হলদেটে দাঁত।

অন্য দু'জনও যোগ দিলো তার সঙ্গে।

ল্যাসোর দড়ি টানটান করে ধরে রেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলো তিনজনে। নিচু স্বরে। কিছুই বুঝতে পারলো না ছেলেরা। মনে হলো, তর্ক করছে তিনজনে। কোনো একটা ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। হাবভাবেই বোঝা যায়, কিশোরদের সঙ্গে যে কথা বলেছে, সে-ই দলপতি। অবশেষে একমত হলো তিনজনে। দলপতি বললো কিশোরদেরকে, 'আমরা ঠিক করলাম, তোমাদেরকে কুঁড়েতেই রেখে যাবো। আর বড় মাছটাকে নিয়ে যাবো সাথে করে।'

বড় মাছ কে, বুঝতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলো আরেকবার। বুঝতে পারলো এই ফাঁস গলায় আটকালে কতোটা কষ্ট পায় গরু।

শক্ত করে হাত-পা বাঁধা হলো কিশোর আর রবিনের। টেনেহিঁচড়ে এনে ওদেরকে কুঁড়ের মেঝেতে ফেললো লোকগুলো। কিছুক্ষণ আগে সিনর স্টেফানো যেখানে পড়েছিলেন। দু'জনের মুখেই রুমাল গুঁজে দিয়ে আরকিওলজিস্টকে নিয়ে চলে গেল।

সাংঘাতিক অস্বস্তিকর অবস্থা। না পারছে নড়তে, না পারছে কথা বলতে। এমন বাঁধা-ই বেঁধেছে, সামান্যতম ঢিল করা যাচ্ছে না।

অনেক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিলো ওরা। নাহ্, হবে না। নিজে নিজে খুলতে পারবে না। একমাত্র ভরসা এখন মুসা। কোনো বোকামি করে সে-ও যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে সব আশা শেষ।

অপেক্ষা করতে লাগলো দু'জনে। গড়িয়ে চললো সময়। এক মিনিট দুই মিনিট করতে করতে ঘন্টা পেরোলো। কিন্তু মুসার আসার আর নাম নেই। তবে কি সে-ও ধরা পড়লো!

বাইরে বেলা শেষ হয়ে এলো। ছায়া ফেলতে আরম্ভ করেছে গোধূলি।

ভয় পেয়ে গেল রবিন আর কিশোর। হলো কি মুসার?

আরেকবার মুক্তির চেষ্টা শুরু করলো দু'জনে। দরদর করে ঘামছে, কিন্তু দড়ির বাঁধনকে পরাজিত করতে পারলো না। যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেল ওগুলো। উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে হাঁপাতে লাগলো ওরা।

হঠাৎ, একটা ছায়া দেখা গেল দরজায়।

ফিরে তাকালো কিশোর।

মুসা।

রবিনও দেখেছে। ঢিপঢিপ করছে বুকের ভেতর। আনন্দে।

পাশে এসে বসে পড়লো মুসা। একটানে কিশোরের মুখের রুমাল খুলে দিলো। তারপর রবিনের।

'এতো দেরি করলে!' রবিন বললো।

'আমরা তো ভাবলাম তোমাকেও ধরেছে!' বললো কিশোর।

'দেখিইনি কাউকে,' ছুরি বের করে বাঁধনে পোঁচ দিলো মুসা। 'ধরবে কি?'

'দেরি করলে কেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'আমি কি জানি নাকি তোমরা ধরা পড়েছো? বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা বলে গেছ, বিপদ দেখলে শিস দেবে। আসো না দেখে উল্টো তোমাদেরকেই বকাবকি শুরু করেছিলাম।' রবিনের বাঁধন কাটা শেষ হয়ে গেল। উঠে বসলো সে। ডলে ডলে বাঁধনের জায়গাগুলোয় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলো। কিশোরের দড়িতে পোঁচ দিতে দিতে মুসা বললো, 'শেষে আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম, তোমরা কি করছো দেখতে। জুতোর ছাপ আর হিঁচড়ানোর দাগ চোখে পড়লো। অনুসরণ করে চলে এলাম কুঁড়েটার কাছে।...তা কি হয়েছিলো, বলো তো?'

সমস্ত কথা তাকে জানালো কিশোর আর রবিন।

'তার মানে তীরে এসে তরী ডুবলো!' মুসা বললো। 'ধরেও রাখতে পারলে না! আর কি পাওয়া যাবে সিনর স্টেফানোকে? নিশ্চয় এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবে, যেখান থেকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে। কারণ, তোমরা দেখে ফেলেছো। মুক্তি পাবেই। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বলবে পুলিশকে, এরকমই ভাববে ওরা। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যাবে সিনর স্টেফানোকে, বুঝলে। যেখানে আমরা কিংবা পুলিশ, কেউই খুঁজে পাবো না।'

'আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'মারাত্মক বিপদে পড়েছেন সিনর স্টেফানো। টর্চার করে হোক, যেভাবেই হোক, তাঁর মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে লোকগুলো। তারপর আর না-ও ছাড়তে পারে। হয়তো খুন করে গুমই করে ফেলবে!'

ষোলো

হোটেলে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। আসার পথেই থানায় নেমে পুলিশকে জানিয়ে এসেছে সব কথা।

অপেক্ষা করছে ওরা। পুলিশ বলেছে, কোনো খোঁজ পেলেই জানাবে। অনেক রাত হলো। কিন্তু ফোন আর আসে না। বসে বসে আলোচনা করছে তিনজনে, অনুমান করার চেষ্টা করছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে সিনর স্টেফানোকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনো সূত্র ছাড়া বুঝবেই বা কিভাবে?

ঘুমোতে যেতে তৈরি হলো তিনজনে। এই সময় এলো ফোন। রিসিভারটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরে ম্যানেজার বললো, 'তোমাকে চাইছে।'

প্রায় থাবা দিয়ে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকালো কিশোর। 'হালো!'

'কিশোর? আমি,' পুলিশ নয়। 'আমি, পিন্টো আলভারো।'

'ও, আপনি! কি খবর?'

'তোমাদেরকে বলেছিলাম না, খোঁজখবর করবো। করেছি। আমার পরিচিত সমস্ত জায়গায় ফোন করেছি। যেখানে যেখানে স্টেফানো যেতেন, আমাকে নিয়ে, সব জায়গায়। এইমাত্র ট্যাক্সকো থেকে হ্যানিবাল কারনেস জানালো, তাঁকে নাকি দেখেছে। তিনজন লোকের সঙ্গে গাড়িতে। খাবার কিনতে থেমেছিলো গাড়িটা। কারনেসের মনে হয়েছে, পুরানো কোনো ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে চলেছেন আরকিওলজিস্ট। সে-জন্যেই লোক নিয়েছেন সাথে।'

'কোনদিকে গেছে!' দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক।

'উত্তর-পশ্চিমে। ঠিক কোথায়, বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করতে পারেনি কারনেস।'

'এই হ্যানিবাল কারনেসটি কে?'

'ট্যাক্সকোর একটা স্যুভনিরের দোকানের মালিক। আর্টিস্ট-কাম-আরকিওলজিস্ট। ডা স্টেফানোর ছাত্র।'

'ও। আর কিছু বলতে পারলো? গাড়িটা কি গাড়ি? লোকগুলো কেমন?'

'গাড়িটা কালো রঙের সেডান। লোকগুলো মেকসিকান, জেলে বলেই মনে হয়েছে কারনেসের। নানারকমের কাজ করে ওই অঞ্চলের জেলেরা। মাছ ধরে, গরু পোষে, ভালো টাকা পেলে শ্রমিকের কাজ করে। বিশেষ করে মাটি খোঁড়ার কাজ। অনেক টাকা দেয় তো আরকিওলজিস্টরা।'

ডা স্টেফানোর সঙ্গে যে দেখা হয়েছে, সংক্ষেপে সেকথা জানালো কিশোর। শুনে খুব চিন্তিত হলো আলভারো। বললো, পুলিশ খুঁজছে খুঁজুক, সে আরও খোঁজ নেবে।

তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলো কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। ম্যাপ খুলে বসলো।

ট্যাক্সকো বের করলো। উত্তর-পশ্চিম দিকে আঙুল এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলে উঠলো, 'বুঝেছি! লেক প্যাজকুয়ারোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে!'

'কি করে বুঝলে?' একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো রবিন আর কিশোর।

'ওটাই ওদের জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা। এখানকার পুলিশ অতোদূরে খুঁজতে যাবে না। তাছাড়া, কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে। রবিন, মনে আছে, কথা বলার সময় খালি মাছ মাছ করছিলো লোকগুলো? আলভারোও বললো, কারনেসের নাকি জেলের মতো মনে হয়েছিলো লোকগুলোকে। আর সব

চেয়ে বড় সূত্রটা হলো প্রজাপতি জাল। বলেছে, প্রজাপতি জাল দিয়ে না ধরে ধরেছি ল্যাসো দিয়ে। লেক প্যাজকুয়ারোই একমাত্র জায়গা পৃথিবীতে, যেখানে ওই জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। তারমানে লোকগুলো ওখানকারই অধিবাসী। কাউকে লুকানোর জন্যে নিজের অঞ্চলকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করবে ওরা। গেছেও সেদিকেই। আর কোনো সন্দেহ নেই,' টেবিলে চাপড় মারলো কিশোর। 'ওই হ্রদেই সিনর স্টেফানোকে নিয়ে গেছে ওরা।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' মুসা বললো।

'না! এটাই আমাদের শেষ সুযোগ, বিফল হতে চাই না। পুলিশ দেখলে হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারে ব্যাটারা। জায়গায় জায়গায় ওদের চর থাকতে পারে। খবর পেলেই আবার সিনর স্টেফানোকে সরিয়ে ফেলবে। ওরা এখনও জানে না আমরা আন্দাজ করে ফেলেছি। কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে। গোপনে।'

'তার মানে লেক প্যাজকুয়ারোতে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। কাল সকালে উঠেই।'

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সকোতে পৌঁছলো দুপুরবেলা। লাঞ্চের সময় হয়েছে। গাছে ছাওয়া বড় একটা চত্বর মতো জায়গায় গাড়ি রাখলো। মেকসিকানরা এরকম জায়গাকে বলে জুক্যালো। চারপাশ ঘিরে রয়েছে পর্বত। বাড়িঘর রয়েছে ঢালের ওপর। অসংখ্য পাথরের রাস্তা উঠে গেছে এদিক ওদিক। চত্বরের একধারে সুন্দর একটা পাথরের গির্জা দেখা গেল। অনেক পুরানো। বাকি তিনধারে রয়েছে চমৎকার সব দোকানপাট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট।

হেঁটে একটা রেস্টুরেন্টের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা। বেশির ভাগ দোকানেই দেখলো রূপার তৈরি জিনিসপত্রের আধিক্য।

'ট্যাক্সকো রূপার জন্যে বিখ্যাত,' বিদ্যে ঝাড়লো চলমান জ্ঞানকোষ, রবিন। 'অনেক রূপার খনি আছে এখানে। ফলে রূপার জিনিস বানানোর কারিগরও আছে।'

একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। হাত তুলে দেখালো, 'দেখ, কি সুন্দর!'

রূপার তৈরি একটা প্রমাণ সাইজের মানুষের মূর্তি। একজন ইনডিয়ান। হাতের একটা বটুয়া থেকে শস্যের বীজ ছিটানোর ভঙ্গি।

'হ্যানিবাল কারনেসের খোঁজ করলে হয় না?' মুসা বললো, 'হয়তো সিনর স্টেফানোর ব্যাপারে আরও কিছু জানা যেতে পারে। ছাত্র ছিলো যখন তাঁর।'

'ঠিক বলেছো!' তুড়ি বাজালো কিশোর। 'দাঁড়াও, আগে খেয়ে নিই।'

খেয়েদেয়ে বিল দেয়ার সময় ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'কারনেস?' ম্যানেজার বললো, 'একটু আগেই তো দেখে এলাম। কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ছবি আঁকছে। কয়েকটা দোকান পরেই তার দোকান। ডান পাশে ঘুরে সোজা চলে যাও।'

দোকানের সামনে বেড়া দেয়া একটা উঠন। সেখানে বসে ছবি আঁকছে কয়েকজন চিত্রকর। তাদের মধ্যে রয়েছে লাল দাড়িওয়ালা একজন লোক। উজ্জ্বল নীল স্মক পরনে। সে-ই কারনেস।

ছেলেরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই মুখ তুলে হাসলো। 'হ্যাঁ, আমিই হ্যানিবাল কারনেস। আলভারো তোমাদের কথা বলেছে। আমেরিকা থেকে এসেছো। সিনর স্টেফানোর খোঁজে। চমৎকার জায়গা আমেরিকা। অনেকদিন থেকেছি। আঁকার অনেক দৃশ্য আছে ওখানে।'

অন্যান্যদের সঙ্গে কারনেসও বসে ছবি আঁকছে। ক্যানভাসে দেখা গেল একটা স্কেচ, ছোট একটা ছেলে একটা খচ্চরের গলায় দড়ি ধরে টানছে।

সেদিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'কি ধরনের ছবি বেশি আঁকেন আপনি?'

'সব ধরনেরই। তবে মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতেই বেশি ভালো লাগে আমার,' হাসলো সে। 'তোমরা যাকে খুঁজতে এসেছো, সেই সিনর স্টেফানোরও ছবি আমি এঁকেছি। দেখবে? এসো।'

তিন গোয়েন্দাকে দোকানের ভেতরে নিয়ে এলো কারনেস। চলে এলো পেছনের একটা ঘরে। তার স্টুডিওতে।

সুন্দর একটা লাইফ-সাইজ ছবি। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে কারনেস। নিখুঁত করে এঁকেছে তার ওস্তাদ এমিল ডা স্টেফানোর ছবি।

প্রশংসা করলো কিশোর। স্টেফানোর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো।

অনেক তথ্য জানালো কারনেস, যেগুলো তিন গোয়েন্দার কাছে নতুন।

'সিনর স্টেফানো খুব ভালো লোক,' কারনেস বললো। 'শান্ত স্বভাবের। কারো সাতেপাঁচে যান না। নিজের কাজ নিয়ে থাকেন। অ্যাজটেক যোদ্ধার রক্ত বইছে শরীরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মীরা তো তাঁর নামই দিয়ে ফেলেছে অ্যাজটেক যোদ্ধা।'

'শুনেছি,' রবিন বললো, 'একেকজন আরকিওলজিস্টের একেক জিনিসের প্রতি শখ। যদিও প্রাচীন সব ধরনের জিনিস খুঁড়ে বের করতেই সমান আগ্রহী তাঁরা। সিনর স্টেফানোর শখটা কি, বলতে পারেন?'

ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলো কিশোর, চুপ হয়ে গেল, করে ফেলেছে রবিন।

'তুমি ঠিকই বলেছো,' মাথা ঝাঁকালো কারনেস। 'একেকজনের একেক শখ। সিনর স্টেফানোর ছিলো পুরানো অস্ত্রের। বিশেষ করে অ্যাজটেকদের। অনেক অস্ত্র যোগাড় করেছেন তিনি। শত শত বছরের পুরানো। স্টেট মিউজিয়ামকে দিয়ে দিয়েছেন।'

এই তথ্যটা জেনে খুব উত্তেজিত হলো তিন গোয়েন্দা।

'পুরানো অস্ত্র হাতে তাঁর একটা ছবিও এঁকেছি আমি,' কারনেস জানালো। 'এসো, এদিকে,' আরেকটা ছবি দেখালো সে। শেষ হয়নি ছবিটা। বাকি আছে। 'তিন বছর আগে এঁকেছি এটা। শেষ করে ফেলতে পারতাম, করিনি। সিনর স্টেফানো অনুরোধ করেছেন, আরও দুটো বছর যেন অন্তত অপেক্ষা করি। শেষ করে এটা স্টেট মিউজিয়ামে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে আছে আমার।'

'এতোদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জানি, বলতে পারবো না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। অকারণ ফালতু

কথা বলার মানুষ তিনি নন।'

আরও কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগে ছবিটা দেখতে লাগলো কিশোর। ঝলমলে অ্যাজটেক পোশাক পরে রয়েছেন স্টেফানো। হাতে একটা বড় ছুরি। সোনা দিয়ে তৈরি বাঁটটায় পালকওয়ালা সাপের ছবি খোদাই করা রয়েছে। নীলকান্তমণি বসানো।

ভাবনা চলেছে তার মাথায়। তিন বছর আগে আঁকা হয়েছে ছবিটা, আরও দু'বছর অপেক্ষা করার কথা। তার মানে পাঁচ বছর। অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি ফেরত দেয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় চেয়েছিলেন মিস্টার রেডফোর্ড। স্টেফানোও সময় চেয়েছেন কারনেসের কাছে। দুটোর মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে?

'সিনর স্টেফানোর পাওয়া অস্ত্রগুলো কখনও দেখেছেন?' আচমকা প্রশ্ন করলো কিশোর।

'না। তিনি সেসব কাউকে দেখাতেন না। জানাতেনই না। মিউজিয়ামে পাঠানোর পর সবাই জানতো। আগে প্রকাশ না করার কারণ বোধহয় চোর ডাকাতের ভয়। তবে একটা জিনিস আমি দেখে ফেলেছিলাম।'

'কী?'

'ছুরি। ওই যে, ছবিতে যেটা এঁকেছি।'

আর কোনো সন্দেহ রইলো না কিশোরের। উইলে অ্যাজটেক যোদ্ধা বলে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন মিস্টার রেডফোর্ড, এবং তাঁর জিনিসটা কি। যোদ্ধা হলেন এমিল ডা স্টেফানো, আর সম্পত্তি হলো ওই ছুরি।

অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছে। আর কিছু জানার নেই। আরও কিছু ছবি দেখে, বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সকো থেকে বেরিয়ে সোজা রওনা হলো লেক প্যাজকুয়ারোর পথে। আগের রাতে আলভারোকে যা যা বলেছে, ছেলেদেরকেও ঠিক একই কথা বললো কারনেস, সিনর স্টেফানোকে কখন কি অবস্থায় দেখা গেছে।

বিকেল বেলা হ্রদের পাড়ে পৌছলো ওরা। ছোট একটা গ্রাম প্যাজকুয়ারো। একটামাত্র সরু রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে ওখানকার যতো সব বাণিজ্যিক ভবনগুলো। একটা হোটেল আছে। তাতে উঠলো তিন গোয়েন্দা। গোসল-টোসল সেরে বেরিয়ে পড়লো সিনর স্টেফানোর খোঁজে।

রাস্তার ধারের দোকানগুলোতে ঢুকে লোকের সঙ্গে কথা বললো। স্টেফানোর ছবি দেখিয়ে তাঁকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলো। কেউ দেখেনি। নিরাশ হয়ে হোটেলে ফিরে এলো গোয়েন্দারা। সেদিন আর কিছু করার নেই। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুতে গেল।

'ভুল করলাম না তো?' রবিনের প্রশ্ন। 'হয়তো এখানে আনাই হয়নি তাঁকে।'

'প্রজাপতি জালের কথা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না আমি,' কিশোর বললো। 'কাল সকালে হ্রদের পাড়ে চলে যাবো। জেলেদেরকে জিজ্ঞেস করবো। দেখি, কিছু বলতে পারে কিনা।'

এতে কাজ হলো। তিনজন লোক জানালো, ছবির মানুষটাকে দেখেছে। যে তিনজনের সঙ্গে দেখেছে, তাদেরকেও চেনে ওরা। খারাপ লোক। জাতে জেলে,

কিন্তু মাছ ধরার চেয়ে, অন্যায় কাজেই বেশি আগ্রহ ওদের। একটা লঞ্চে করে চলে গেছে জ্যানিৎজিও দ্বীপের দিকে। তীরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় দ্বীপটা। পাহাড়ও রয়েছে একটা ছোটখাটো। বিশাল এক মূর্তি গড়া হয়েছে পাহাড়ের মাথায়, একজন পাদ্রীর। তাঁর নাম মোরেলোজ। ১৮১০ সালে একটা বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ওখানে যাওয়ার জন্যে বোট ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলো কিশোর। ছোট একটা বন্দর দেখিয়ে দেয়া হলো তাকে। ওখান থেকে ছোটখাটো এক লঞ্চই ভাড়া করে ফেললো সে। দ্বীপে রওনা হলো।

তিনজনেই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো জেলেদের মাছ ধরা। বিচিত্র জাল ঝপাৎ করে ফেলছে পানিতে। যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে দানবীয় প্রজাপতির ডানা। যখন টেনে তোলা হচ্ছে, তাতে লাফালাফি করছে সার্ডিন মাছের মতো একধরনের মাছ। প্রচুর ধরা পড়ছে।

লঞ্চের সারেং ওদেরকে জানালো, সে জাতে জেলে। মাছ ধরে বিক্রি করে পয়সা জমিয়ে এই লঞ্চ কিনেছে।

'এতো ছোট মাছ দিয়ে কি হয়?' রবিন জানতে চাইলো।

'খায়। শুকিয়ে শুঁটকি করে মেকসিকো সিটিতে পাঠানো হয়। প্যাজকুয়ারো হ্রদের মাছের দারুণ চাহিদা। খুব স্বাদ। অনেক দামে বিকোয়।'

দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছে বোট। পানির কিনারে সারি দিয়ে বাঁধা আস্ত গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি একধরনের ডিঙি, অনেকটা বাংলাদেশের তালের নৌকার মতো। ওগুলো জেলেদের সম্পত্তি। এই ডিঙিতে করেই মাছ ধরতে বেরোয় প্যাজকুয়ারোর জেলেরা।

সৈকতে মানুষের অভাব নেই। জাল ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুকানোর জন্যে। ছেঁড়া জায়গাগুলো মেরামতে ব্যস্ত মেয়েরা।

তীরে ভিড়লো বোট। পাইলটকে অপেক্ষা করতে বলে নামলো তিন গোয়েন্দা। প্রথম যে মহিলাকে ছবিটা দেখালো কিশোর, সে-ই বলে দিতে পারলো সিনর স্টেফানোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে দিলো সে। ঢাল বেয়ে উঠে গেছে একটা পাথরের তৈরি রাস্তা। দু'পাশে বাড়িঘর, দোকানপাট। প্রতিটি বাড়ির সামনেই খুঁটি পুঁতে তার ওপর লম্বা করে সরু গাছের কাণ্ড ফেলে রাখা হয়েছে। জাল ঝুলিয়ে র খার জন্যে।

আবার ছবিটা দেখালো কিশোর। কয়েকজন লোককে। ওরাও পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করলো।

'মনে হয়,' চলার গতি বাড়িয়ে দিলো রবিন, 'এইবার আর বিফল হবো না।'

'দাঁড়াও!' বাধা দিলো কিশোর। 'পুলিশ দেখছি না এখানে। বিপদে পড়ে যেতে পারি, এভাবে গেলে। ব্যাটাদের ল্যাসোর ক্ষমতা তো দেখেছি। জোয়ান দেখে দু'তিনজন লোক নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'কাকে নেবে?' মুসার প্রশ্ন।

আশেপাশে তাকালো কিশোর। জাল নিয়ে কাজ করছে কয়েকজন জেলে। দু'জনকে খুব পছন্দ হলো তার। জোয়ান, বলিষ্ঠ শরীর। ফুলে ফুলে উঠছে হাতের

পেশী। তাদেরকে গিয়ে সবকথা বুঝিয়ে বললো সে।

অবাক হলো লোকগুলো। একজন বললো, 'আমাদের দ্বীপে কিডন্যাপার! শেষ পর্যন্ত শয়তানগুলো কিডন্যাপিং করলো! চলো, আমি যাবো,' ওই লোকটার নাম হুগো।

উঠে দাঁড়ালো আরেকজন, 'আমিও,' তার নাম নিটো।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো দলটা। পথের পাশের প্রতিটি বাড়ি, দোকান খুঁজতে খুঁজতে চললো। পাহাড়ের ওপরে যেতে দেখা গেছে কিডন্যাপারদের, কিন্তু কোন্ বাড়িতে তা দেখেনি কেউ। অনেক ওপরে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে পথটা। কিশোর বললো, একসাথে না থেকে ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা দরকার। তাতে অনেক তাড়াতাড়ি আর সহজ হবে।

রাস্তার শেষ বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললো সে। সমস্ত দরজা খোলা। 'নাহ্, এখানে থাকবে না,' ভাবলো সে।

তবু, না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না। কয়েকটা দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর। আর মাত্র একটা দরজা। সেটার সামনে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁচকা টানে তাকে ভেতরে টেনে নিলো কয়েকটা হাত। বাধা দেয়ার সুযোগই পেলো না। এমনকি সাহায্যের জন্য যে চিৎকার করবে, তারও উপায় রাখলো না। মুখে গুঁজে দেয়া হলো ময়লা কাপড়। একটা জাল দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হলো। ঠেলে ফেললো ঘরের কোণে। আরও কিছু জাল ফেলে চাপা দেয়া হলো তাকে।

এতো সহজে ধরা পড়ে গেল বলে নিজের ওপরই রাগ হতে লাগলো কিশোরের। কয়েক মিনিট সব কিছু চুপচাপ রইলো, তারপর একটা লোককে বলতে শুনলো, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'এই লোককে দেখেছেন?' রবিনের কণ্ঠ। নিশ্চয় ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর লোকটা জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তিনজন লোকের সঙ্গে গেছে হ্রদের দিকে। সাথে একটা ছেলেও ছিলো, মনে হয় আমেরিকা থেকে এসেছে।'

'থ্যাংক ইউ। যাই, দেখি, ওদিকেই খুঁজি।'

নীরব হয়ে গেল আবার বাইরে। অসহায় হয়ে পড়ে থেকে কিশোর ভাবছে, সাহায্যের আশা শেষ। চলে গেছে রবিন।

সতেরো

আবার ভাঙলো নীরবতা। তবে এবার কথা বললো কিশোরকে যারা ধরেছে তাদের একজন। 'খুব চালাক মনে করেছিলে নিজেকে। কেমন বুঝলে মজাটা?'

অচেনা কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে আর সিনর স্টেফানোকে ছাড়া হবে না কিছুতেই। তবে অ্যাজটেক ড্যাগারটা কোথায় আছে যদি বলো, তাহলে ছেড়ে দিতেও পারি।'

জালের নিচে চাপা থেকে শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। নড়াচড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলো, আরেকজন মানুষ রয়েছে তার পাশে। নিশ্চয়

সিনর স্টেফানো। এতোক্ষণ বুঝতে পারেনি কেন, যে তিনি আছেন? হয়তো তাঁর মুখেও কাপড় গোঁজা। বেঁধে রাখা হয়েছে। যাতে নড়তেও না পারেন, কথা বলতেও না পারেন।

জেলে দু'জনকে নিয়ে হ্রদের পাড়ে পৌঁছেছে ততোক্ষণে রবিন আর মুসা। লঞ্চটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। সারেঙকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিশোর এদিকেই এসেছে। দেখেছেন? যে মানুষটাকে খুঁজতে এসেছি তাঁকে নিয়ে সেই লোক তিনজনও এসেছে। বোটটোট যেতে দেখেছেন নাকি?'

'না,' অবাক মনে হলো সারেঙকে। 'দেখিনি তো!'

মুসার দিকে তাকালো রবিন। তারপর জেলে দু'জনের দিকে। হুগো আর নিটো। বললো, 'মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা। নিশ্চয় আটকে ফেলেছে কিশোরকে। ওই কুঁড়েতেই রয়েছে এখনও। সরানোর সময় পায়নি। জলদি চলুন।'

ঘুরে প্রায় দৌড়াতে শুরু করলো সে। আগের পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। পেছনে অন্য তিনজন।

কুঁড়েটায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগলো না। তাদেকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকালো ঘরের দু'জন লোক।

'কিশোর কোথায়?' কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'মানে? কি বলছো?' বললো একজন।

ততোক্ষণে ঘরের আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে রবিন আর মুসার। লোকটাকে চিনে ফেললো, চেহারাটা ভালোমতো দেখতেই। এই সেই নকল পুলিশ অফিসার, গাড়িতে উঠে ওদেরকে যে কিডন্যাপ করে নিতে চেয়েছিলো।

জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো কিশোর। না পেরে দাপাতে শুরু করলো মেঝেতে। লাথি মারতে শুরু করলো।

'ওই তো!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'ওই যে!'

দরজার দিকে দৌড় দিলো দুই কিডন্যাপার। ঝট্ করে এক পা বাড়িয়ে দিলো মুসা। পায়ে লেগে আছাড় খেয়ে পড়লো একজন। আরেকজনকে আটকে ফেললো হুগো আর নিটো।

রবিন জাল সরাতে শুরু করে দিয়েছে। টেনে টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলছে একপাশে। বেরিয়ে পড়লো দু'জন মানুষ। একজন কিশোর, আরেকজন সিনর স্টেফানো। মুক্ত করলো ওদেরকে।

বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে আরকিওলজিস্টকে। বিড়বিড় করে বললেন, 'থ্যাংক ইউ!'

এতো কাহিল হয়ে পড়েছেন তিনি, উঠে দাঁড়ানোরই শক্তি পাচ্ছেন না। তাঁকে প্রায় বয়ে আনতে হলো বাইরে।

'হয়েছে, ছেড়ে দাও,' স্টেফানো বললেন। 'আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কাল রাতে তোমাদের কথা আর মিস্টার সাইমনের কথা আলোচনা করতে শুনেছি লোকগুলোকে। দারুণ গোয়েন্দা তোমরা। হাল তো ছাড়োইনি, পিছু নিয়ে ঠিক চলে এসেছো এখানে।'

'ঠিকই বলেছেন!' বললো হুগো। 'কয়েকটা ছেলে যেরকম সাহস দেখালো...এদের জন্যেই শয়তানটাকে ধরতে পারলাম।' বলে দুই অপরাধীর

একজনের বুকে খোঁচা মারলো। 'এটার বাড়ি আমাদের এলাকায়। শয়তানী করতে করতে শেষে কিডন্যাপার হতেও বাধলো না!' রবিনের দিকে তাকালো। 'কি করবো দুটোকে?'

'প্যাজকুয়ারো পুলিশের কাছে নিয়ে যাবো,' অনুরোধের সুরে বললো রবিন। 'আপনারা কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন? এ'দুটোকে নিতে সুবিধে হতো।'

'নিশ্চয় যাবো,' জবাব দিলো নিটো।

পিছমোড়া করে হাত বেঁধে টেনে নেয়া হলো দুই বন্দিকে। হাঁ করে দৃশ্যটা দেখতে লাগলো গাঁয়ের লোক। লঞ্চে তোলা হলো দু'জনকে। সারেংও অবাক হয়েছে। বললো, 'ধরতে পারলে তাহলে!'

'হ্যাঁ, পেরেছি,' মুসা বললো।

গাল ফুলিয়ে বসে রইলো দুই বন্দি। কোনো কথারই জবাব দিলো না। প্রশ্ন করা বাদ দিলো ওদেরকে কিশোর। কিভাবে ধরা পড়েছেন, গল্পটা বললেন সিনর স্টেফানো। পর্বতের ওপর একটা ধ্বংসস্তূপ আছে। ওটাতে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাবে ভেবে খুঁড়তে গিয়েছিলেন। পুরানো একটা মন্দিরও আছে ওখানে।

'মন্দিরের ভেতর আমাকে আটক করলো ওরা,' বললেন তিনি। 'ধরে নিয়ে গেল কুঁড়েটায়, যেটাতে প্রথম আমাকে পেয়েছিলে তোমরা। অনেক প্রশ্ন করলো। জোর করতে লাগলো। বার বার জিজ্ঞেস করলো ছুরিটার কথা। বলিনি। তারপর খেতে চলে গেল। এই সময় এলে তোমরা। তোমাদেরকেও বাঁধলো ওরা। ছুটলে কিভাবে?'

'মুসা এসে খুলে দিয়েছে,' মুসাকে দেখালো রবিন। 'আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার তৃতীয় সদস্য। মুসা আমান।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো মুসা।

হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন আরকিওলজিস্ট। পরের ঘটনা বলতে লাগলেন। টেনেহিঁচড়ে তাঁকে একটা গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো কিডন্যাপাররা। তারপর নিয়ে এলো প্যাজকুয়ারোতে। 'এই লোকটা,' নকল পুলিশ অফিসারকে দেখালেন তিনি। 'আমাকে অনেক হুমকি দিয়েছে। প্রশ্নের জবাব না দিলে নাকি টরচার করে মেরে ফেলবে। কিছুতেই মুখ খুলিনি আমি।'

তীব্র ঘৃণা ফুটলো লোকটার চোখে। থুহ্ করে থুথু ফেললো আরকিওলজিস্টের পায়ের কাছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'ভেবো না পার পেয়ে গেছো! আমার দলের লোকেরা এখনও মুক্ত রয়েছে। কিছু একটা করবেই ওরা।'

'আর করবে কচু,' বুড়ো আঙুল দেখালো কিশোর। 'তোমাদেরকে পাবে তো। ঠিক কথা বের করে নেবে পুলিশ। ঘাড় ধরে টেনে আনবে তোমার দোস্তদের। শয়তানী করা বের করে দেবে।'

প্যাজকুয়ারোতে পৌঁছে সোজা থানায় চলে এলো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে হাজতে ঢোকানো হলো দুই আসামীকে। হুগো আর নিটো কিশোরদেরকে বললো, ওরা দ্বীপে ফিরে যেতে চায়। তাদের কাজের জন্যে অনেক ধন্যবাদ দিলো কিশোর, পারিশ্রমিক দিতে চাইলো।

মাথা নাড়লো হুগো। 'কি যে বলো। জীবনে এই প্রথম আসামী ধরার সুযোগ

পেয়েছি। সমাজের একটা উপকার করলাম। এ-তো আমার ভাগ্য। তোমাদের মতো সাহসী ছেলে যদি কিছু আমাদের এখানেও থাকতো, অনেক ভালো হতো।' ধন্যবাদ বিনিময় চললো কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেল জেলে দু'জন।

তিন গোয়েন্দা আর সিনর স্টেফানোর মুখে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন থানার ইনচার্জ। মেকসিকো সিটি আর অকজাকায় লোকদুটোকে খুঁজছে পুলিশ, একথা শুনে টেলিফোন করলেন দু'টো শহরের পুলিশকে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এলেন হাসিমুখে।

'তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে,' বললেন তিনি। 'দলের নেতা হুবার্ট রিগোকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মেকসিকো সিটিতে।'

'হুবার্ট রিগো!' তিক্তকণ্ঠে বললেন স্টেফানো। 'এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওরা এতো কিছু জানলো কার কাছে। আমার কথা, ছুরিটার কথা। লোকটা আমার গাইড ছিলো। বহু বছর সঙ্গে থেকেছে।'

'আরও খবর আছে,' অফিসার জানালেন। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার সাইমনের পাইলটকে যে কিডন্যাপ করেছিলো, তাকেও ধরা হয়েছে। ওর দলের লোকেরাই আমেরিকান সেজে ছদ্মনামে ফোন করেছিলো পুলিশ আর পেপারকে, সিনর স্টেফানোর মৃত্যুর মিথ্যে সংবাদ দিয়েছিলো।'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'তবে আরও দু'জন বাকি রয়ে গেছে। তিন ভ্যাকুয়ারোর একজন ধরা পড়েছে,' হাজতের দিকে দেখালো সে। 'বাকি রয়েছে…'

'ধরবো। যাবে কোথায়?'

অফিসারের কাছে শুনলো ওরা, পুলিশের কাছে সব স্বীকার করেছে হুবার্ট রিগো। এক কোটিপতি নাকি তাকে লোভ দেখিয়েছিলো, ছুরিটা বের করে দিতে পারলে অনেক টাকা দেবে। চুরি করে কিংবা অন্যভাবে আরও প্রাচীন জিনিস জোগাড় করে ওই লোককে দিয়েছে রিগো। অ্যাজটেকদের জিনিস সংগ্রহের নেশা কোটিপতি লোকটার।

সিনর স্টেফানোকে নিয়ে থানা থেকে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে এলো হোটেলে। প্রথমেই গোসল সেরে নিলো সবাই। খাওয়া শেষ করলো। তারপর বিশ্রাম নিতে এলো। বিছানায় শুয়ে পড়লেন আরকিওলজিস্ট। কেন তাঁকে খুঁজতে এসেছে এতোক্ষণে জানানোর সুযোগ পেলো ছেলেরা। সংক্ষেপে সব জানানো হলো তাঁকে।

মন দিয়ে শুনলেন স্টেফানো। ছেলেরা তাদের কথা শেষ করলে বললেন, 'এবার তাহলে আমার গল্প শোনো। মাস দুই আগে একদিনের কথা। বিরক্ত করে তুলেছিলো আমাকে রিগো। তাকে বরখাস্ত করলাম। হোটেলের ঘরে বসে ফোনে আলাপ করছি রেডফোর্ডের সঙ্গে, হঠাৎ দেখি জানালা দিয়ে আড়িপেতে আমার কথা শুনছে রিগো। আমার মনে হয় সেদিনই ছুরিটার কথা শুনে ফেলেছিলো সে, চুরি করার মতলব এঁটেছিলো। প্রায় হাজার বছরের পুরানো জিনিস ওটা। অনেক টাকার জিনিস।'

দম নেয়ার জন্যে তিনি থামলে কিশোর বললো, 'আপনি মিস্টার রেডফোর্ডকে

ধার দিয়েছিলেন ছুরিটা। আপনারা দু'জন আর রিগো বাদে কি আর কেউ জানতো না এটা?'

'মনে হয় না। জানার কোনো উপায় ছিলো না। পাওয়ার পর আর কাউকে বলিনি আমি।'

মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'ছুরিটা দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর। আগ্নেয় শিলায় তৈরি ফলাটা। এখনও অনেক ধার। সোনার তৈরি বাঁট। তাতে ডানাওলা সাপের ছবি খোদাই করা। নীলকান্তমণি আর চুনি পাথর খচিত।

'তিন বছর আগে পুরানো অস্ত্র জোগাড় করতে এদেশে এসেছিলো রেডফোর্ড। আমার সংগ্রহ দেখলো। অনুরোধ করতে লাগলো ছুরিটা দেয়ার জন্যে। বিক্রি করতে রাজি হলাম না আমি। বললাম, জিনিসটা আমার দেশের সম্পত্তি। স্টেট মিউজিয়ামে দিয়ে দেবো। অবশেষে অনেক চাপাচাপি করে আমাকে রাজি করালো, কিছুদিনের জন্যে ধার দিতে। আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। পাঁচ বছরের জন্যে ছুরিটা তার সংগ্রহে রাখতে চেয়েছিলো। দিয়ে দিলাম।'

'ছুরিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন মিস্টার রেডফোর্ড,' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'জানেন আপনি?'

'না। বলেনি। আমিও শোনার দরকার মনে করিনি। বের করতে পারেনি এখনও কেউ?'

'মনে হয় না।'

মুখ কালো করে ফেললেন স্টেফানো। 'দেয়াই উচিত হয়নি। বের করতে না পারলে...কিন্তু কি করবো? এমন চাপাচাপি শুরু করলো!'

'ভাববেন না,' কিশোর বললো। 'অন্য কারো হাতে চলে না গিয়ে থাকলে ঠিকই বের করে ফেলবো।'

'হ্যাঁ,' হেসে বললো রবিন। 'লুকানো জিনিস বের করতে ওস্তাদ আমাদের কিশোর পাশা। ধরে নিতে পারেন, পেয়ে গেছেন। আচ্ছা, আরেকটা কথা এসবের মধ্যে পিন্টো আলভারো এলো কিভাবে? উইলে তার নামও রয়েছে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন আরকিওলজিস্ট। বললেন, 'জিনিসটার কথা গোপন রেখে একজন সাক্ষি রাখতে চেয়েছিলাম। আমার আর রেডফোর্ডের মাঝে যে একটা চুক্তি হয়েছে একথাই শুধু জানবে তৃতীয় লোকটি, কি জিনিসের ব্যাপারে তা জানানো হবে না। রেডফোর্ডের কিছু হলে আমাকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যেও একজনকে দরকার। আলভারোকে সেই তৃতীয় লোক হিসেবে বেছে নিলাম দু'জনেই। রেডফোর্ড মারা গেছে শুনে, সত্যি, খুব কষ্ট লাগছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো স্টেফানো। 'আমার সঙ্গে বেঈমানী করেনি। গোপন রেখেছে ছুরির কথা। তোমাদের সঙ্গে রকি বীচে যাবো আমি। ছুরিটা আনার জন্যে। ওটা খোঁজার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো।'

'খুব ভালো হয় তাহলে,' কিশোর বললো। মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে ছবির যেসব স্লাইড পেয়েছে ওরা, জানালো সিনর স্টেফানোকে। 'একটা ছবি তোলা হয়েছে একটা বাগানে।'

বুঝতে পেরেছি। মেকসিকো সিটির বাইরে, একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছিলো রেডফোর্ড। ওখানে তোলা হয়েছে।'

'আরেকটাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাকে দেখা গেছে আপনাকে,' হেসে বললো মুসা।

স্টেফানোও হাসলেন। 'পিরামিড অভ দি সানের কাছে ইনডিয়ানদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিলো সেদিন। আমিও যোগ দিয়েছিলাম তাতে। ইউনিভারসিটির কয়েকজন প্রফেসর ধরলেন, আমার ছবি তুলবেন। তোলা হলো। রেডফোর্ডও তুলছিলো। অনেক পুরানো একটা পোশাক পরেছিলাম সেদিন।'

মিস্টার সাইমনকে ফোন করা হলো। সব শুনে খুব খুশি হলেন তিনি। সিনর স্টেফানো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আসছেন শুনে আরও খুশি হলেন। বললেন, প্লেন পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

পরদিন মেকসিকো সিটিতে পৌঁছলো ওরা। প্লেন অপেক্ষা করছে। তাকে যে কিডন্যাপ করেছিলো, সেই লোকটা হাজতে শুনে ল্যারি কংকলিনও খুশি হলো।

রকি বীচে পৌঁছার পরদিন সকালে দল বেঁধে মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে গেল সবাই–তিন গোয়েন্দা, মিস্টার সাইমন, উকিল মিস্টার নিকোলাস ফাউলার এবং সিনর এমিল ডা স্টেফানো। গাছের গায়ে যে তীর চিহ্নগুলো রয়েছে, সেগুলো দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। ও হ্যাঁ, রকি বীচে আসার পর সাইমন জানিয়েছেন, গাছটাতে আরও কতগুলো তীর আঁকা রয়েছে। এতো সূক্ষ্মভাবে, খুব ভালো করে না দেখলে চোখে পড়ে না।

অনেকক্ষণ ধরে ওগুলোকে দেখলো কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। তারপর সাইমনকে বললো, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? তীরগুলো সব একই দিক নির্দেশ করছে। আর মাথাগুলো নিচের দিকে ঝোঁকানো। কোন্ জায়গায় খুঁজতে হবে, তাই বোঝাতে চাইছে, না? আর অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবিটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে ওদিকে রয়েছে জিনিসটা।'

'হ্যাঁ, ইঙ্গিতটা পরিষ্কার,' সাইমন বললেন। 'তীরের মাথা নিচের দিকে ঝোঁকানো। তার মানে মাটির নিচে খুঁজতে বলেছে। খোঁজা তো আর বাদ রাখিনি।'

'মাটির নিচে বলতে মাটিতে পুঁতে না রেখে মাটির তলার ঘরও তো হতে পারে। সেলার? ওদিকেই তো।'

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিটেকটিভ। তারপর ঝট্ করে দৃষ্টি ফেরালেন তীরের মাথা যেদিকে করে রয়েছে সেদিকে। হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর পিছু নিলো তিন গোয়েন্দা।

সেলারে এসে ঢুকলো ওরা। শুরু হলো খোঁজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না ছুরিটা। চারপাশে তাকাতে লাগলো কিশোর। কোথায় হতে পারে? সেলারের কথাই বোঝানো হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই তার। একধারে একটা পাইপ রয়েছে। নেমে এসেছে ওপর থেকে। ফুটখানেক নেমে বেরিয়ে গেছে দেয়াল ফুঁড়ে। সেটার দিকে পুরো একটা মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো। তারপর আনমনেই বললো, 'এটা এখানে কেন? এ

পাইপের কি দরকার? এটার তো কোনো কাজ নেই! বুঝেছি!' তুড়ি বাজালো সে। সাইমনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বাইরে বেরোলো কিশোর। পাইপটা যেদিকে দিয়ে বেড়িয়েছে সেখানকার মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। বেরিয়ে পড়লো পাইপটা। মাটির নিচ দিয়ে চলে গেছে পুব দিকে। রবিন আর মুসাকেও হাত লাগাতে অনুরোধ করলো সে। খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে চললো।

দশ ফুট দূরে একটা ঝোপের ভেতরে গিয়ে শেষ হয়েছে পাইপ। কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে একটা ছোট বাক্সমতো তৈরি করা হয়েছে পাইপের মাথার কাছে। বাক্সের ওপর গোল একটা লোহার ঢাকনা। ঢাকনার মাথায় আঙটা। পানি নিষ্কাশনের পাইপের মাথায় যেমন জয়েন্ট বক্স তৈরি করা হয়, সেরকম। কেউ দেখে কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।

আঙটা ধরে টান দিতেই উঠে এলো ঢাকনাটা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। পানি নেই। খটখটে শুকনো। আসলে পানি যাওয়ার জন্যে বসানো হয়নি পাইপটা। বের করে আনলো সুন্দর করে অয়েল পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট। না খুলেই বলে দেয়া যায় ভেতরে কি রয়েছে। নীরবে সেটা সিনর স্টেফানোর হাতে তুলে দিলো সে।

কাঁপা হাতে প্যাকেটটা খুলতে লাগলেন আরকিওলজিস্ট। সবাই তাঁকে ঘিরে এসেছে। আগ্রহে উত্তেজনায় চকচক করছে সকলেরই চোখ।

বেরিয়ে পড়লো অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি। ছবিতে যেরকম দেখেছে গোয়েন্দারা, সেরকমই, তবে অনেক বেশি সুন্দর। আলো পড়লেই ঝিক্ করে উঠছে নীলকান্তমণি আর রুবি পাথরগুলো।

'সুন্দর!' প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন ফাউলার। 'চোরেরা যে পিছু লেগেছিলো, এ-কারণেই। সিনর স্টেফানো, অনেক দাম এটার, তাই না?'

হাসি ফুটেছে আরকিওলজিস্টের মুখে। 'অনেক! অ্যানটিক মূল্য! মাটি খুঁড়ে একবার বের করেছিলাম আমি, আরেকবার বের করলো এই ছেলেগুলো! সত্যি, এরা জিনিয়াস! আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ!'

'কৃতজ্ঞ শুধু আপনিই নন, সিনর,' উকিল বললেন। 'আরও অনেকেই হবে। মিস্টার রেডফোর্ডের উইলে যাদের যাদের নাম লেখা রয়েছে, তারা সবাই। কারণ এখন আর সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না ওদের।'

- ঃ শেষ ঃ -

নিশাচর

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯২

ধড়াম করে ফাটলো ট্রাকের টায়ার। চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, ট্রাকের ধার খামচে ধরলো। রবিন ধরলো আরেকটা ধার। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো বোরিস, ছাড়লো, পরক্ষণেই আবার চাপলো। পিছলে চলে গেল গাড়িটা কয়েক ফুট, থামলো, আবার পিছলালো। নাক ঘুরে গেছে আরেক দিকে, মাতালের মতো টলে উঠলো, তারপর গিয়ে কাত হয়ে পড়লো রাস্তার পাশের একটা খাদে, শুধু সামনের অংশটা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন।

মুসার মতো চিৎকার করলো না কিশোর পাশা। তবে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কাঁপছে সে। বোরিসের পাশে বসেছে। মুসা আর রবিন রয়েছে ট্রাকের পেছনে, খোলা অংশে।

দরজা খুলে নামলো বোরিস। তখনও ধার খামচে ধরে রয়েছে দুই সহকারী গোয়েন্দা। ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো ইয়ার্ডের কর্মচারী বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান, 'হো-কে?'

ধার ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো রবিন আর মুসা। মাথা নেড়ে বোঝালো, ভালোই আছে।

এক এক করে নেমে এলো তিন গোয়েন্দা। ট্রাকের কতোটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে।

'দূর,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লো বোরিস। 'টায়ার ফাটার আর জায়গা পেলো না!'

'তোলা যাবে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

সন্দেহ ফুটলো বোরিসের চোখে। আবার গিয়ে উঠলো ড্রাইভিং সীটে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গীয়ার দিলো। গর্জন করছে এঞ্জিন। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকালো সে। নাহ্, বৃথা চেষ্টা। বনবন করে ঘুরছে পেছনের চাকা, কিন্তু ঠিকমতো কামড় বসাতে পারছে না মাটিতে, শুধু ধুলো ছিটাচ্ছে।

এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে আবার নেমে এলো বোরিস। 'আটকে গেছি। কিশোর, মিস্টার পাশাকে খবর দেয়া দরকার। আরেকটা ট্রাক নিয়ে এলে টেনে তোলা যাবে।'

'ডাকবেন কোত্থেকে?' মুসার প্রশ্ন।

প্রায় নির্জন অঞ্চলে আটকা পড়েছে। চারদিক চোখ বোলাতে লাগলো ওরা। মিনিট বিশেক আগে রকি বীচ ছেড়েছিলো, সান্তা মনিকা পর্বতের একটা কেবিনে যাওয়ার জন্যে। ওটার মালিক ইনডিয়ানায় নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে।

তাই সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে।

'আমার বিশ্বাস ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যাবে,' লোকটার সঙ্গে কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে বলেছিলেন রাশেদ পাশা। 'কিশোর, বোরিস কিংবা রোভারকে নিয়ে চলে যা। দেখ গিয়ে, কি বিক্রি করে। বিছানাগুলো সত্যি সত্যি পিতলের হলে সব ক'টা কিনে ফেলবি। আরও যেসব জিনিস মনে হবে কেনা দরকার, নিয়ে নিবি।'

'বুঝেশুনে নিস,' হুঁশিয়ার করেছেন মেরিচাচী। রাশেদ চাচা মাল কিনতে চাইলেই সতর্ক হয়ে যান তিনি। তাঁর ধারণা, যতো সব আজেবাজে মাল নিয়ে আসা হবে, যেগুলোর বেশির ভাগই বিক্রি হবে না। তাঁর ধারণা সব সময়ই ভুল হয়, কারণ, যা-ই কিনে আনেন রাশেদ পাশা, সব বিক্রি হয়ে যায়। তবে সেজন্যে কৃতিত্বটা অনেকখানিই কিশোরের প্রাপ্য। পুরনো বাতিল জিনিস মেরামত করে বিক্রির যোগ্য করতে সে ওস্তাদ।

হাতে কাজ ছিলো না। মাল কিনতে যাওয়ার কথা শুনে খুশিই হয়েছিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে দুই বন্ধুকে। তারপর ওদেরকে আর বোরিসকে নিয়ে ট্রাকে করে মাল কিনতে বেরিয়ে পড়েছে।

কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে এসেছে প্রথমে বোরিস। অনেকখানি এসে মোড় নিয়ে উঠেছে চওড়া একটা পাহাড়ী রাস্তায়, পথটার নাম চ্যাপারাল ক্যানিয়ন রোড। ওই পথ ধরে পাহাড় পেরিয়ে অন্য পাশে এসে নেমেছে স্যান ফারনানদো ভ্যালিতে। চ্যাপারাল ক্যানিয়ন দিয়ে মাইল চারেক এগোনোর পর পাশের আরেকটা সরু কাঁচা রাস্তায় নামতে হয়েছে। ওটার নাম রক রিম ড্রাইভ। ওই পথ ধরে মাত্র কয়েক শো গজ এগোনোর পরেই এই অঘটন।

'মাল কেনা বোধহয় আজ আর হলো না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো কিশোর। 'এখন হেঁটে হেঁটে বাড়ি না ফিরতে হলেই বাঁচি।'

আশপাশের ঢালে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়, বিষণ্ন দৃষ্টিতে সেগুলো দেখলো সে। বাঁয়ের পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মলিন একটা বাড়ি। বোঝাই যায় লোকজন থাকে না। নিচতলার জানালাগুলোয় শার্সির জায়গায় তক্তা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওপরতলায় পাল্লা আছে ঠিকই, তবে শুধু ফ্রেমগুলো, বেশির ভাগ কাঁচই গায়েব।

'এ-বাড়িতে ফোন নেই,' মুসা বললো।

'এই!' হাত তুলে বাড়িটার পেছনে দেখালো রবিন। প্রায় চূড়ার কাছাকাছি অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল টালির ছাত। 'আরেকটা বাড়ি। বড়ই তো লাগছে। মুখ নিশ্চয় চ্যাপারাল ক্যানিয়নের দিকে।'

'এতোদূর বোধহয় যেতে হবে না,' কিশোর বললো। 'ওই যে, পুরনো গোলাবাড়িটা, দেখছো? টেলিফোনের তার দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় লোক থাকে। শর্টকাটেই যাওয়া যাবে। ওই খেতের ভেতর দিয়ে...'

থেমে গেল সে। বিস্ময় ফুটেছে চেহারায়।

'কি হলো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'শস্য খেত!' কিশোর বললো। পথের প্রায় কিনার ঘেঁষে যাওয়া বেড়ার গায়ে

হেলান দিয়ে তাকিয়ে দেখছে। 'সান্তা মনিকা পর্বতের মধ্যিখানে ফসলের খেত, কল্পনাই করিনি কোনোদিন। থাকতে পারে, একথাও শুনিনি।'

আগস্টের এই প্রচণ্ড রোদেও ঘন সবুজ রয়েছে ছোট্ট খেতের গাছগুলো। শিষ বেরোনোর সময় হয়েছে। গাছের গোড়ার মাটি কালো, ভেজা। প্রচুর পরিশ্রম করে চাষ করা হয়েছে, যত্নও নেয়া হচ্ছে খুব। পথের কিনার থেকে শুরু হয়েছে ঢাল, সেই ঢালেই ফসলের খেত, ওপরের প্রান্তের বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল। চটের তৈরি মুখে কালো কালি দিয়ে আঁকা চোখে যেন সদা-সতর্ক দৃষ্টি, ওদের দিকেই মুখ করে আছে।

আনমনে মাথা নাড়লো কিশোর। 'এখানে খামার করলো! আজব ব্যাপার!'

'করেছে বলেই বেঁচেছি। ফোন তো পাওয়া গেল,' রবিন বললো। 'এসো, যাই।'

'না না, সবার যাওয়ার দরকার নেই। খেত মাড়িয়ে গেলে, আর মালিকের চোখে পড়লে রাগারাগি শুরু করবে।'

বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়লো মুসা। 'তাহলে তুমি একাই যাও,' কপালের ঘাম মুছলো সে।

'তা-ই যাচ্ছি,' বলে, বেড়া ডিঙালো কিশোর। ফসলের গাছগুলো তার প্রায় মাথা সমান উঁচু। সাবধানে এগোলো ভেতর দিয়ে। পাতায় ঘষা লেগে খসখস শব্দ হচ্ছে। ঢাল বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে ভারি হয়ে এলো নিঃশ্বাস। ক্রমেই খাড়া হয়ে আসছে ঢাল, উঠতে গিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে তার শরীর।

আবার তাকালো ওপরের বেড়ার দিকে। একভাবে রয়েছে পুতুলটা। এখন অনেক কাছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখটা। তার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে, শয়তানী হাসি।

'আর মাত্র কয়েক গজ,' ভাবলো কিশোর। তারপরেই খোলা জায়গা।

শরীর আরেকটু সোজা করে মাথা তুলেছে সে, হঠাৎ বড়, কালো কিছু একটা ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো তার গায়ের ওপর।

'শয়তান!' চিৎকার করে উঠলো একটা রাগী, পাতলা কণ্ঠ। 'আজ মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবো!'

ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর। পড়ার আগে চোখে পড়লো শুধু একজোড়া চোখ, ভীষণ রাগে বন্য হয়ে উঠেছে।

সবুজ ডাঁটা আর পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখলো কিশোর। মুহূর্ত পরেই ঢেকে গেল আকাশটা। গায়ের ওপর ঝুঁকে এসেছে মানুষটা, কালো পোশাক পরা একটা কালো ছায়ার মতো, গলা টিপে ধরলো তার। আরেকটা হাত উঠে গেছে ওপর দিকে, বাড়ি মারার ভঙ্গিতে। সে-হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে একটা বড় পাথর।

দুই

গলায় চাপ, ঠিক মতো আওয়াজ বের করতে পারলো না, ফ্যাসফ্যাস করে

কোনোমতে বললো কিশোর, 'শুনুন, আমি...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই গলার ওপর থেকে হাতের চাপ সরে গেল। 'আরি, এ-তো একটা ছেলে!'

ফসলের খেত মাড়িয়ে ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল। নরম মাটিতে দুপদাপ করে ভারি জুতোর আওয়াজ হলো। খানিক পরেই আকাশের পটভূমিতে বিশাল আরেকটা দেহ চোখে পড়লো কিশোরের, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

'এই, ছাড়ুন, ছাড়ুন!' গর্জে উঠলো বোরিস। লোকটার সরে আসার অপেক্ষা না করেই পেছন থেকে তার শার্ট খামচে ধরে শূন্যে তুলে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে। 'খবরদার, ঘাড় মটকে দেবো ধরে!'

আস্তে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। দেখলো, বোরিসের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছে লোকটা। কুঁচকে গেছে চোখের চারপাশের চামড়া, পাওয়ারে গোলমাল আছে বোঝা যায়। হাতড়ে হাতড়ে মাটিতে কি যেন খুঁজছে।

'আ-আমার চশমা!' কণ্ঠে অস্বস্তি। 'কোথায় যেন পড়লো!'

মুসা আর রবিনও চলে এসেছে তাড়াহুড়ো করে। মোচড়ানো, ভাঙা একটা ডাঁটায় ঝুলে থাকা চশমাটা রবিনই দেখতে পেলো সবার আগে। ভারি পাওয়ারের কাঁচ। ফ্রেমটাও মোটা, বৈমানিকেরা যেরকম পরে, অনেকটা সেরকম। তুলে দিলো ওটা লোকটার হাতে। ডেনিম শার্টের ঝুলে কাঁচ মুছে চশমাটা পরলো লোকটা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নীল জিনসের প্যান্টে লাগা ধুলো ঝাড়তে শুরু করলো।

'ঘটনাটা কি?' কড়া গলায় জানতে চাইলো বোরিস। 'পাগল নাকি?'

'দুঃখিত। সত্যিই খুব দুঃখিত,' লজ্জিত কণ্ঠে বললো লোকটা। 'ছেলেটাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছিলাম...'

থেমে গেল সে। ফিরে তাকালো বেড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা পুতুলটার দিকে। একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে এদিকে, মুখে কুৎসিত হাসি।

'এখানে...ইয়ে...মানে...খুব জ্বালায়...ফসলের গাছ মাড়িয়ে দিয়ে যায়। গোলমাল করে...আসলে, খেতের ভেতর দিয়ে আসছে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।'

আবার থামলো লোকটা। রোদে চকচক করছে মস্ত টাক। ভারি কাঁচের ওপাশে কেমন ফ্যাকাসে লাগছে চোখের মণি। কিশোর দেখলো, মানুষটা ছোটখাটো, লম্বায় তার চেয়ে বেশি হবে না। পাতলা শরীর, তবে রোগাটে নয়। পেশি আর রোদে পোড়া চামড়া দেখেই অনুমান করা যায়, বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটায় লোকটা, আর বেশ পরিশ্রমের কাজ করে। বয়েস তিরিশ মতো।

'পাথরটা নিয়েছিলাম বটে,' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বললো লোকটা। 'তবে বাড়ি মারতাম না। আমি আসলে দেখতে এসেছিলাম, খেতে কে ঢুকলো।'

'আমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছেন।'

'না না, কি যে বলো! তা কেন ভাববো? ভুল বুঝেছো তুমি! এখন দয়া করে বলে ফেলো তো, আমার খেতে ঢুকেছো কেন?'

দ্রুত সামলে নিয়েছে লোকটা, ব্যাপারটা অবাক করলো কিশোরকে। মাথা

ঝাঁকালো একবার। তারপর বলতে শুরু করলো, 'আমাদের ট্রাকের চাকা ফেটে গেছে। গর্তে পড়েছে ওটা। ওই গোলাবাড়িতে টেলিফোনের তার দেখে ভাবলাম, ফোন করে দিই চাচাকে, আরেকটা ট্রাক নিয়ে আসতে। খেতের মধ্যে দিয়ে শর্টকাটে যেতে চেয়েছিলাম।'

'তাই! আমি সত্যি দুঃখিত। এসো, ফোন করবে।'

ঘুরে ঢাল বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো লোকটা। পেছনে চললো তিন গোয়েন্দা আর বোরিস। গেট দিয়ে খেত থেকে বেরিয়ে, এক চিলতে ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে চলে এলো পুরনো, লাল রঙ করা গোলাবাড়ির কাছে। বড় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো লোকটা। সুইচ টিপে জ্বেলে দিলো উজ্জ্বল ফ্লোরোসেন্ট আলো। হাত নেড়ে ইশারা করলো কিশোরদের ঢোকার জন্যে।

বিরাট বাড়ি। কিন্তু খামারে যেসব পোষা জানোয়ার থাকে, সেরকম একটাও দেখা গেল না। ঘরের ভেতর লম্বা লম্বা টেবিল, তাতে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্রপাতি। ভালো করে ওগুলো দেখার আগেই একটা ডেস্কের কাছে কিশোরকে নিয়ে গেল লোকটা। ডেস্কের ওপরটা বই আর কাগজপত্রে বোঝাই। তার ভেতরে প্রায় চাপা পড়ে আছে টেলিফোনের যন্ত্রটা। সেটা দেখিয়ে বললো, 'যাও, করো।'

কিশোর যখন ফোন করছে, মুসা, রবিন আর বোরিস তখন কৌতূহলী চোখে দেখছে ঘরের ভেতরটা। দরজার কাছে একটা লম্বা টেবিল, তাতে অনেকগুলো কাঠের বাক্স সাজিয়ে রাখা। বাক্সের একপাশের দেয়াল শক্ত কাপড়ে তৈরি, আরেক পাশের দেয়াল কাঁচের। বাকি দুই পাশ কাঠের। খালি। স্ট্যাণ্ডে লাগানো ক্যামেরার চোখ ফিরে আছে ওরকম একটা বাক্সের দিকে।

আরেকটা টেবিলে বড় বড় কতগুলো কাঁচের জার রাখা। একটা জারের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো রবিন। প্রথমে মনে হলো, শ্যাওলার টুকরো জড়ো হয়ে পড়ে আছে। পরক্ষণেই চমকাতে হলো। জারের ভেতরে ওগুলো শ্যাওলা নয়, পিঁপড়ে। জীবন্ত, বাদামী রঙের, লম্বা পাওয়ালা প্রাণীগুলো পা আর চোয়ালের সাহায্যে আঁকড়ে রয়েছে পরস্পরকে। অদ্ভুত দৃশ্য! হাঁ হয়ে গেছে রবিন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘোষণা করলো কিশোর, 'চাচার আসতে আধ ঘন্টা লাগবে।'

'ভেরি গুড,' বললো টাকমাথা লোকটা। চোখ পড়লো রবিনের ওপর।

চোখে চোখ পড়তেই রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'পিঁপড়ে সংগ্রহ করেন নাকি আপনি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লোকটা। দেখা হওয়ার পর এই প্রথম কিছুটা উষ্ণতা প্রকাশ পেলো তার কণ্ঠে। 'শুধু সংগ্রহ করেই ফেলে রাখি না। নজর রাখি। যা যা করে ওগুলো, নোট করে রাখি। কখন কি করবে অনুমানের চেষ্টা করি। আসল কথা, গবেষণা করি পিঁপড়ে নিয়ে।'

'আপনি অ্যানটোমোলজিস্ট,' কিশোর বললো।

হাসলেন ভদ্রলোক। 'তোমাদের বয়েসী বেশির ভাগ ছেলেই জানে না শব্দটা।'

'প্রচুর পড়াশোনা করে আমাদের কিশোর,' গর্ব করে বললো মুসা। 'তার অর্ধেক কথাই বুঝি না আমরা। যাকগে, কি যেন বলা হলো...অ্যানটো...

অ্যাটোম...'

'অ্যানটোমোলজিস্ট,' বলে দিলেন পিঁপড়ে বিশেষজ্ঞ। 'পোকামাকড় নিয়ে যারা গবেষণা করে, স্টাডি করে, বিজ্ঞানীও বলতে পারো, তাদেরকে বলে অ্যানটোমোলজিস্ট। আমার নাম ডক্টর হেনরি রেনহার্ড। রেনহার্ড বলা খুব হার্ড, আই মীন, কঠিন,' হাসলেন তিনি। 'পুরোটা বলার দরকার নেই। শুধু রেন বললেই চলবে। সামরিক পিঁপড়ের ওপর কয়েকটা বই লিখেছি আমি। আরেকটা লিখছি। শেষটা কি হবে বলতে পারবো না।'

আবার হাসলেন ডক্টর রেন। কিশোরের মনে হলো, লোকটা অমায়িক, অবশ্য যখন ভালো মেজাজে থাকেন। আরও একটা ব্যাপার চট্ করে মনে এলো তার, পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা করেন তিনি, দেখতেও পিঁপড়ের মতোই। পাতলা শরীরের তুলনায় মাথাটা অনেক বড়, চশমার ভারি লেন্স দুটোকে দেখতে লাগছে পিঁপড়ের চোখের মতো। চকচকে টাক, অনেক অনেক বড় একটা পিঁপড়ের টাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঠেলে বেরোনো চোখা চোয়াল। তাঁর কপালের দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে হতে লাগলো, যে কোনো মুহূর্তে ওখানে দুটো শুঁড় গজিয়ে যেতে পারে।

মাথার পেছনে হাত নিয়ে গেলেন রেন। 'কি ব্যাপার? কি দেখছো?'

লজ্জা পেলো কিশোর। 'না না, কিছু না। আপনার বইয়ের কথা ভাবছি। শেষটা কি হবে জানেন না, তার মানে চলতি গবেষণাটা শেষ হয়নি আপনার। এটাই ল্যাবোরেটরি, না?'

'আশপাশের পুরো পাহাড়টাই আমার ল্যাবোরেটরি,' রেন বললেন। 'এই গোলাবাড়িতে শুধু কিছু বিশেষ কাজ করি আমি, এইই। ওই যে বাক্সগুলো দেখছো, পিঁপড়ের ছবি নিতে হলে ওগুলোতে ভরে নিই। ম্যাগনিফাইং লেন্স লাগানো আছে ওই ক্যামেরাটায়,' টেবিলে রাখা একটা ক্যামেরা দেখালেন তিনি। 'অনেকগুণ বড় হয়ে ছবি ওঠে। ওই কোণে ডার্করুম। গোলাঘরের পেছনে একটা গ্রীনহাউস আছে। ওখানে রয়েছে পিঁপড়েদের বাড়ি। ওখান থেকে কিছু তুলে এনে ভরেছি জারগুলোয়। আপাতত আছে গ্রীনহাউসে, তবে খুব শীঘ্রি অন্য কোথাও সরে যাবে। সরার সময় হয়ে গেছে ওগুলোর।'

'মাইগ্রেট করবে বলতে চাইছেন,' রবিন বুঝে ফেললো। 'তা পিঁপড়েরা মাইগ্রেট করার পর নিশ্চয় বইয়ের শেষটা কি হবে জানা হয়ে যাবে আপনার? বুঝতে পারবেন কোথায় যাবে ওরা?'

'বেশি দূরে বোধহয় যাবে না,' রেন বললেন। 'বড়জোর পাহাড়ের ওপরের বড় বাড়িটার কাছে। বাসা বাঁধবে। সামরিক পিঁপড়ের বাসাকে কি বলে জানো তো? বিভুয়াক, অর্থাৎ ক্যাম্প। অনেকটা মৌমাছির মতোই স্বভাব ওদের। দলের সবাই নির্ভর করে রানীর ওপর। ডিম পাড়ার সময় হলে বিরাট হয়ে যায় রানীর শরীর। জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধে। রানী ডিম পাড়তে বসে, আর শ্রমিকেরা দিকে দিকে বেরিয়ে যায় খাবারের খোঁজে। ডিম পাড়া শেষ হলে আবার শুকিয়ে যায় রানীর শরীর, দলটা বেরিয়ে পড়ে আবার নতুন জায়গার খোঁজে, একেবারে যাযাবর স্বভাব। একজায়গায় থাকতে যেন মন চায় না। আমি আসার পর

গ্রীনহাউসের পিঁপড়েগুলো কয়েকবার মাইগ্রেট করেছে। লম্বা সারি দিয়ে যখন চলতে থাকে সামরিক পিঁপড়ে, দেখার মতো দৃশ্য হয়!'

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'এই এলাকায় সামরিক পিঁপড়ে আছে জানতাম না। আফ্রিকান পিঁপড়ের ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছি। মাঝে মাঝেই নাকি চড়াও হয় আদিবাসীদের গাঁয়ে, বড় বড় জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।'

কথাটা শুনে যেন বেশ মজা পেলেন, এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন রেন। 'শুধু জানোয়ারই না, খাওয়ার মতো যা পায়, সব খেয়ে ফেলে। বেশির ভাগ পিঁপড়েই নিরামিষ খায়, কিন্তু সামরিক পিঁপড়ে মাংসভোজী, যাযাবর বলেই হয়তো। পিঁপড়ের দল আসতে দেখেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায় গাঁয়ের লোক। কারণ পিঁপড়ের কবলে পড়লে মানুষেরও রেহাই নেই, জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে।'

গায়ে কাঁটা দিলো মুসার।

দেখলেনই না রেন। বলার নেশায় পেয়েছে যেন তাঁকে। বলছেন, 'তবে ওই পিঁপড়ে অনেক উপকারও করে ওদের। ইঁদুর, বিছে, আর আরও নানারকম ক্ষতিকারক পোকামাকড় সব খেয়ে সাফ করে ফেলে। গাঁয়ের লোকেরা ফিরে এসে দেখে ঘরবাড়ি সব পরিষ্কার।

'আফ্রিকার পিঁপড়েদের মতো ভয়ঙ্কর নয় আমাদের দেশের পিঁপড়েরা। পেলে ছোটখাটো প্রাণী খায় বটে, তবে ওষুধের জন্যে এতো খোঁজাখুঁজি করে না। হাতের কাছে পোকামাকড় যা পায় তাই দিয়ে পেট ভরে।' কিশোরের দিকে তাকালেন রেন। 'তুমি যে ভাবছো, শুধু আফ্রিকাতেই আছে, তা নয়। অনেক দেশেই আছে সামরিক পিঁপড়ে। পানামায় আছে, মেকসিকোতে আছে, আমেরিকায় আছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ল্যাটিচিউডের দক্ষিণে বহু জায়গায় দেখা মিলবে ওদের। উত্তরে অরিগন এমনকি মেইনি পর্যন্ত।

'এই পাহাড়ের পিঁপড়েদের কথাই বলি। আফ্রিকান পিঁপড়ের সঙ্গে দেহগত অমিল তো আছেই, এমনকি এখানেই আগে যেরকম ছিলো, তার চেয়ে বদলে গেছে এখন। পা লম্বা হয়েছে আরও, শক্ত হয়েছে শরীরের খোলস।'

এক মুহূর্ত থামলেন রেন। উত্তেজনায় চকচক করে উঠলো চোখ। 'একটা মজার ব্যাপার দেখতে চাও?'

জবাবের অপেক্ষা করলেন না তিনি। একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা আর বোরিস।

'এই জায়গাটার মালিক, উইলিয়াম ওয়াগনার,' রেন বললেন। 'নাম হয়তো শুনেছো। কোটিপতি। মনটাও ভালো। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে অনেক সাহায্য-সহায়তা করেন। গত বসন্তে এদিকে এসেছিলাম পিঁপড়ে খুঁজতে। অদ্ভুত কিছু সামরিক পিঁপড়ে চোখে পড়ে যায়, ওয়াগনারের এলাকায়। তিনি এখানে থাকেন না, তবু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম। এখানে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন আমাকে। বলে দিলেন, ইচ্ছে করলে গোলাঘরটাকে ল্যাবোরেটরি বানাতে পারি। শুধু তাই না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ওয়াগনারদের যে ফাণ্ড আছে, তা থেকে কিছু টাকাও দিয়ে দিলেন। গবেষণা চালাতে আর অসুবিধে হলো না আমার।'

ছোট একটা গ্রীনহাউসের সামনে এসে দাঁড়ালেন রেন। পরিত্যক্ত, অবহেলিত, দেখেই বোঝা যায়। দরজা ঠেলে খোলার সময় কিঁচকিঁচ করে প্রতিবাদ জানালো। 'এই যে, সামরিক পিঁপড়ের কলোনি,' দেখালেন রেন।

একটা টেবিলের নিচে স্তূপ হয়ে ঝুলছে কালো পিঁপড়ে, মৌমাছির চাকের মতো। কি করে যেন টের পেয়ে গেল ওগুলো, দরজা খোলা হয়েছে। চাক ভেঙে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো সেদিকে।

'খাইছে!' জোরে কথা বলতে যেন ভয় পাচ্ছে মুসা। 'এতো চালাক!'

'দারুণ, তাই না?' খুশি হয়ে বললেন রেন। 'সামরিক পিঁপড়ের এই প্রজাতিটা নতুন, এরকম আর দেখিনি। কবে, কোত্থেকে, কিভাবে এসেছে ওরা, কোথায় যাবে, এসব জানার প্রচণ্ড আগ্রহ আমার। জানবো, জানতে আমাকে হবেই!'

খুদে প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বোরিস, অস্বস্তি ফুটেছে চেহারায়। 'যাওয়া দরকার। সাহেবের আসার সময় হয়েছে।'

গ্রীনহাউস থেকে বেরিয়ে গেল সে। মিনিটখানেক পরে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। এবার আর খেতের মধ্যে দিয়ে গেল না ওরা, ঘুরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নামতে লাগলো। চলতে চলতে ফিরে তাকালো একবার কিশোর। খেতের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই চেয়ে রয়েছেন ডক্টর রেন। বেড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে কাকতাড়ুয়াটাও তাকিয়ে রয়েছে আগের মতোই, ত্রিকোণ চোখ, মুখে শয়তানী হাসি।

মুসাও ফিরে তাকালো। বললো, 'আজব মানুষ! পিঁপড়ে নিয়ে এতো মাতামাতি···আস্ত পাগল! কিশোর, ওই কাকতাড়ুয়াটাও যেন কেমন! যখনই তাকাই, মনে হয় আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপছে, আর মিটিমিটি হাসছে!'

'ওসব চোখের ভুল। আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে অন্য আরেকটা ব্যাপার। রেনের মতো একজন বিজ্ঞানী, বুদ্ধিমান লোক আমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবে বসলেন কেন? জীবন্ত কাকতাড়ুয়া!'

তিন

'এখান থেকে পাঁচ মাইল,' মুসা বললো। 'তা-ও আবার চড়াই। এই গরমে সাইকেল চালিয়ে ঘামতে ঘামতে আবার যাবো? সাধারণ একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল দেখতে?' বিরক্তিতে নাক কুঁচকালো সে। 'একেই বলে কপাল! দরকারের সময় এখন একটা গাড়িও নেই।'

'খুব ভালো হয়েছে,' কিশোর বললো। 'কতোবার বলেছি, একটা গাড়ি জোগাড় করে দাও আমাকে। কানেই তোলোনি। আমার একটা গাড়ি থাকলে এ অবস্থাটা হতো না।'

'কি করে বুঝবো? কপাল যখন খারাপ হয়, তখন আর কিছুই করার থাকে না। নাহলে আমার গাড়িটাও বেচে দিলাম। আর সময় পেলো না, রবিনেরটাও গেল বিগড়ে। এমনই বিগড়ানো বিগড়েছে, ঠিক হবে কিনা তাই বা কে জানে। পুরনো ফোক্স ওয়াগন গাড়িগুলোর এই এক অসুবিধে। এঞ্জিন ডাউন দিলেই

বারোটা বাজলো…।'

'জাহান্নামে যাক ওটা,' বাধা দিয়ে বললো রবিন। 'একটা মাস দেখবো। তারপরও ঠিক করতে না পারলে আরেকটা কিনে নেবো।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'টাকা-পয়সা তো আজকাল ভালোই কামাচ্ছো। মুসা, এখনও সময় আছে। একটা গাড়ি জোগাড় করে দাও আমাকে। হাতে কিছু জমেছে।'

'আরে দিতাম তো। বসে আছি তোমার নিকিভাইয়ের জন্যে। সেই যে পনেরো দিন পরেই আসছি বলে গেল, আর পাত্তাই নেই।'

'নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়। কারও আশায় বসে থাকলে হয় না।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলালো মুসা। 'ঠিক আছে, দেখি, আমরা তিনজনেই বেরোবো একদিন। খুঁজে-পেতে দুটো গাড়ি বের করে ফেলবো। আমারও একটা দরকার।'

'গোটা দুই মোটর সাইকেল হলেও হতো। এই সাইকেল চালাতে আর ভালো লাগে না।'

'কেন?' মুচকি হাসলো রবিন। 'এতোদিন না বলে এসেছো, সাইকেল স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো। চালালে হার্টের অসুখ হয় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন কেন?'

'এখনও তা-ই বলছি। তবে, এই গরমের মধ্যে…আসলে, সব সময় সাইকেল দিয়ে হয় না। গাড়ি লাগেই। তাছাড়া আমাদের যে কাজ…যাকগে, ওসব নিয়ে পড়ে ভাববো। আপাতত কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারটার একটা কিনারা হোক।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আগের কথার খেই টানলো আবার মুসা। 'সাধারণ একটা কাকতাড়ুয়া দেখতে গিয়ে লাভটা কি?'

ওয়াগনার এস্টেট থেকে আসার কয়েক ঘণ্টা পর, রকি বীচের সীভিউ কাফের একটা বুদে ঢুকে আইসক্রীম খাচ্ছে, আর সকালের ঘটনার কথা আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা।

'কেন, একটুও কৌতূহল নেই তোমার?' কিশোর বললো। 'পুতুলটা অদ্ভুত লেগেছে তোমার কাছে, তখন বললে। কেন এরকম লাগলো, তদন্ত করে দেখবে না?'

'এখন আর অদ্ভুত লাগছে না,' ভোঁতা গলায় বললো মুসা।

'বেশ, অন্যভাবে ভাবি। রেনের কেন মনে হলো, তিনি জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া দেখেছেন? আমার ওপর কেন হামলা চালালেন।'

'সব কিছুতেই রহস্য দেখো তুমি,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চাইলো যেন রবিন। 'কোনো কারণে রেগে গিয়েছিলেন। হাতের কাছে তোমাকে পেয়ে ঝালটা ঝাড়লেন।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। খেতে নাহয় মানুষ ঢুকলোই, তাতে কি কেউ এতোটা উত্তেজিত হয়? হাতের পাথরটা তো দেখোনি। মাথাটা যে আমার ফাটিয়ে দেননি, এটাই বেশি।'

'অথচ লোক তিনি খারাপ নন, অন্তত খুনখারাপি করার মতো তো ননই। যেই

দেখলেন আমি একজন মানুষ, ব্যস, শান্ত হয়ে গেলেন। প্রথমে আমাকে অন্যকিছু ভেবেই রেগে গিয়েছিলেন। মানুষ নয়, অন্য কিছু! ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

হাসলো মুসা। 'শেষ পর্যন্ত কাক তাড়ানোর চাকরি দিয়ে দিলো তোমাকে পিঁপড়ের বিজ্ঞানী…হাহ্ হাহ্!'

হাতাকাটা শার্ট আর গাঢ় রঙের প্যান্ট পরা এক যুবক কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে। কিশোরের দিকে ফিরে বললো, 'কাকতাড়ুয়া হওয়ার উপযুক্ত নও তুমি। আরেকটু লম্বা, আর স্বাস্থ্য আরেকটু ভালো হলে পারতে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে তিন গোয়েন্দা।

কাপটা তুলে নিয়ে ওদের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো লোকটা। সরে তার জন্যে জায়গা করে দিলো মুসা।

'নিশ্চয় চ্যাপারাল ক্যানিয়নের কাকতাড়ুয়ার কথা বলছো তোমরা,' যুবক বললো। 'ওয়াগনারের এলাকায় ঘুরে বেড়ায়।'

'ঘুরে বেড়ায়! তার মানে বলতে চাইছেন, হাঁটে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। ছেলেদেরকে চমকে দিয়ে যেন মজা পাচ্ছে। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার নাম ডেভি, ডেভি জোনস। সেফ-টি-সিসটেম কোম্পানিতে কাজ করি আমি। বার্গলার অ্যালার্ম সিসটেম তৈরি করে কোম্পানি। বুঝতে পারছো তো কি জিনিস? চোর ঠেকানোর যন্ত্রপাতি। আমার মতো আরও কর্মচারী আছে ওখানে। আমাদের কাজ হলো খদ্দেরের বাড়িতে ওগুলো বসিয়ে দিয়ে আসা, তারপর নিয়মিত গিয়ে সার্ভিসিং করা। এই তো, চ্যাপারাল ক্যানিয়নেও লাগিয়ে দিয়ে এসেছি, মসবি মিউজিয়মে।'

'চিনি,' কিশোর বললো।

'সাংঘাতিক, তাই না? মসবির কথা শুনেছি আমি অনেক। বুড়ো নাকি বিরাট বড়লোক ছিলো। সে-ই তৈরি করেছে ওই মিউজিয়ম। নিজের বাড়িটাকে তৈরি করেছে দুর্গের মতো করে। অবশ্য দরকারও ছিলো। অনেক দামী দামী ছবি আছে ওখানে, দুনিয়ার যেখানে যা পেয়েছে, জোগাড় করতে পেরেছে, এনে সাজিয়েছে। সুপার অ্যালার্ম সিসটেম লাগিয়ে দিয়ে এসেছি ওখানে আমরা। হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে চেক করি ঠিক আছে কিনা।'

'কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'ও, বলছি। হপ্তাখানেক আগে এক বিকেলে গিয়েছিলাম মসবির ওখানে। কাজ শেষ করে গাড়িতে উঠেছি চলে আসার জন্যে, হঠাৎ চোখে পড়লো ওটা। ওয়াগনার হাউসের পাশ দিয়ে গুটিগুটি হেঁটে চলেছে। আমি যে দেখেছি সেটা বোধহয় টের পেয়ে গেল। দৌড়ে নেমে হারিয়ে গেল পাহাড়ের নিচে।'

কফির কাপে চুমুক দিলো ডেভি জোনস।

'তারপর?' শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর।

'তারপর আর কিছু না। সন্ধ্যা হয়েছে তখন, আলো কমে গেছে। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম, কাকতাড়ুয়াটাকে আবার দেখার আশায়। আর এলো না। একবার ভাবলাম, যাই, গিয়ে বলি মসবিদের। কিন্তু গেলাম না। বললে আমাকে পাগল ভাবতো।'

'তা তো ভাবতোই,' মুসা একমত হলো।

'তোমাদের কথা শুনছিলাম ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,' কাউন্টার দেখালো যুবক। কিশোরের দিকে তাকালো। 'তোমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছে কেউ, তাই না? ভুল করেছে। তুমি পুতুলটার সমান নও।'

'খেতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম,' জানালো কিশোর। 'লম্বা লম্বা গাছ, মাথা সমান, তাই আমাকে ভালোমত দেখা যায়নি। ভুলটা হয়েছে সে-জন্যেই।'

'হুঁ!'

'কাকতাড়ুয়াটা দেখতে কেমন?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

ভুরু কোঁচকালো যুবক। 'এই মাঝারি উচ্চতা। পাঁচ ফুট সাত কি আট। পাতলা। মাথায় কালো হ্যাট, গায়ে হালকা রঙের জ্যাকেট। মুখটা ভালোমতো দেখিনি। হাতার ভেতর থেকে খড় বেরিয়ে ছিলো। তাই দেখেই বুঝেছি, ওটা কাকতাড়ুয়া পুতুল।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ডেভি। 'থাকগে ওসব কথা। আর নাক গলাতে যাচ্ছি না আমি। আমার পরামর্শ শুনলে, তোমাদেরও যাওয়া উচিত হবে না। জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া! বাপরে, ভাবলেই রোম খাড়া হয়ে যায়! নিশ্চয় সাসকোয়াচের চেয়ে ভয়ঙ্কর! ভুলে যাও, বুঝলে, মন থেকে বিদেয় করে দাও ওটার কথা!'

জবাব দিলো না তিন গোয়েন্দা। কাফে থেকে বেরিয়ে গেল ডেভি।

কান চুলকালো কিশোর। উসখুস করলো। তাকালো দুই সহকারীর দিকে। 'তোমরা ভুলতে চাও?'

'চাইলেই বা কি?' হাত ওল্টালো মুসা। 'ভুলতে কি আর দেবে তুমি? ওঠো। অনেক দূর যেতে হবে।'

কাফে থেকে বেরিয়ে র‍্যাক থেকে সাইকেল বের করলো তিন গোয়েন্দা। তারপর কোস্ট হাইওয়ে ধরে রওনা হলো উত্তরে। চ্যাপারাল ক্যানিয়নে পৌঁছে মোড় নিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো পাহাড়ী পথ ধরে।

রক রিম ড্রাইভ একজায়গায় দু'ভাগ হয়ে গেছে। সেখানটায় পৌঁছে সাইকেল থামালো মুসা। পেছনে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো অন্য দু'জনের আসার। ওরা এলে জিজ্ঞেস করলো, 'খেতের ভেতর দিয়েই যাবো?'

'না, ডক্টর রেনকে আবার রাগানো ঠিক হবে না,' কিশোর বললো। 'দেখো, একটা কাঁচা রাস্তা। নিশ্চয় ওয়াগনার এস্টেটের ভেতর দিয়ে এসেছে,' খেতের দিকে নেমেছে পথটা।

'রাগ যদি করেনই, ওই রাস্তা দিয়ে গেলেও করতে পারেন,' রবিন যুক্তি দেখালো।

'তা হয়তো। তবে খেতের মধ্যে দিয়ে গেলে দেখতে পাবেন না, ওখান দিয়ে গেলে পাবেন,' আগে আগে চললো এখন কিশোর। রাস্তায় এসে উঠলো। গোলাঘরটা দেখা যায় এখান থেকে। ওটার বাঁয়ে সামান্য ওপরে রয়েছে সেই গ্রীনহাউস, যাতে বাসা বেঁধেছে পিঁপড়েরা। গ্রীনহাউসের অন্য পাশে একসারি ইউক্যালিপটাস গাছ সোজা নেমে এসেছে ঢাল বেয়ে। ওই গাছগুলোর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে কাঁচা রাস্তাটা।

চ্যাপারাল ক্যানিয়নের দিকে তাকালো কিশোর। ইংরেজি 'এল' আকৃতির একটা শাদা বাড়ি দেখতে পেলো, লাল রঙের টালির ছাত। এল-এর ভেতরের কোণে, আঙিনায় একটা সুইমিং পুল। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে রয়েছে সুন্দর লন।

বাড়িটা থেকে কিছু দূরে, পথের ধারে, আরেকটা উদ্ভট চেহারার বাড়ি, জানালা নেই। কংক্রীটের তৈরি।

'নিশ্চয় ওটাই মসবির দুর্গ,' মুসা আন্দাজে বললো। 'লোকটা নিশ্চয় পাগল ছিলো। নইলে এই পাহাড়ের মাঝখানে এসে মিউজিয়ম বানায়!'

'আগে ওটা মসবির বাড়ি ছিলো,' কিশোর বললো। 'এই এলাকায় তখন অনেক বড়লোক বাস করতো। বোঝাই তো যায়, কেন মসবি বাড়ি বানিয়েছে ওরকম করে। দামী দামী ছবি, চোর-ডাকাতের ভয় আছে না?'

'বিচ্ছিরি দেখতে,' বললো রবিন। 'বাজি রেখে বলতে পারি, ওটা যতোবার দেখেছেন ওয়াগনার, ততোবার নাক সিঁটকেছেন।'

ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর দিকে এগোলো ওরা। চুপচাপ। সবার মনেই এক ভাবনা, আবার না রেগে যান ডক্টর রেন। পিঁপড়ে বিশেষজ্ঞের উন্মাদ-হয়ে-যাওয়া চেহারা কেউই ভুলতে পারছে না, বিশেষ করে কিশোর।

গাছগুলোর কাছে পৌঁছে খেত আর বেড়ার ওপরের কাকতাড়ুয়াটা চোখে পড়লো। সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো তিনজনে। বেড়ার পাশ ঘুরে এসে দাঁড়ালো পুতুলটার কাছে, ভালো করে দেখার জন্যে।

পা নেই পুতুলটার। শরীরের ভেতরে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, লাঠির নিচের মাথা পেরেক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে বেড়ার সঙ্গে। কাঁধের নিচে আরেকটা লাঠি আড়াআড়ি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, দু'দিক থেকে বেরিয়ে আছে দুই মাথা, হাতের বিকল্প। মাথায় কালো হ্যাট, গায়ে রঙচটা করডোরয়ের জ্যাকেট, হাতার ভেতর দিয়ে খড় বেরিয়ে রয়েছে। লাঠির দুই মাথায় দুটো পুরনো দস্তানা পরিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথাটা তৈরি করা হয়েছে চটের ভেতরে খড় পুরে, তারপর জায়গামতো বসিয়ে তার দিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চোখ আর মুখ এঁকেছে কালি দিয়ে। 'এটার হাঁটার প্রশ্নই ওঠে না,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কে যেন। ফিরে তাকালো ছেলেরা। ইউক্যালিপটাসের ভেতর দিয়ে আসা একটা পথের ওপর দাঁড়িয়ে এক মহিলা। দেখেই মনে হলো ওদের, যেন দামী কোনো সেন্টের বিজ্ঞাপনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। পাতলা, সম্ভ্রান্ত চেহারা। গায়ে অনেক দামী পোশাক। তবে, ভালো করে তাকাতে চোখে পড়লো তার একদা ঝকঝকে লাল চুলের রঙ মলিন হয়ে এসেছে। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। চোখ দুটো অস্থির, বুনো দৃষ্টি।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মহিলা, 'কি যেন বললে?'

'না, বলছিলাম কি…,' চুপ হয়ে গেল কিশোর। কি বলবে? যদি বিশ্বাস না করে মহিলা, মুখের ওপর হেসে ওঠে? বোকা বনতে চায় না সে।

'কি বলেছো, শুনেছি। বলেছো, এটার হাঁটার প্রশ্নই ওঠে না।' গলা চড়েছে মহিলার, তীব্র কণ্ঠস্বর। যেন নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। 'কাকতাড়ুয়ার কথা কি কি জানো?'

'তেমন কিছু না। একটা লোকের সাথে দেখা হয়েছিলো। সে বললো, এই এলাকায় নাকি একটা জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া ঘুরে বেড়ায়। শুনে অবাক লাগলো। তাই দেখতে এসেছি, কথাটা সত্যি কিনা।'

'কাকতাড়ুয়া দেখেছে? কোন্ লোক? কোথায় আছে?'

দ্বিধা করলো কিশোর। বলে দেবে? বড় কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে ডেভি জোনস। শুনে তার বসেরা যদি ভেবে বসে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, চাকরি চলে যেতে পারে বেচারার। এতোবড় ক্ষতি করা উচিত হবে না।

'কি, বলো?' চাপ দিলো মহিলা।

'চিনি না। পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, দেখা হলো। আমরা পুতুলটার কথা আলোচনা করছিলাম, শুনতে পেয়ে থামলো। বললো, ওয়াগনারের বাড়ির কাছে হাঁটতে দেখেছে কাকতাড়ুয়াটাকে।'

'ঠিকই দেখেছে!' খলখল করে হেসে উঠলো মহিলা। তার মাথার ঠিক আছে কিনা, সন্দেহ হলো তিন গোয়েন্দার। 'জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া একটা সত্যি আছে এখানে! আমিও দেখেছি!'

হঠাৎ করেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো সে! হাসি গায়েব!

চার

তাজ্জব হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। কি করবে বুঝতে পারছে না। তবে তাড়াতাড়িই শান্ত হয়ে গেল সে, কিছুটা হতবুদ্ধি হয়েই যেন তাকালো আবার ওদের দিকে। 'সরি। পাগল ভাবছো তো আমাকে? সবাই তাই ভাবে। কিন্তু আমি পাগল নই। সত্যিই এই এলাকায় ঘোরে ওটা।'

চট্ করে একবার পুতুলটার দিকে তাকালো কিশোর।

'না না, এটা না,' মহিলা বললো। 'তবে ওটাও এটারই মতো দেখতে।'

সাবধানে হাসলো কিশোর, মহিলা না আবার রেগে যায়, এই ভয়ে। 'ঠিক এটারই মতো? যমজ-টমজ না তো?'

'কে জানে! তবে ওটা হাঁটে, এটুকু বলতে পারি। তা এসো না আমার বাড়িতে। মিসেস রোজারিওকে একটু বুঝিয়ে বলবে যে, আমি পাগল নই। পুতুলটার কথা বানিয়ে বলি না।'

'কিন্তু কতোখানিই বা জানি আমরা, আর কি-ই বা বলবো?'

'তাহলে ভাগো আমার জায়গা থেকে!' চাবুকের মতো শপাং করে উঠলো যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠ। 'এখানে কী! কার কাছে বলে ঢুকেছো!'

'না, কারো কাছে বলে ঢুকিনি। দুঃখিত। তবে কি জন্যে ঢুকেছি, বলতে পারি। রহস্য আর ধাঁধা অবাক করে আমাদেরকে, কৌতূহল জাগায়। সমাধান না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাই না।' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

দেখলো মহিলা। মাথা নাড়লো। 'বুঝলাম না।'

'আমরা গোয়েন্দা।'

'তা কি করে হয়!'

'তা-ই হয়েছে,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। বিশ্বাস না হলে পুলিশ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করে দেখতে পারেন।'

চুপ করে দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মহিলা। 'না, ফোন করতে হবে না। তোমার কথা বিশ্বাস করছি। বেশ, তোমাদেরকে ভাড়া করলাম। যা ফিস, তা-ই দেবো। এসো, আমার বাড়িতে এসে মিসেস রোজারিওকে বলো যে, এই এলাকায় সত্যিই একটা জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া আছে।'

বন্ধুদের দিকে তাকালো কিশোর। 'শুধু এই কথাটা বলার জন্যে টাকা নিতে পারি না আমরা, কি বলো?'

'না, পারি না,' রবিন বললো।

'আমি টাকা দেবো, তোমাদের কি? এসো,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মহিলা। ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো। তাড়াতাড়ি তার পাশে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

'মিসেস রোজারিও কে?' জানতে চাইলো মুসা।

'আমার মায়ের সেক্রেটারি ছিলো। এখন আমাদের বাড়ি দেখাশোনা করে। আমি এলিজা ওয়াগনার। অন্য কোথাও যখন থাকতে ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকি।'

'তাহলে,' কিশোর বললো। 'কাকতাড়ুয়াটাকে আপনিও দেখেছেন, না?'

'কয়েক বার। আমার...আমার মনে হয় আমাকে দেখতেই আসে। সন্ধ্যা বেলায়। সব সময় সন্ধ্যা বেলায়, অন্য কোনো সময় না।'

গাছের জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। লন পেরোনোর সময় এলিজা বললো, 'আমি ছাড়া এখানকার আর কেউ দেখেনি পুতুলটাকে। তাই আমাকে পাগল ভাবে। বলে, সব বানিয়ে বলি।'

আচমকা থেমে গেল সে। মুখে ভয় আর বিতৃষ্ণার মিলিত ছাপ। 'কাকতাড়ুয়া দু'চোখে দেখতে পারি না আমি! পোকামাকড়ও দেখতে পারি না! দেখলেই বমি আসতে চায়!'

কেঁপে উঠলো এলিজা। 'থাক, পোকামাকড়ের কথা থাক! এসো, মিসেস রোজারিওকে বলবে আমাকে যা বলেছো। ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও বলে বলে পাগল করে দিচ্ছে আমাকে। বেভারলি হিলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে চায়। এরকম করতে থাকলে সত্যি সত্যি কোনোদিন পাগল হয়ে যাবো!'

লনের পরে ওয়াগনার ম্যানসন। সিঁড়ি দিয়ে ম্যানসনের বারান্দায় উঠলো এলিজা। তাকে অনুসরণ করে তিন গোয়েন্দাও উঠে এলো। মুগ্ধ চোখে তাকালো সুইমিং পুলটার দিকে, রাস্তা থেকেই যেটা চোখে পড়েছিলো। স্বচ্ছ পানি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো মুসাকে, এখুনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তার। পুলের কিনারে একটা টেবিল পাতা। পাতলা শরীরের একজন লোক বসে আছে ওটার পাশে। মাথায় ধূসর চুল। গায়ে শাদা জ্যাকেট। টেবিলে বিছানো একগাদা কাগজ পরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয় সবকিছু ঠিক আছে

কিনা।

'ব্রড, মিসেস রোজারিও কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো এলিজা।

'ওর ঘরে,' লোকটা জবাব দিলো। কথায় ব্রিটিশ টান। 'আমার বেগম সাহেবও ওখানেই, ওকে সাহায্য করতে গেছে। বললো...'

'ওই যে, এসে গেছে।'

কালো ইউনিফর্ম আর শাদা অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা একটা হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে বারান্দায় বেরোলো। চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধা, বয়েস ষাটের কাছাকছি। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো ধবধবে শাদা। গালের ফ্যাকাসে চামড়া রুজ ডলে লালচে করা হয়েছে। নকশা কাটা নরম একটা কাপড় দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হয়েছে, কোমরের কাছ থেকে।

'এই যে, এলিজা, কোথায় গিয়েছিলে?' বৃদ্ধার চকচকে কালো চোখের তারা স্থির হলো ছেলেদের ওপর। 'এরা কারা?'

'তিন গোয়েন্দা।' কার্ডটা বৃদ্ধাকে দেখালো এলিজা। কিশোরের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি মুসা আমান?'

মাথা ঝাঁকালো মুসা।

'বাকি থাকলে তুমি, নিশ্চয় রবিন মিলফোর্ড।'

হেসে বললো রবিন, 'অবশ্যই।'

'এর কথাই বলেছিলাম তোমাদেরকে,' বৃদ্ধাকে দেখালো এলিজা। 'মিসেস রোজারিও।' বৃদ্ধার দিকে ফিরে বললো, 'এদেরকে নিয়ে এসেছি,তার কারণ, এরাও কাকতাড়ুয়াটার কথা জানে। তদন্ত করতে এসেছে। ওই রেন পাগলটার খেতের কাছে দাঁড়িয়ে পুতুলটাকে দেখছিলো। কেন ওদের এই কৌতূহল, জানেন?'

'কেন?'

'একটা লোকের সাথে দেখা হয়েছিলো ওদের। কাকতাড়ুয়াটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে সে-ও। ওদেরকে বলেছে।'

এলিজা খুব খুশি, উত্তেজিত। কিন্তু মিস রোজারিওকে তেমন একটা আগ্রহী মনে হলো না। 'ওদেরকে বসতে বলো। আমাদের সাথে চা খাবে। ব্রড, আরও তিনটে চেয়ার দাও।'

'দিচ্ছি।' তাড়াহুড়ো করে চেয়ার আনতে চলে গেল ব্রড নিউম্যান। পেছন পেছন গেল তার স্ত্রী।

নিজেই চাকা ঘুরিয়ে চায়ের টেবিলের সামনে হুইল চেয়ার নিয়ে এলেন মিসেস রোজারিও। গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তাহলে একটা লোকের দেখা পেয়েছো, যে জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া দেখেছে। ভালো। খুলে বলো তো সব কথা।'

চেয়ার আনা হলো। মিসেস রোজারিওর পাশে বসলো কিশোর। শুরু করতে গিয়ে থেমে গেল সে। ডক্টর রেন আসছেন। কাছে এসে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী?'

'কি আবার? চা খেতে বসেছি।' শীতল গলায় জবাব দিলো এলিজা। 'কিছু

লাগবে আপনার?'

দুপদাপ করে দু'পা এগিয়ে এলেন রেন। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'মিথ্যুকের দল! ট্রাকের চাকা ফেঁসেছিলো, না? সব শয়তানী, সব মিথ্যে কথা! গল্প বানিয়ে বলে আমার ল্যাবোরেটরিতে ঢোকার ফন্দি...আমি...আমি...'

রাগে ভাষা হারিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানী।

'আপনার ল্যাবোরেটরিতে ঢোকার জন্যে মিথ্যা কথা বলতে যাবো কেন আমরা?' কিশোর বললো। 'একটা ফোন করা দরকার ছিলো, করেছি। এছাড়া আর কি কিছু করেছি? তারপর তো বাড়ি ফিরে গেলাম। রকি বীচে একটা লোকের সঙ্গে দেখা। সে বললো, এই এলাকায় একটা জ্যান্ত কাকতাড়ুয়াকে দেখেছে। মিস ওয়াগনারও নাকি দেখেছেন। তিনি বললেন, এখানে একমাত্র তিনিই নাকি দেখেছেন ওটাকে। কথাটা কি ঠিক, ডক্টর রেন?'

জবাব দিলেন না ডক্টর। তবে চেহারা লাল হয়ে গেল।

'তারমানে আপনিও দেখেছেন!' চিৎকার করে উঠলো এলিজা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'দেখেছেন, তাই না? কথা বলেন না কেন?'

'ইয়ে...ওই...কিছু একটা দেখেছি,' স্বীকার করলেন রেন, যদিও অস্বস্তি চাপতে পারলেন না। 'যে রাতে আমার ল্যাবোরেটরিতে চোর ঢুকেছিলো, পুলিশকে ফোন করেছিলাম, সে রাতে পলকের জন্যে দেখলাম। কাকতাড়ুয়ার মতোই।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন চোর!'

'বলেছিলাম, আপনাদেরকে আরও ঘাবড়ে দিতে চাইনি বলে। এমনিতেই পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছে। রকি বীচ থেকে ইয়ান ফ্লেচার এসেছিলেন। সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার। যখন বললাম, একটা কাকাতাড়ুয়া ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে আমার মাথায় বাড়ি মেরেছে, পিঁপড়ে চুরি করেছে, চেহারাটা যদি তখন দেখতেন ওদের!'

হেসে উঠলো এলিজা। 'নিশ্চয়ই পাগল ভেবেছে আপনাকে? কিন্তু আমাকে বললে পারতেন। এ-বাড়ির সবাই আমাকে পাগল ভাবে। কেন বললেন না? আমি তো আপনারই দলে।'

মুখ কালো করে ফেললেন বিজ্ঞানী, নিজেকে 'এলিজার দলে' ভাবতে পারছেন না। 'দেখুন আমি বিজ্ঞানী, আমার একটা সুনাম আছে। ওসব পাগলামির মধ্যে গেলে আমার সর্বনাশ হবে। আমাকে আর গবেষণা করতে দেয়া হবে ভেবেছেন?'

রেগে গেল এলিজা। 'তাই বলে সত্যি কথা বলবেন না? ঘেন্না লাগছে আপনাকে দেখে! ছিহ্!' দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল সে। সেদিকে তাকিয়ে রইলো মিসেস রোজারিও, চোখে 'আহারে বেচারি!' দৃষ্টি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন রেন। 'ওটা আসলেই পাগল!' ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'কি করতে এসেছো এখানে, বললে না?'

'কাকতাড়ুয়াটাকে ভালোমতো দেখতে এসেছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'আমাকে তো সকালে কাকতাড়ুয়া ভেবেছেন। ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণটা কি, তদন্ত করে জানতে এসেছি।'

'সকালে বেআইনী ভাবে ঢুকেছিলে আমার খেতে,' অভিযোগ করলেন রেন।

'এখন এসেছো আবার সেই একই কাজ করতে!'

'আমাদেরকে সন্দেহ করছেন আপনি? খারাপ ছেলে মনে হচ্ছে?' আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলো রবিন। 'মনে অতো খুঁতখুঁতি রেখে লাভ কি? মিস্টার ইয়ান ফ্লেচারকেই ফোন করুন। বলুন আমাদের কথা। চমকে যাবেন।'

'কেন, চমকে যাবো কেন?'

'কারণ তিনি আমাদের চেনেন। ভালো সার্টিফাই করবেন।'

'তাই করবো।' গলা চড়িয়ে ডাকলেন রেন, 'ব্রড, টেলিফোনটা নিয়ে এসো তো!'

একটা টেলিফোন সেট নিয়ে বেরিয়ে এলো হাউসম্যান ব্রড। দরজার পাশের একটা জ্যাকে ঢুকিয়ে দিলো তারের মাথায় লাগানো প্লাগটা। সেটটা এনে রেনের হাতে তুলে দিয়ে আবার চলে গেল ঘরের ভেতর।

ডায়াল করলেন রেন। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই ফ্লেচারকে চাইলেন।

'ডক্টর হেনরি রেনহার্ড বলছি, ওয়াগনার এস্টেট থেকে,' চীফ টেলিফোন ধরলে বললেন বিজ্ঞানী। 'তিনটে ছেলে সারাটা দিন ঘুরঘুর করছে এই এলাকায়। খেতে ঢুকেছে। এখন এসেছে কাকতাড়ুয়া পুতুল দেখতে। বলছে গোয়েন্দা, তদন্ত করতে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে...'

থেমে গেলেন তিনি। ওপাশের কথা শুনলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজনের মাথায় কোঁকড়া চুল। হ্যাঁ, বিদেশী, বোধহয় ইনডিয়ান,' বললেন রেন।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর তাকালেন কিশোরের দিকে। 'তুমি কিশোর পাশা?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

ফোনে কথা বললেন রেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম কিশোর পাশা।'

আবার ওপাশের কথা শুনলেন বিজ্ঞানী। চীফকে ধন্যবাদ দিয়ে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

'ইয়ান ফ্লেচার তোমাদেরকে সাবধান করে দিতে বলেছেন,' রেন বললেন ছেলেদেরকে।

'ঝামেলা পাকাতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা ক্ষতিকর নও, একথাও বলেছেন। আসলে,' নাক চুলকালেন তিনি, 'তোমাদেরকে ভালোই বলেছেন, তবে আমার ব্যাপারে শিওর না তিনি।'

ঠিক এই সময় চিৎকার শোনা গেল ঘরের ভেতরে। তীক্ষ্ণ, লম্বিত, কাঁপা কাঁপা চিৎকার!

'হায় আল্লাহ!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস রোজারিও। 'এলিজা! হলো কি মেয়েটার!'

পাঁচ

ওপরতলার হলঘরে পাওয়া গেল এলিজাকে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে

আছে। তিন গোয়েন্দা আর রেনফোর্ডকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, 'পিঁপড়ে!' দরজার দিকে হাত তুললো সে। 'ওখানে! কোটি কোটি পিঁপড়ে!'

'সর্বনাশ!' দরজার কাছে ছুটে গেলেন ডক্টর। দরজা খুলে ঢুকলেন ছোট একটা সিটিংরুমে। ছেলেরাও ঢুকলো। অন্যপাশে বড় একটা বেডরুম দেখা গেল। বিশাল বিছানা পাতা। আর ওই বিছানায় ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে শত শত পিঁপড়ে।

থমকে দাঁড়িয়েছেন ডক্টর। কি করবেন মনস্থির করতে পারছেন না।

'নরিটা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলো এলিজা। সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'জলদি স্প্রে নিয়ে এসো!'

'এগুলোই আপনার হারানো পিঁপড়ে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

এগিয়ে গিয়ে পিঁপড়েগুলোকে কাছে থেকে দেখলেন ডক্টর। 'হ্যাঁ, এগুলোই।'

'হায় হায়, এসব কি!' পেছন থেকে বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকালো ছেলেরা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে নরিটা নিউম্যান। হাতে একটা পোকামাকড় মারার স্প্রে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে এলিজা।

'এই, সরো তো তোমরা,' ছেলেদের বললো নরিটা। 'আমি দেখছি ওগুলোকে।'

বেশ হাসিখুশি কণ্ঠ। কথায় ব্রিটিশ টান, খাস লণ্ডন শহরের বাসিন্দা। এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, যেন ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে চলেছে। ওষুধ স্প্রে করতে শুরু করলো পিঁপড়েগুলোর ওপর।

'আর ভয় নেই মিস,' এলিজাকে অভয় দিলো সে। 'এখুনি শেষ হয়ে যাবে শয়তানগুলো। বিছানার চাদরটা বদলে দেবো। ব্যস, সব পরিষ্কার। মনে হবে কিছুই হয়নি।'

জ্বলন্ত চোখে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এলিজা। 'আপনার দোষ! সব আপনার দোষ! এ-বাড়িতে কখনও পিঁপড়ে ঢোকেনি। আপনার হতচ্ছাড়া গবেষণা...'

'মিস ওয়াগনার,' বাধা দিয়ে বললেন ডক্টর। 'আমি আসার আগেই এখানকার পাহাড়ে ছিলো ওই পিঁপড়ে। বাড়িতে ঢুকেছে...'

'আপনাআপনি ঢোকেনি,' শুধরে দিলো কিশোর। 'ঢোকানো হয়েছে। বয়ে এনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওখানে।'

ঝুঁকে বিছানার নিচ থেকে একটা কাঁচের জার বের করে আনলো সে। এখনও কয়েকটা পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করছে ওটার ভেতর। 'এটা কি আপনার?' রেনহার্ডকে জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'কাকতাড়ুয়া যে চুরি করেছিলো, তারই কাজ এটা মনে হচ্ছে।'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো কিশোরের মুখে। 'চোর কাকতাড়ুয়া। দারুণ! ক্রমেই মজা বাড়ছে কেসটার।'

'এতো খুশি কেন!' তীক্ষ্ণ হলো এলিজার কণ্ঠ। ফ্যাকাশে গালে চামড়ার নিচে রক্ত জমতে আরম্ভ করেছে, লাল লাল ফুটকির মতো লাগছে বাইরে থেকে। 'যাও,

বেরোও! এই, আপনিও বেরোন! ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যান! দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি আজই! ভাইকে ডেকে কালই যদি না তাড়িয়েছি তো…'

'ব্যস, হয়েছে!' যেন রেগে যাওয়া একটা বাচ্চার সঙ্গে মোলায়েম গলায় কথা বলছে, এমনি ভঙ্গিতে বললো নরিটা। স্প্রেটা নামিয়ে রাখলো মাটিতে। চাদরটা ভাঁজ করলো, ভেতরে রইলো মরা পিঁপড়েগুলো। ওটা ডক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নিন, নিয়ে যান। ভাববেন না ছেড়ে দেবো। ঠিকই খুঁজে বের করবো কার কাজ এটা।'

মুখ কালো করে চাদরটা নিলেন ডক্টর। তাঁর পেছন পেছন নিচতলায় নেমে এলো তিন গোয়েন্দা।

হলে এসে থামলেন রেন। ছেলেদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমাদের কেস এখানেই খতম। আমাকেও তাড়াবে কিনা বুঝতে পারছি না। এলিজার মেজাজ-মর্জির কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এই ভালো তো এই খারাপ। রাগ হলে এক কথা বলে, ঠাণ্ডা হলেই ভুলে যায়। দেখা যাক, সত্যিই আজ রাতে তার ভাইকে বলে কিনা!'

পিঁপড়ে বোঝাই চাদরটা নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরোলেন তিনি। বিশাল বাড়িটার লিভিং রুম পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। আগের জায়গাতেই বসে কফি খাচ্ছেন মিসেস রোজারিও, পিঁপড়ের কথায় কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না তাঁর। সামরিক পিঁপড়ের আনাগোনা যেন এখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। তাঁকে বললো ওরা, চা খাওয়ার জন্যে আর থাকতে পারছে না। শুনে দুঃখ পেলেন যেন মহিলা, ভাবভঙ্গি দেখে সেরকমই মনে হলো। গুডবাই জানালেন ওদেরকে।

রকি বীচে যখন ফিরলো তিন গোয়েন্দা, রাতের খাবারের সময় পেরিয়ে গেছে তখন। পরদিন সকালের আগে আর অদ্ভুত ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় বসতে পারলো না। পরদিন জমায়েত হলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে, কিশোরের ওয়ার্কশপে।

চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে টিনের চালার দিকে তাকিয়ে ছিলো কিশোর, এই সময় ঢুকলো রবিন আর মুসা।

'কাকতাড়ুয়ার কথা ভাবছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি ভাবছো না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর।

'নিশ্চয়ই। পিঁপড়েগুলোর কথাও। চুরি করে এনে কে ওগুলোকে ছেড়ে দিলো একজন ভদ্রমহিলার বিছানায়?'

'এমন কেউ, যে তাকে পছন্দ করে না,' জবাব দিলো মুসা। 'অবশ্য তাকে অনেকেরই পছন্দ হবে না। যা বদমেজাজ…'

টিপটিপ করে জ্বলতে শুরু করলো ছাপার মেশিনের ওপরে বসানো বাতিটা। সংকেত। হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে।

'হুঁ, এটাই ভেবেছিলাম,' আলোটার দিকে তাকিয়ে ভারিক্কি চালে বললো কিশোর। 'সকাল থেকেই বসে আছি ওই টেলিফোনের অপেক্ষায়।'

দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সরিয়ে পাইপের ভেতরে ঢুকলো মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এসে তিনজনে ঢুকলো ট্রেলারে।

বেজেই চলেছে টেলিফোন।

জবাব দিলো মুসা। কান পেতে ওপাশের কথা শুনে হাসলো। 'না, আমি মুসা। কিশোর এখানেই আছে। রবিনও।'

আবার শুনলো ওপাশের কথা। বললো, 'ধরুন।' তারপর মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে, আন্দাজ করতে পারো?'

'এলিজা ওয়াগনার,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'আমাদেরকে চাইছে। তদন্ত করে খুঁজে বের করতে বলছে কাকতাড়ুয়া সেজে কে তাকে ভয় দেখায়। কে পিঁপড়ে ছেড়ে রেখে গেছে বিছানার ওপর।'

'জিনিয়াসেরাও ভুল করে অনেক সময়,' কিশোরের জবাব ঠিক হয়নি বলে বেশ খুশি লাগছে মুসার। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। 'ডক্টর হেনরি রেনহার্ড। কাকতাড়ুয়া সেজে কে এলিজাকে ভয় দেখিয়েছে, কে তার বিছানায় পিঁপড়ে ছেড়েছে, খুঁজে বের করে দিতে বলছেন। আমাদেরকে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন তাঁর সঙ্গে। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন আমাদের ফোন নম্বর।'

'হাহ্-হা!' হাততালি দিয়ে বললো কিশোর। 'কেস একটা পেলাম অবশেষে। আমি যাবো। রবিন, তুমি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো রবিন।

মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ডক্টরকে বললো মুসা, 'এখুনি রওনা হচ্ছি আমরা।'

ছয়

এক ঘণ্টাও লাগলো না, ওয়াগনার এস্টেটের লাল গোলাবাড়িটায় পৌঁছে গেল তিন গোয়েন্দা।

'কাল রাতে ভাইকে ফোন করেনি এলিজা,' ঘোষণা করলেন ডক্টর। বেশ খুশি খুশি লাগছে তাঁকে। টেবিলে কনুই রেখে উঁচু একটা টুলের ওপর বসে আছেন। টেবিলে পড়ে রয়েছে কতগুলো যন্ত্রপাতি-কর্নিক, সাঁড়াশি আর চিমটা। 'জানি, বললেও উইলিয়াম ওয়াগনার সেকথা শুনতেন না। তবে বলাও যায় না অবশ্য, বোনের কথায় ভাই কখন রাজি হয়ে যায়। সেজন্যেই চিন্তায় ছিলাম। যাকগে, আসল কথায় আসি। এই কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। এটা এখন এলিজারই শুধু নয়, আমারও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পিঁপড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে কেউ। একটা গোলমাল বাধিয়ে আমাকে তাড়ানোর চেষ্টা এটা, বুঝতে পারছি। কিন্তু গবেষণা ফেলে এখান থেকে যেতে চাই না আমি।

'সকালে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করেছিলাম,' বলতে থাকলেন বিজ্ঞানী। 'কাল রাতে বিছানায় পিঁপড়ে ওঠার কথা বলেছি। এলিজা যে কয়েকবার কাকতাড়ুয়াটাকে দেখেছে, একথাও বলেছি। ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেননি চীফ। তাঁর ধারণা, এসব কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। আমাদেরকে বিরক্ত করে মজা

পাচ্ছে। তিনি বললেন, এটা তোমাদের উপযুক্ত কেস।'

'আপনার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'দুষ্টু ছেলের কাজ?'

'আশেপাশে কোনো ছেলেই নেই। দুই মাইলের মধ্যে বাড়ি বলতে ওয়াগনার হাউস আর মসবি মিউজিয়মটাই শুধু। ওয়াগনার হাউসে যারা থাকে, সবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমাদের। মসবি মিউজিয়মে থাকেন কিউরেটর স্টেবিনস কলিগ আর দু'জন গার্ড। জায়গাটার দেখাশোনাও ওরা দু'জনেই করে। রোজ পাঁচটায় বাড়ি ফিরে যায়। মিউজিয়মেই থাকেন কলিগ। মানুষকে বিরক্ত করার মতো লোক নন তিনি।'

'হুঁ, বুঝলাম,' কিশোর বললো। 'তিন গোয়েন্দাকে কাজে লাগাতে চাইলে গোড়া থেকে সব খুলে বলুন। আপনি যা যা জানেন। কাকতাড়ুয়া রহস্যের সমাধান হয়তো খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।'

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে নোট নিতে তৈরি হলো রবিন।

'মনে হচ্ছে,' শুরু করলেন ডক্টর। 'কাকতাড়ুয়া রহস্যের শুরুটা আমিই করেছি, খেতের ধারে পুতুল দাঁড় করিয়ে দিয়ে পুরনো কাপড় দিয়ে বানিয়েছি, চেয়ে নিয়েছি ওগুলো মিসেস নিউম্যানের কাছ থেকে। চিলেকোঠা থেকে এনে দিয়েছে সে। খেতে ফসলও আমি ফলিয়েছি, পিঁপড়ের খাবারের জন্যে। শস্য খেতের ওপর যে কি লোভ পোকামাকড় আর পিঁপড়েদের, কল্পনাই করতে পারবে না তোমরা।'

'তোমাদেরকে আগেই বলেছি, পিঁপড়ের টানেই ঘর ছেড়েছি আমি, এখানে এসে হাজির হয়েছি। দুনিয়ায় পিঁপড়েই আমার একমাত্র আকর্ষণ। ওদেরকে নিয়েই থাকি, গবেষণা করি, ফলে এখানকার লোকজনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠেনি আমার। বেশির ভাগ সময়ই ঘরে বসে থাকি। গবেষণার জন্যে টাকা ছাড়াও বিশাল গোলা বাড়িটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন উইলিয়াম ওয়াগনার। এটাতে ল্যাবোরেটরি বানিয়েছি আমি। গেস্ট হাউসে থাকি, ভাড়া দিতে হয় না।'

'গেস্ট হাউস?' কিশোর জানতে চাইলো, 'কোথায় ওটা?'

'ওই বাড়িটার,' ওয়াগনারদের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন ডক্টর। 'পেছনে কিছু দূরে। একটা পাহাড়ের মাথায়। কাল তোমরা দেখনি। ওয়াগনার ম্যানশন আর ওটার মাঝে অনেক ওক গাছ আছে, সেজন্যে দেখা যায় না।'

'ভালোই ব্যবস্থা হয়েছে এখানে আপনার। বুঝতে পারছি, কেন যেতে চান না।'

'হ্যাঁ। এখান থেকে চলে যেতে হলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। ভালো কাজ করছিলাম, এলিজা আসার পর গড়বড় হয়ে গেল।'

নোটবুক থেকে মুখ তুললো রবিন। 'আগে এখানে ছিলো না ও?'

'না, ছিলো না। আমি এসেছি মে মাসে। ও এসেছে জুনে। ওর কথা নিশ্চয় খুব একটা জানো না তোমরা। ঘুরে বেড়ানোর ভীষণ শখ। বেশির ভাগ সময় কাটায় ইউরোপে। পুরুষ মানুষের সঙ্গে গোলমাল না হলে ফেরে না।'

'কি না হলে ফেরে না?' বুঝতে পারছে না রবিন।

হাসলেন ব্রেন। ছেলেদের কাছে বলতে লজ্জা পাচ্ছেন যেন। 'প্রেমটেম এক

বেশি করে আরকি এলিজা। বহুবার এনগেজমেন্ট করেছে, কিন্তু কাউকে বিয়ে করেনি। কোনো না কোনোভাবে ভেঙে গেছে এনগেজমেন্ট। গোলমাল একটা হয়েই যায়। তখন বাড়ি ফিরে আসে সে। সান্তা মনিকা মাউনটেইনের চমৎকার পরিবেশে হাওয়া বদল করে, ভাঙা হার্ট জোড়া লাগায়। এই মুহূর্তে একজন হাঙ্গেরিয়ান কাউন্টকে ভোলার চেষ্টা করছে এলিজা।

'পোকামাকড় দুচোখে দেখতে পারে না ও। তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছো ব্যাপারটা। কাজেই আমাকে তার এলাকায় পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা করতে দেখলে যে খুশি হবে না, এ-তো জানা কথাই। কাজেই কাকতাড়ুয়াটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সন্দেহ করে বসেছে এলিজা। প্রথম কারণ, আমাকে পছন্দ করে না। দ্বিতীয় কারণ, খেতের বেড়ায় কাকতাড়ুয়া লাগিয়েছি আমি।'

'প্রায়ই দেখে নাকি ওটাকে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'পাঁচবার দেখেছে। প্রায় পাগল বানিয়ে দিয়েছে ওকে। একবার কতগুলো পোকা মাকড় ছেড়ে দিয়েছিলো ওটা তার গায়ে। মিসেস রোজারিওর বিশ্বাস, এলিজা পুরো পাগল। কেউই বিশ্বাস করে না তার কথা। করার কথাও নয়। জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া আছে, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে? মিসেস রোজারিও তো আজকাল বেশ চাপাচাপিই করছেন, বেভারলি হিলে গিয়ে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়ে আনানোর জন্যে। কিন্তু আমি জানি এখন, কাকতাড়ুয়া যেহেতু সত্যি আছে, এলিজাকে ভালো করা ডাক্তারের কর্ম নয়।'

'মিসেস রোজারিওর কথা বলুন তো। এমন আচরণ করেন…'

'যেন তিনিই বাড়ির মালিক,' কিশোরের কথাটা শেষ করে দিলেন ডক্টর। 'তা করেন বটে। তিনি এলিজার মায়ের সোশাল সেক্রেটারি ছিলেন। মিস্টার ওয়াগনার অনেক আগেই মারা গেছেন, মিসেস মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন মিসেস ওয়াগনার। সুইমিং পুলে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন পানি ছিলো না ওটাতে, মেরামতের কাজ চলছিলো বলে। দুটো হিপই ভেঙে যায় তাঁর। কোনোদিনই আর ঠিক হবে না, ফলে বাকি জীবনটা হুইল চেয়ারেই কাটাতে হবে।'

'নিউম্যানদের কি খবর?'

'ওরা নতুন কর্মচারী। গত ফেব্রুয়ারিতে মিসেস রোজারিও চাকরি দেন ওদের। এই তো, এই ক'জন লোকই আছে ওয়াগনার ম্যানশনে। এছাড়া মালি আছে, তবে ওরা সব সময় থাকে না। হপ্তায় দু'বার করে আসে, কাজ করে দিয়ে চলে যায়। পুল দেখাশোনা করে যে লোকটা, সে-ও ওভাবেই আসে। মিস্টার কলিগ প্রায়ই আসেন মিসেস রোজারিওর সঙ্গে দাবা খেলতে। তবে তাঁকে সন্দেহ করার কোনো মানে নেই। অন্য কেউ লেগেছে এলিজার পেছনে। কেন, কে জানে! আমাকে দোষ দেয় সে, সন্দেহ করে, হয়তো এরকম করে করে একদিন তাগাবে আমাকে এখান থেকে। তার জন্যেই খারাপ হবে সেটা।

'তার জন্যে?' কথাটা ধরলো কিশোর। 'কেন?'

'আগেই বলেছি, এখানকার পিঁপড়েদের সম্পর্কে এখনও তেমন জানি না আমি। কি রকম স্বভাব, কতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, কতোটা ক্ষতিকর, জানি না।

একটা কথাই শুধু জানি, ওগুলো সামরিক পিঁপড়ে। আর সামরিক পিঁপড়েরা য
পায় তা-ই খায়।

'এক সময় না এক সময় পাহাড়ের ওপরের কলোনিগুলোতে ভাগাভা
হবেই। শ্রমিকদের নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে অল্পবয়েসী রানীরা। নতুন কলো
গড়বে। আমি তখন এখানে থাকতে চাই। কয়টা কলোনি হয়, কতো বড়, এব
কতো তাড়াতাড়ি, দেখতে চাই। কতো দূরে মাইগ্রেট করবে ওরা, বুঝতে পার
না। যতো দূর যাবে, জীবনের চিহ্ন রাখবে না। আফ্রিকান পিঁপড়েরা সারি দি
চলে। চলার পথে জীবন্ত যা-ই পড়ুক, ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। এখানকা
পিঁপড়েগুলো কি কি খাবে, ঠিক করে বলতে পারছি না এখনও।'

'আপনার…আপনার কি মনে হয়,' মুসা ভয় পেয়ে গেছে। 'মারাত্মক হ
উঠবে মানুষের জন্যেও?'

'বিশ্বাস কি? হাজার হলেও সামরিক পিঁপড়ে, আফ্রিকান পিঁপড়ের জাতভাই
হলে অবাক হবো না। এখানে এদেরকে ছুঁচো আর মেঠো ইঁদুর খেতে দেখেছি
আমি যখন গেছি, বেচারা প্রাণীগুলোর খুদে কঙ্কালের ওপর তখনও জড়ো হ
ছিলো পিঁপড়ে। ওরা যখন সরলো, এককণা মাংসও আর তখন লেগে নেই
একেবারে ঝকঝকে কঙ্কাল।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' কিশোর বললো। 'টাইম বম্ব রয়ে
এখানে। পিঁপড়ের বোমা!'

মাথা ঝাঁকালেন রেন। 'বুঝতে পেরেছো। যখন তখন ফাটতে পারে!'

ল্যাবোরেটরির খোলা দরজায় খুট্ করে শব্দ হলো। ফিরে তাকালো সবাই
দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এলিজা। চোখে আতঙ্ক। চেঁচিয়ে বললো, 'সাংঘাতিক!
ভীষণ কথা! বাবা গো, আমার জায়গায় খুনে পিঁপড়ে! আমি…আমি আর স
করতে পারছি না!'

কাঁদতে আরম্ভ করলো সে।

সাত

'এলিজা,' রাগ করে বললেন ডক্টর। 'কিছু শুনলেই ওরকম খেপে যান কেন
শান্তভাবে যদি নিতে পারেন, তাহলেই আর কিছু হয় না।' ধরে এনে তাকে বসি
দিলেন টেবিলের পাশের একটা টুলে। একবাক্স টিস্যু পেপার ঠেলে দিলেন তা
দিকে। 'চোখ মুছুন, শান্ত হোন, লক্ষ্মী মেয়ের মতো। আমি কথা দিচ্ছি, যতোক্ষ
আমি আছি এখানে, ওরকম খারাপ কিছু ঘটতে দেবো না। শুনুন, এই ছেলেগু
এসেছে কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে।'

একটা পেপার বের করে নিয়ে চোখে চাপ দিলো এলিজা। 'কি বললে
আমাদেরকে? এই আমরাটা কারা? আপনি এবং আমি?'

'নিশ্চয়। আমাদেরকেই কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। আপনার সামনে ছা
থেকে বেরিয়ে আসে ওটা। আমার মাথায় বাড়ি মারে, জার চুরি করে নিয়ে যায়
কিছু একটা করার সময় হয়েছে আমাদের।'

হেঁচকি তুললো এলিজা। 'বেশ। কিন্তু এরা কিভাবে কি করবে? এই ছেলেমানুষরা?'

'তাহলে কি বড় কোনো গোয়েন্দার কাছে যেতে চান?' প্রশ্ন তুললেন ডক্টর। 'বিশ্বাস করবে আপনার কথা? একটা কাজই করতে পারে, মোটা টাকা ফিস নিয়ে চুপচাপ কথা শুনতে পারে আপনার। তারপর হেসে উড়িয়ে দেবে। আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যেতে। ওই পরামর্শের জন্যে টাকা দিতে চান?'

'একটা পয়সাও না! ঠিকই বলেছেন। আমাকে স্রেফ পাগল ভাববে।'

'কিন্তু আমি জানি আপনি পাগল নন। সত্যিই দেখেছেন কাকতাড়ুয়াটাকে। আমিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমার মাথায় বাড়ি মেরেছে ওটা।'

কেঁপে উঠলো এলিজা। 'কাকতাড়ুয়া! ভয়ঙ্কর! সারা গায়ে মাছি আর মাকড়সা কিলবিল করে! ভেতরে, বাইরে, সবখানে।'

'আমি তো জানতাম,' কিশোর বললো। 'কাকতাড়ুয়ার ভেতরে শুধু খড় থাকে।'

'তা তো নিশ্চয়ই থাকে। আর খড়ের ভেতরে বাসা বাঁধে মাকড়সা। গায়ের ওপর যেদিন কাকতাড়ুয়া পড়বে, সেদিন বুঝতে পারবে। আমার গায়ে পড়েছিল একবার। হ্যালোউইন পার্টিতে খেলার জন্যে আব্বার সঙ্গে কুমড়ো কিনতে গিয়েছিলাম একবার এক চাষীর বাড়িতে। উপত্যকায়। ওখানেও খেতের বেড়ায় কাকতাড়ুয়া ছিলো, এখানে যেমন আছে। কাছে থেকে দেখতে গিয়েছিলাম। বেড়ায় ওঠার চেষ্টা করছি···এই সময়···এই সময়···'

'ভেঙে পড়লো ওটা আপনার গায়ে?'

মাথা ঝাঁকালো এলিজা। 'কি সাংঘাতিক! এত্তো নোংরা! কয়েক লাখ বছর ধরে বোধহয় ছিলো ওখানে। ভেঙে পড়লো। টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমার গায়ের ওপর পড়ে। ভেতরে মাকড়সার ছড়াছড়ি। আমার সারা গায়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো ওগুলো। মুখে উঠে এলো, চুলের মধ্যে ঢুকে গেল! বাপরে বাপ, কি বলবো! কোনো দিন ভুলবো না আমি!'

'হুঁম্‌ম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'কাকতাড়ুয়া আর মাকড়সাকে তাহলে ভীষণ ভয় পান আপনি!'

'কোনো পোকামাকড়ই পছন্দ করি না আমি।' চারপাশে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল এলিজার, ডক্টর রেনের ল্যাবোরেটরিতে রয়েছে সে।

'আমি জানি, কেন আপনি আমাকে পছন্দ করেন না,' ডক্টর বললেন। 'পোকামাকড় নিয়ে থাকি বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। কেন করবো বলুন? আমার তাতে কি লাভ?'

'অন্য কারোই বা কি লাভ?' এলিজার জিজ্ঞাসা। 'কারো বাড়া ভাতে ছাই দিইনি আমি। কারো ক্ষতি করিনি। আমার বাড়িতে শান্ত ভাবে থাকার চেষ্টা করছি আমি, কারো কোনো কিছুতেই বাগড়া দিইনি। তাহলে কেন? কেন আমাকে পাগল করে দিচ্ছে হতচ্ছাড়া কাকতাড়ুয়াটা!'

চোখ দেখেই বোঝা গেল আবার কেঁদে ফেলবে এলিজা।

সেটা ঠেকানোর জন্যেই তাড়াতাড়ি বললো কিশোর, 'মিস ওয়াগনার, যুক্তিতে আসুন। যে আপনাকে বিরক্ত করছে, সে ভালো করেই জানে আপনি কাকতাড়ুয়াকে ভয় পান। ক'জন লোক জানে একথা?'

সোনার একটা কানের দুলে আঙুল বোলালো এলিজা। ভাবলো। 'গোপন কথা নয় এটা। যে কেউ জানতে পারে। মিসেস রোজারিও জানে। আমাদের সঙ্গে সেদিন সে-ও গিয়েছিল। কাকতাড়ুয়াটাকে আমার ওপর ভেঙে পড়তে দেখেছে। মাকড়সাগুলো দেখেছে। তবে মিসেস রোজারিও কাকতাড়ুয়া সেজে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, একথা ভাবতেই পারি না আমি। কারণ আমাকে দারুণ ভালোবাসে ও। কখনও কষ্ট দেয়নি। আর ভয় দেখানোর ইচ্ছে থাকলেও পারবে না। কি করে পারবে? গত পাঁচ বছর ধরে হুইলচেয়ার থেকেই উঠতে পারে না। শুতে পর্যন্ত পারে না নিজে নিজে। ধরে তুলে তাকে শুইয়ে দিতে হয়।'

'নিউম্যানরা জানতো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারটা শুরু হওয়ার আগে?'

'হয়তো জানে। এবার বাড়ি ফেরার পর একরাতে মিসেস রোজারিওর সঙ্গে বসে টিভি দেখছিলাম। উইজারড অভ ওজ ছবিটা হচ্ছিলো। কাকতাড়ুয়া দেখেই চ্যানেল বদলে দিলাম। অথচ সত্যি সত্যি কাকতাড়ুয়া নয় ওটা, মানুষ। কাকতাড়ুয়ার অভিনয় করেছে রে বোলজার। ওই সময় ওখানে ছিলো নিউম্যানরা। মিসেস রোজারিওর সঙ্গে আলোচনা করেছি, এখনও কি কম ভয় পাই কাকতাড়ুয়াকে। নিউম্যানদেরকে পরে হয়তো আমার ছেলেবেলার গল্প বলেছে মিসেস রোজারিও, জানি না।'

'আমাকেও বলেছেন,' ডক্টর জানালেন। 'ছবিতেও কাকতাড়ুয়াকে ভয় পান দেখে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো তাঁর।'

'সেদিন স্টেবিনস কলিগও ছিলেন সেখানে,' এলিজা বললো। 'এখন মনে পড়ছে। মিসেস রোজারিওর সঙ্গে গল্প করতে প্রায়ই আসেন। আমার কাকতাড়ুয়া-ভীতির কথা হয়তো তিনিও জেনে গেছেন।'

'জ্যান্ত কাকতাড়ুয়াটাকে আপনি প্রথম দেখার আগেই কি এসব ঘটনা ঘটেছে?' জানতে চাইলো কিশোর।

'হ্যাঁ। বাড়ি ফিরেছি যে হপ্তায়, সে হপ্তায়ই। সবে তখন মনটাকে ঠিক করার চেষ্টা করছি। ইউরোপে একটা গোলমাল হয়েছিল।'

চুপ হয়ে গেল এলিজা। ভেঙে যাওয়া এনগেজমেন্টের কথা ভাবলো কিশোর। এলিজা কি ধরনের মহিলা ভেবে অবাক হলো। মুখের চারপাশে রেখা পড়েছে। তরুণী আর এখন কিছুতেই বলা চলে না তাকে। সর্বক্ষণ অসুখী।'

'টিভিতে ওই সিনেমা চলার কয়েকদিন পর,' আবার বললো এলিজা। 'এক বিকেলে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি। উপকূল ধরে চলেছিলাম। হঠাৎ দেখি ওটা গাড়ির পেছনের সীটে বসে আছে! আমাকে তাকাতে দেখেই খলখল করে হেসে উঠলো। গাড়িটা কনভারটিবল, ছাত নেই, উঠতে ওটার কোনো অসুবিধেই হয়নি। ঝটকা দিয়ে দুদিকে হাত ছড়ালো, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি...দেখি...আমার চুলে মাকড়সা কিলবিল করছে!' সেকথা কল্পনা করে শিউরে উঠলো এলিজা।

'পিঁপড়ে নয়, মাকড়সা, বুঝেছো! এখানকার পাহাড়ে অনেক আছে! কালো কালো, ইয়া বড় বড় একেকটা।'

'গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করলাম। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল ওটা। ছুটে এলো ব্রড আর তার বৌ। ততোক্ষণে চলে গেছে ওটা।'

'খাইছে!' সহানুভূতির সুরে বললো মুসা। 'অদ্ভুত ব্যাপার!'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে কাকতাড়ুয়াটা জানে, কি কি দেখে ভয় পান আপনি,' মনের ভাবনাগুলোই যেন প্রকাশ করলো কিশোর। 'আপনাদের বাড়ির যে কারো কাছ থেকে কথাটা জেনে থাকতে পারে সে। স্টেবিনস কলিগের কাছ থেকেও। আচ্ছা, মিস্টার কলিগের সম্পর্কে কিছু বলুন তো।'

শ্রাগ করলো এলিজা। 'বলার তেমন কিছু নেই। অনেক দিন ধরে মসবি মিউজিয়মের কিউরেটর হয়ে আছেন। মিস্টার মসবির মৃত্যুর পর থেকেই। বাস করেন মসবি হাউসে। এই-ই জানি, ব্যস, আর কিছু না।'

'তেমন কিছু জানেন না,' নোট নিতে নিতে বললো রবিন।

ডক্টরের দিকে কিশোর তাকাতেই মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমার দিকে চেয়ে লাভ নেই। কিউরেটর সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই আমার।'

ভুরু কুঁচকে বসে আছে এলিজা। ডক্টর থামতেই বললো, 'আগ্রহ জাগানোর মতো লোকও নন কলিগ। গ্রাহাম আর্ট ইনস্টিটিউটে কিছুদিন কাজ করেছেন, তারপর চলে এসেছেন মিস্টার মসবির ওখানে। মসবি হাউসেই থাকেন, দিনের বেলা যারা কাজ করে, তাদের দেখাশোনা করেন। মিউজিয়মের ছবি আর অন্যান্য জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখেন, সাজানো-গোছানো, দর্শক এলে তাদেরকে গ্যালারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। আসার আগে যোগাযোগ করে নিতে হয় সবাইকে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হয়, যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তাদের। কলিগ একা মানুষ, ক'দিক সামলাবেন? তাই এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ভালো চাকরি।'

'পরিবার আছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না। কখনও ওসব নিয়ে আলোচনা করতে শুনিনি তাঁকে।'

'নিঃসঙ্গ মানুষ, না? অবসর সময়ে কি করেন?'

'প্রায় কিছুই না। মিসেস রোজারিওর সঙ্গে এসে দাবা খেলেন। আর কিছু করতে দেখিনি তাঁকে।' উজ্জ্বল হলো এলিজার মুখ। 'মনে পড়েছে, আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসছেন। তারপর নিশ্চয়ই দাবা খেলবেন। আসবে নাকি? দেখা করতে পারো ইচ্ছে করলে। লাঞ্চটাও না হয় আমাদের ওখানেই সারলে?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'থ্যাংক ইউ। অবশ্যই দেখা করবো। আপনাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত, নিয়মিত দেখা করতে আসে, এরকম সবার সঙ্গেই কথা বলতে চাই আমরা। আমার বিশ্বাস, অতিপরিচিত কেউই আপনার মাথাব্যথার কারণ, সে-ই কাকতাড়ুয়া সেজে ভয় দেখাচ্ছে আপনাকে।'

আট

ওয়াগনার ম্যানশনের ডাইনিং রুম। টেবিলে লাঞ্চ দেয়া হয়েছে। লম্বা টেবিলের এক মাথায় বসে আছেন মিসেস রোজারিও। আরেক মাথায় এলিজা। মিসেস রোজারিওর ডানে বসেছেন স্টেবিনস কলিগ। কথা বলছেন অনর্গল, প্রায় পুরোটাই মসবি মিউজিয়ম সম্পর্কে।

'খুব দামী একটা ভারমিয়ার আছে আমাদের,' তিন গোয়েন্দার দিকে নজর ফেরালেন তিনি। গোল্ডরিম্‌ড চশমার ওপাশে চকচক করছে নীল চোখ। খাটো করে ছাঁটা চুল, বেশির ভাগই শাদা হয়ে গেছে। চামড়ার রঙে লালচে আভা। চামড়া এতো পাতলা, মুখের রগগুলোও বোঝা যায় কোন্‌দিক দিয়ে গেছে। 'এক অসাধারণ আঁকিয়ে ছিলো এই ভারমিয়ার! হাতে গোনা বড় যে কজন ওলন্দাজ আর্টিস্ট আছে, তাদের একজন। মিসেস রোজারিও তো সাংঘাতিক ভক্ত তার, তাই না মিসেস রোজারিও?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস রোজারিও।

'ভারমিয়ারের একটা কপি আছে মিসেস রোজারিওর কাছে,' কিউরেটর বললেন। 'ওটার নাম "উয়োম্যান উইথ আ রোজ", এঁকেছে একজন ছাত্র। ভারমিয়ারকে নিয়ে গবেষণা করতে চায় অনেকে। কি করে আঁকতো, বোঝার চেষ্টা করে। তাদের গবেষণায় বাধা দিই না আমরা। গ্যালারিতে এসে যদি এঁকে নিয়ে যেতে চায়, দিই। তবে তার জন্যে আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে রাখতে হয় ওদের। আর, আসল ছবিটার সমান করে আঁকতে দিই না। মাপ ছোট-বড় হলে অসুবিধে নেই, তবে সমান হওয়া চলবে না।'

'আমারটা আসলটার চেয়ে বড়,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'সমান হলে মুশকিল হয়ে যেতো। যারা চেনে না, তারা বলতেই পারবে না কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল।'

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে ওটা নামিয়ে রাখলেন মিসেস রোজারিও। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার ছবিটা দেখতে চাও?'

ওদের জবাবের অপেক্ষা করলেন না কলিগ। মিসেস রোজারিওর হুইলচেয়ারটা ঘুরিয়ে ঠেলে নিয়ে চললেন। ওদেরকে অনুসরণ করে হল পেরিয়ে ছোট একটা সিটিংরুমে চলে এলো তিন গোয়েন্দা আর এলিজা। ওটার জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনের লন দেখা যায়। একটা খোলা দরজা দিয়ে আরেকটা ঘর দেখা গেল। সিটিংরুমের লাগোয়া বেডরুম।

'ওটা আমার মায়ের ঘর,' এলিজা বললো। 'ঘরটা আমার খুব পছন্দ। শীতকালে দারুণ আরাম। আগুন জ্বেলে দিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ, ভালো,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'কিন্তু এলিজা, আর তো থাকতে পারবো না আমি এখানে। থাকা উচিতও না। সার্ভেন্টস উইঙে বাড়তি শোবার ঘর আছে। আমি ওখানেই বরং চলে যাবো। হাজার হোক, মনিবের ঘর। মনিব যখন নেই...'

'দূর, কি যে বলেন,' হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলো এলিজা। 'আপনি যাবেন কেন? থাকুন।'

ম্যানটেলের ওপরে ঝোলানো ছবিটা হাত তুলে দেখালেন মিসেস রোজারিও। 'ওই যে, ভারমিয়ারের কপি।'

নীরবে দেখতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। একজন তরুণীর প্রমাণ সাইজের একটা ছবি। নীল পোশাক পরা। মাথায় লেস লাগানো ক্যাপ। হাতে একটা হলুদ গোলাপ ফুল নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে।

'খুব সুন্দর, তাই না?' আরেকবার প্রশংসা করলেন কলিগ।

চেয়ার নিয়ে তাঁর দিকে ঘুরলেন মিসেস রোজারিও। 'আজ বিকেলে নিশ্চয় কেউ আসছে না মিউজিয়মে, না? এক কাজ করলে পারেন। ওদেরকে নিয়ে যেতে পারেন,' তিন গোয়েন্দার কথা বললেন তিনি। 'আসলটাই দেখুক। নিজে সঙ্গে থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো কতোজনকেই মিউজিয়ম দেখান। ওদেরকেও নাহয় একটু দেখালেন।'

'খুশি হয়েই দেখাবো,' কলিগ বললেন। 'কিন্তু আজ দাবা খেলার কথা ছিলো, ভুলে গেছেন?'

'দাবা পরেও খেলা যাবে।'

'বেশ। এই, তোমাদের দেখার ইচ্ছে আছে?'

'নিশ্চয়ই!' বলতে একটা মুহূর্ত দেরি করলো না কিশোর। 'আমার চাচা-চাচী একবার দেখতে এসেছিলেন এই যাদুঘর। তখন মিস্টার মসবি বেঁচে ছিলেন। এখনও এর কথা বলেন আমার চাচী। আর সহজে কোনো কিছুর প্রশংসা করেন না তিনি।'

এলিজার দিকে তাকালেন কলিগ। 'তুমি আসবে?'

'না। ধন্যবাদ। কয়েক লক্ষবার দেখেছি আমি ওটা।'

'তাহলে তোমরাই চলো,' ছেলেদের বললেন কলিগ। এলিজার রূঢ় আচরণে কিছু মনে করলেন না। 'মিসেস রোজারিও, আসছি। দেরি হবে না।'

ছেলেদেরকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেন কিউরেটর। নিয়ে চললেন জানালাহীন দুর্গের মতো বাড়িটার দিকে, যেটাতে সাজানো রয়েছে মসবিদের সংগ্রহগুলো।

'অনেক ব্যাংকের ভল্টও এই বাড়িটার মতো সুরক্ষিত নয়,' যেতে যেতে বললেন কলিগ।

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে ঘণ্টা বাজালেন। খুলে দিলো একজন প্রহরী। ঢুকলো সবাই। ঠিক ভেতরেই বর্গাকার একটা প্রবেশঘর। কয়েকটা ডিসপ্লে কেস পড়ে রয়েছে। আর রয়েছে একটা পুরনো পর্দা, তাতে আঁকা রয়েছে–এক তরুণী ফুলের বাগানে বসে বই পড়ছে।

'দামী দামী শিল্পকর্ম রয়েছে এ-বাড়িতে,' কলিগ বললেন। 'ওগুলো যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে না নিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছে বাড়িটা। দেখছোই তো, জানালা নেই। অ্যালার্ম সিসটেমও এই বাড়ির জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। দিনের বেলা লোকে দেখতে আসে, সে-জন্যেই শুধু তখন পাহারার ব্যবস্থা রেখেছি। আলোকিত করার ব্যবস্থাও হয়েছে অনেক

ভেবেচিন্তে, যত্ন করে। যাতে দিনের আলোর মতো আলো হয়, অথচ ছায়া না পড়ে, বেশি গরম হয়ে না যায়। হলে নষ্ট হয়ে যাবে ছবি, রোদ লাগলে যেমন হয়। তাপমাত্রা আর বাতাসের আর্দ্রতা এখানে চব্বিশ ঘন্টাই একরকম থাকে, হেরফের হয় না। যে কোনো কিউরেটরের স্বপ্ন বলতে পারো এটাকে।'

আজব বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন কলিগ। নিচতলায় কিছু ঘর আছে, ইউরোপের বিভিন্ন দুর্গ থেকে খুলে আনা কাঠ দিয়ে প্যানেলিং করা। অনেক বাক্স রয়েছে সেসব ঘরে। তাতে ভরা রয়েছে রূপোর অনেক পুরনো তৈজসপত্র, দুর্লভ পুরনো কাঁচের গেলাস, আর অদ্ভুত মোড়কে বাঁধানো বই–আলো পড়লে জ্বলজ্বল করে জ্বলে কভারগুলো।

'ছবিগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ওপরতলায়,' ওপর দিকে আঙুল তুলে বললেন কলিগ। একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলেন তিন গোয়েন্দাকে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাত করে তৈরি একটা দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে সিঁড়িটা। দুটো পেঁচের মধ্যে চওড়া দুটো প্ল্যাটফর্ম মতো রয়েছে। ওঠার সময় ইচ্ছে করলে ওখানে দাঁড়ানো যায়, অন্যদের ওঠার ব্যাঘাত না করে। একটা প্ল্যাটফর্মে জোরে জোরে টিকটিক করছে একটা গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ি।

ওপরতলার হলঘরে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে মার্বেল পাথরের টপ দেয়া টেবিল। প্রতিটি টেবিলের ওপর নানারকম সুদৃশ জিনিস সাজানো।

'দেখো এগুলো,' একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন কলিগ। টেবিলের ওপর রাখা বাতিদানের মতো একটা জিনিস। তাতে রাখা বিশেষ ভাবে তৈরি স্ফটিকের প্রিজম।

রূপোর বিশাল বাতিদানটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা। সিঁড়িতে ঢং ঢং করে সময় ঘোষণা করলো দাদাঘড়ি। কেঁপে উঠলো বাতিদানে রাখা প্রিজম।

'খুব মজার ব্যাপার, না?' কলিগ বললেন। 'প্রিজমগুলো এমন করে রাখা হয়েছে, যাতে ঘড়ির শব্দে কেঁপে ওঠে। এটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এই বাতিদানটা নতুন সংগ্রহ। গত বছর কিনেছি। বোর্ড অভ ডিরেক্টর যাঁরা আছেন, অবশ্যই তাঁদের অনুমতি নিয়ে।'

এগিয়ে চললেন কিউরেটর। পিছে পিছে তিন গোয়েন্দা। আরেকটা ঘরে এসে ঢুকলো। হালকা রঙের কাঠে তৈরি ছোট একটা চেয়ার রয়েছে ঘরটায়। একটা নিখুঁত ভাবে খোদাই করা চেয়ার, আর একটা মাত্র ছবি।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেললো মুসা।

মিসেস রোজারিওর বসার ঘরে যে ছবিটা দেখে এসেছে, হুবহু তারই মতো দেখতে ছবিটা।

'একই রকম দেখতে,' বিড়বিড় করলো রবিন। 'অথচ দুটো আলাদা! দামেও অনেক তফাৎ!' হলুদ গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখছে সে।

'দেখতে একই রকম হলেও,' কিউরেটর বললেন। 'দুটো দুই জিনিস। একটাতে রয়েছে ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ছোঁয়া, যা হাজার চেষ্টা করেও নকলবাজরা

আনতে পারবে না। যারা ছবি বোঝে, তাদের চোখে ধরা পড়বেই। আসলে, ভারমিয়ার ভারমিয়ারই, অন্যে কি আর সেটা পারবে?'

কয়েক মিনিট নীরবে ছবিটা দেখলো ছেলেরা। তারপর রবিন বললো, 'দেখতে তো একেবারে নতুন লাগছে। ভারমিয়ার কি ইদানীংকার শিল্পী?'

'তিনশো বছর আগের,' কলিগ বললেন। 'এই ছবিটা আঁকা হয়েছে ষোল শো ষাটের দিকে। মিস্টার মসবি যখন এটা কিনেছিলেন, কয়েকবার করে বার্নিশ লাগানো হয়ে গেছে তখন এর ওপরে। প্রায় বাদামী করে ফেলা হয়েছিল। আমি ওসব বার্নিশ সরিয়ে-টরিয়ে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে এনেছি।'

'কাজটা কি যথেষ্ট কঠিন?' মুসা জানতে চাইলো।

'কঠিন মানে? ছবি পরিষ্কার করাও আরেকটা শিল্প। বাহবা পাওয়ার যোগ্য। পাশের ঘরে কয়েকটা রেমব্র্যা আছে, কোনোটা হলদেটে, কোনোটা বাদামী হয়ে গিয়েছিল। কালো কালো ছায়ার মতো দাগ পড়ে গিয়েছিল অনেকগুলোতে। রেমব্র্যা অবশ্যই ওভাবে আঁকেনি। ওসব ছবি আমি আবার ঠিক করেছি, দাগটাগ সব তুলে ফেলে নতুন করে ফেলেছি। এসো। দেখাই।'

হলঘর ধরে যাওয়ার সময় বাতাস শুঁকলো কিশোর। 'তেল তেল গন্ধ। কোনো কেমিক্যালের? আপনি কাজ করেছেন ওসব দিয়ে, না?'

'গন্ধ ওরকম পাবেই। রঙ, সলভেন্ট, সব কিছু থেকেই তেল তেল গন্ধ বেরোয়। আমার ওয়ার্কশপ তেতলায়। সেখানে দর্শকদের ঢোকা বারণ। এমনকি তোমাদের মতো স্পেশাল মেহমানদের জন্যেও। আমি থাকিও তিনতলাতেই।'

চারপাশে তাকালো রবিন। 'কেমন যেন একা একা লাগে এখানে। বড় বেশি নীরব।'

'মাঝে মাঝে আমারও খারাপ লাগে,' স্বীকার করলেন কিউরেটর। 'আসলেই, বড় বেশি নীরব, নিঃসঙ্গ। সে-জন্যেই সান্তা মনিকায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট রেখেছি। এখানে ভালো না লাগলে চলে যাই ওখানে। তবে ওখানে গিয়েও লোকজনের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করি না। একা থাকতেই ভালো লাগে আমার।'

ভারমিয়ারের ছবি যে ঘরে রয়েছে, তার পাশের গ্যালারিতে ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন কলিগ। রেমব্র্যাগুলো দেখালেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর এক বৃদ্ধার ছবি।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরতে থাকলো ওরা। অনেক ছবি দেখলো। দামী দামী সব শিল্পী, রুবেন, ভ্যান ডাইকের মতো ওস্তাদেরা ছাড়াও রয়েছে অখ্যাত কিন্তু অসাধারণ দক্ষ অনেকে।

আধ ঘণ্টা পর কলিগ ঘোষণা করলেন, দেখা শেষ হয়েছে। ছেলেদেরকে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন নিচতলায়। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রহরী নেই এখন। কাজেই ভারি দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি। একটা চাবি দিয়ে অ্যালার্ম সিসটেমটা চালু করে দিলেন। তারপর তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে রওনা হলেন আবার ওয়াগনার ম্যানশনের দিকে।

অর্ধেক পথ পেরিয়েছে ওরা, হঠাৎ শুরু হলো তীক্ষ্ণ চিৎকার! গরমের বিকেলে শান্ত নীরবতার চাদর ফুঁড়ে বেরোচ্ছে যেন সেই চিৎকার। লম্বিত, কাঁপা, কাঁপা!

বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে!

'খাইছে! আবার!' চেঁচিয়ে উঠে ছুটতে আরম্ভ করলো মুসা।

নয়

লনের মাঝখান দিয়ে ছুটে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলো রবিন আর মুসা।

'এলিজা,' কিশোরকে বললেন কলিগ। অন্য দু'জনের চেয়ে ধীরে চলেছেন তাঁরা।

পুলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিজা ওয়াগনার। পরনে বেদিং স্যুট। পা খালি। বড় একটা তোয়ালে আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে চলেছে।

'এলিজা, থামো, থামো!' চিৎকার করে বললেন মিসেস রোজারিও।

তাকিয়ে আছে কিশোর। কেন ওরকম করছে মেয়েটা বুঝতে পারছে না, কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ চেঁচিয়েই চলেছে এলিজা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এলো নরিটা। এলিজার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করলো।

চিৎকার থামিয়ে কান্না আরম্ভ করলো এলিজা। তাকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বললো নরিটা, 'শান্ত হোন, মিস ওয়াগনার, শান্ত হোন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এলিজাকে ধরে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল সে। তার মোলায়েম কণ্ঠ এখনও শুনতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। বোঝা যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে দু'জনে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন কলিগ।

মিসেস রোজারিও জবাব দেয়ার আগেই লন থেকে উঠে আসা ইঁটের সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলেন ডক্টর রেন। 'কি হয়েছে? চিৎকার শুনলাম?'

চত্বরে বেরিয়ে এলো ব্রড নিউম্যান। শান্ত রয়েছে। উদ্বেগের কোনো ছাপ নেই চেহারায়। বললো, 'জানোয়ারটাকে ফেলে দিয়ে এলাম।'

ভুরু কোঁচকালেন ডক্টর। 'জানোয়ার?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস রোজারিও। 'সাঁতার কাটতে নেমেছিলো এলিজা। পানি থেকে উঠে দেখে মস্ত একটা রোমশ মাকড়সা এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। চোখের পলকে ওটা তার পায়ের ওপর উঠে গেল। তারপর আর না চেঁচিয়ে কি পারে?'

'আমার মনে হয় ওগুলোকেই টারানটুলা মাকড়সা বলে,' ব্রড বললো। 'একটা তোয়ালে দিয়ে চেপে ধরলাম ওটাকে। ময়লা ফেলার পিপেতে ফেলে দিয়ে এসেছি, মেরে। মাকড়সা ধরেছি, ওই তোয়ালে আর কেউ ব্যবহার করবে না, তাই ওটাও ফেলে দিয়েছি।'

'ভালো করেছো,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'ও আর কে ব্যবহার করে?'

'টারানটুলা!' বিড়বিড় করলেন রেন। 'চিৎকার তো করবেই এলিজা। আমি যে আমি, পোকামাকড় ঘাঁটি, মাকড়সা পছন্দ করি, সেই আমিও খালি পায়ের ওপর

টারানটুলা দেখলে আঁতকে উঠবো। কামড়ে যে দেয়নি এই-ই বেশি!'

'এলিজার নিশ্চয় ধারণা,' কলিগ বললেন। 'এটাও পরিকল্পনারই একটা অংশ। সমস্ত অঘটনকেই পরিকল্পনার অংশ মনে করে মেয়েটা।'

উদ্বিগ্ন মনে হলো মিসেস রোজারিওকে। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা। এখানে এসে খালি বসে থাকে, কিছু করে না, ভালো আর কতো লাগবে। ওরকমই হয়। আবার ওর ইউরোপে ফিরে যাওয়া উচিত। অন্তত এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত কিছুদিনের জন্যে। আজ একটু শান্ত হোক, দেখি, বেভারলি হিলেই পাঠিয়ে দেবো। পুরনো বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেবে, বাজার-সদায় করবে, আর অবশ্যই দেখা করবে ডক্টর ভিগারের সঙ্গে। ফোন করে আগেই বলে দেবো ডক্টরকে। যা যা হয়েছে সবই জানা থাকা দরকার তাঁর, চিকিৎসার সুবিধে হবে।'

'তা হবে,' একমত হলেন কলিগ। 'অবশ্য আপনি না বললেও এলিজা বলবে। পায়ের ওপর টারানটুলা উঠেছিলো, আর একথা বলবে না সে, এটা হতেই পারে না।'

এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন কিউরেটর, কিশোরের মনে হলো, এলিজার কথা যেন বিশ্বাস করেন না তিনি। সে বললো, 'আপনি কি ভাবছেন এটাও মিস ওয়াগনারের একটা কল্পনা? তা কি করে হয়? নিউম্যান নিজের হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে ওটাকে মেরে ফেলে রেখে এসেছে।'

'না, কল্পনা অবশ্যই বলছি না,' তাড়াতাড়ি বললেন কলিগ। 'তবে পরিকল্পনার অংশও নয় এটা। এটা জাস্ট একটা কাকতালীয় ঘটনা।'

'হুঁম!'

এবার কলিগের তাকানোর পালা। 'কি ব্যাপার? তোমার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে এলিজার কথায় বিশ্বাস করো তুমি? তার কাহিনী সত্য বলে মনে করো নাকি?'

'হতেও পারে সত্য।' হাতঘড়ি দেখলো কিশোর। 'বাব্বাহ্, তিনটে বেজে গেছে। আমাদের যাওয়া দরকার।'

'আবার এসো,' আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন মিসেস রোজারিও।

'থ্যাংক ইউ। লাঞ্চের জন্যে মিসেস ওয়াগনারকেও অনেক ধন্যবাদ, তাঁকে জানাবেন, প্লীজ।'

'আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো,' কথা দিলেন রেন। তারপর ওরা যখন খানিকটা সরে এলো হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

'বিচিত্র চরিত্র সব!' ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বললো কিশোর। 'সবাই যেন এক বাড়ির এক ঘরের লোক, শুধু এলিজা ওয়াগনার ছাড়া, যেন সে-ই বাইরে থেকে এসেছে। সবাই তার সাথে এমন আচরণ করছে, যেন সে একটা দুষ্টু মেয়ে, এখানে জোর করে এসে ঢুকে পড়েছে। কেউ চায় না তাকে এখানে। তার সমস্ত কথাকে কল্পনা করে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। সত্যি সত্যি যখন কাকতাড়ুয়া কিংবা টারানটুলা দেখছে, তখনও বোঝাতে চাইছেঃ না না, কিছু দেখনি!'

'দোষটা হয়তো ওরই,' মুসা বললো। 'আমরা আসার পরই ক'বার পাগলামি

করলো?’

‘তা করেছে। মাথা কিছুটা গরমই তার।’

‘কি মনে হয়?’ রবিন জিজ্ঞেস করলো, ‘মাকড়সাটা কি পিঁপড়ের মতোই এনে ফেলে রাখা হয়েছিলো এলিজাকে ভয় দেখানোর জন্যে?’

‘হয়তো,’ কাঁধ ঝাঁকালো কিশোর। ‘টারানটুলা বা পিঁপড়ে এই অঞ্চলে আছে, ঠিক, তবে যেভাবে এসে হাজির হচ্ছে এলিজার সামনে, সেটাই সন্দেহজনক।’

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতলো সে। বাঁয়ে একটা খসখস শব্দ শুনেছে। ‘খেতের মধ্যে কেউ আছে!’ ফিসফিস করে বললো কিশোর।

‘চলো, দেখি,’ বলেই খেতের দিকে ছুটতে শুরু করলো মুসা।

খসখস শব্দটা দুপদাপে পরিণত হলো। খেতের গাছ ভেঙে ছুটে গেল কেউ। তার পেছনে ছুটলো ছেলেরা। কিন্তু অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই একটা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নিলো, ওয়াগনার ম্যানশনের নিচে। আরও জোরে ছুটলো ওরা। বেরিয়ে এলো খেতের বাইরে। দেখলো, অতি সাধারণ একটা ট্রাক গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে চ্যাপারাল ক্যানিয়নের দিকে।

‘দূউর!’ হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা।

লাইসেন্স নম্বরটা পড়ার চেষ্টা করছে রবিন। কিন্তু এতো জোরে ছুটেছে ট্রাকটা, পেছনে ধুলোর ঝড় উঠেছে। নম্বর পড়া গেল না। ‘জটিল হচ্ছে রহস্য!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে গেছে তার, জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা, বোধহয় আনন্দে। ‘আগের ধাঁধাগুলোর সঙ্গে আরেক মাত্রা যোগ হলো। আমি প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, ওয়াগনার ম্যানশনেরই কেউ এইসব রহস্যের হোতা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাইরের কেউও আছে। এখানকার ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী।’

‘কাকতাড়ুয়াকেই তাড়া করলাম নাকি?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘জানি না। তবে লোকটার আচরণ বেশ সন্দেহজনক। আমাদের দেখে দৌড় দিলো কেন?’

‘এমনিই হয়তো এসেছিলো,’ মুসা বললো। ‘এরকম একটা জায়গায় খেত দেখে কৌতূহল হওয়ায় ঢুকেছিলো। আমাদের দেখে ঘাবড়ে গেছে।’

‘মনে হয় না।’

ওয়াগনারদের সীমানার পাশে পুরনো কাঠের বাড়িটার দিকে তাকালো কিশোর। সামনের উঠনে লতা আর ঝোপের জঙ্গল হয়ে গেছে। ড্রাইভওয়েতে কাঠের খুঁটিতে লাগানো রয়েছে একটা বোর্ড, তাতে লেখা রয়েছে ‘ফর সেল’, অর্থাৎ বিক্রি হইবে নোটিশ, রঙ মলিন হয়ে এসেছে।

ট্রাকটা নিশ্চয় ওখানে পার্ক করা ছিলো,’ বাড়িটার ড্রাইভওয়ে দেখিয়ে বললো কিশোর। ‘নিচের রাস্তাটা বেশি সরু, একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখলে গাড়ি চলাচলের অসুবিধে হয়। কাজেই ওখানে রাখেনি ট্রাকটা।’

খেতের বেড়া ডিঙিয়ে বাড়িটার দিকে রওনা হলো কিশোর। অন্য দু’জন অনুসরণ করলো তাকে।

যা আন্দাজ করেছিলো কিশোর। ঠিকই, ড্রাইভওয়েতে পড়ে রয়েছে পোড়া

তেল। মুখ তুলে ওয়াগনার ম্যানশনের দিকে তাকালো সে। এখানে থাকলে ইউক্যালিপটাস গাছগুলো দৃষ্টিপথে পুরোপুরি বাধার সৃষ্টি করে না। আংশিক দেখা যায় ম্যানশনটা। তবে, গাছগুলো না দিলেও গোলাঘরটা বাধা দেয় এখন, তা-ও অবশ্য আংশিক।

'ওয়াগনার ম্যানশনের ওপর চোখ রাখতে হলে,' আনমনে বললো সে। 'হয় আরও কাছে যেতে হবে, আমাদের অচেনা বন্ধুটি যেমন গেছে, নয়তো আরও ওপরে উঠতে হবে।'

পুরনো বাড়িটার ওপরতলায় খোলা জানালা দেখিয়ে রবিন বললো, 'ওখান থেকে?'

'হ্যাঁ।'

ঘরে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগলো ওরা। পেয়েও গেল। দেখলো, পেছনের দরজায় তালা নেই। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে পড়লো তিনজনেই। নিচ তলার শূন্য ঘরগুলোতে আলো কম। দেখার কিছু নেই। সিঁড়িতে পা রাখতেই ক্যাঁচম্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানালো ওটা, কিন্তু পরোয়া করলো না ওরা। দোতলায় উঠতে শুরু করলো।

হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল আচমকা। চিঁকচিঁক করে ছোটাছুটি শুরু করলো কি যেন। ভীষণ চমকে গেল মুসা। ঝট করে মাথা ঘুরে গেল শব্দ যেদিক থেকে এসেছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঢিল করলো শরীর। 'ওহ্, ইঁদুর!' তবে স্নায়ু শান্ত হলো না তার, ভূত ভেবেছিলো প্রথমে। পুরনো সিঁড়ি ভেঙে পড়ার ভয় না করে দুড়দাড় করে উঠে গেল ওপরে। যেন ওই শব্দতেই ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইলো বাড়িতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু থেকে থাকে, তাদের।

দোতলায় পেছনের একটা ঘরে বড় চওড়া জানালা দেখা গেল, কাঁচ নেই।

'এখান থেকে খুব ভালোমতোই দেখা যায় ওয়াগনার ম্যানশন,' জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মুসা বললো। 'পেছনের জানালা, পাশের কয়েকটা জানালা, লন আর চত্বরের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। এবং এই জিনিসটাই কেউ একজন দেখছিলো।' মেঝেতে কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো দেখালো সে।

'রহস্যময় একজন দর্শক,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'টারানটুলা দেখে এলিজা ওয়াগনারকে কি ভয় পেতে দেখেছে সে? তারপর ফিরে গেছে ওয়াগনার ম্যানশনে? নাকি টারানটুলাটা যখন এলিজাকে ভয় দেখাচ্ছে তখনই ম্যানশনে ছিলো সে! জানার কোনো উপায় দেখছি না, তাই মনে হচ্ছে না?'

কথাটা দুঃখের সঙ্গে বললো সে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে দুঃখের লেশমাত্র নেই তার, বরং একধরনের উল্লাস, সেই উল্লাস যা প্রকাশ পায় যখন কোনো জটিল ধাঁধা চ্যালেঞ্জ করে তাকে। 'এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজন লোক সন্দেহের তালিকায় পড়ে, যাদের পক্ষে এলিজাকে ভয় দেখানো সম্ভব।'

মাঝে মাঝে বেশ ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে কিশোর, সেটা ভালো লাগে না মুসার। বললো, 'সরাসরি কথা বলতে পারো না? যতো যা-ই বলো, ডক্টর রেনকে সন্দেহ করা কিন্তু ঠিক হবে না। ওই ভদ্রলোক এসবে জড়িত নেই, আমি শিওর। তাছাড়া উনি আমাদের মক্কেল।'

'হ্যাঁ, তিনি আমাদের কাজে লাগিয়েছেন বটে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' স্বীকার করলো কিশোর। 'কিন্তু মক্কেলরাও অনেক সময় অপরাধের হোতা হয়, এতো সব গোয়েন্দা গল্প পড়ে আশা করি এতোদিনে তা নিশ্চয়ই জেনেছো। তাঁকে কেন সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবো, বলো? তাঁর সম্পর্কে এমন কি জানি আমরা? শুধু তিনি নিজে যা যা বলেছেন আমাদের। আসলেই কি তিনি এনটোমোলজিস্ট? পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা করেন? নাকি ওয়াগনার এস্টেটে আসার অন্য উদ্দেশ্য আছে তাঁর?'

'আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কি কারণ?'

'তা এখনও জানি না।' আরেকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো, 'এলিজাকে কেন জ্বালাচ্ছে কেউ? কাউকে কি হুমকি দিয়েছে, ক্ষতি করবে বলেছে? আহত করেছে কাউকে কোনোভাবে?'

'যাদেরকে সন্দেহ করছি তাদের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। মিসেস রোজারিও কাকতাড়ুয়া সাজতে পারবেন না, কারণ তিনি হাঁটতেই পারেন না। তবে ব্রড নিউম্যান আর তার স্ত্রীর জন্যে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবো আমরা। মিস্টার কলিগের ব্যাপারেও। দেখে অবশ্য মনে হয় না, পোকামাকড় চুরি করায় হাত আছে তাঁর, তবে বলা যায় না কিছু। শুধু চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করা বোকামি। ডক্টরের কথাই ধরা যাক। খেত করেছেন, খেতের বেড়ায় কাকতাড়ুয়া দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন পাহারা দেয়ানোর নাম করে। তাঁর গবেষণাগারের পিঁপড়েই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এলিজার বিছানায়। হতে পারে, আমাদেরকে যা বলেছেন তিনি তারচেয়ে অনেক বেশি জানেন। এমনও হতে পারে রেনকে দোষী করার জন্যেই অন্য কেউ করেছে কাজটা। পিঁপড়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ছেড়েছে।

'সব কিছুরই একটা উদ্দেশ্য আছে এখানে, যা যা ঘটেছে। মোটিভ। সেই মোটিভটাই জানতে হবে আমাদের। আর তা জানতে হলে লোকের সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হবে। কাল সকাল থেকেই তদন্ত শুরু করবো আমরা।'

দশ

সঙ্গে করে আনা নোটবুকে লিখে নিতে লাগলো মুসা। আগে হলে এই কাজটা করতে আসতো রবিন। কিন্তু সে লাইব্রেরির চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার পর কিশোর ঠিক করেছে, কারও ওপর বিশেষ একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাখবে না সব সময়। তাতে অনেক অসুবিধে। সবাইকে সব কাজ করতে হবে, জানতে হবে। নইলে একজন কোনো কারণে কাজ করতে না পারলে বাকি সব আটকে যেতে পারে। এই ঝুঁকি নেয়া ঠিক না। আর সব সময় পড়া-শোনার কাজটা যে রবিনকেই করতে হবে, এর কোনো মানে নেই। ওকে আজকাল সব সময় পাওয়া যায় না।

মুসা লিখছে, ইউ সি এল এ থেকে ব্যাচেলর'স ডিগ্রি নিয়েছেন ডক্টর হেনরি রেনহার্ড। স্ট্যানফোর্ড থেকে মাস্টার ডিগ্রি। তারপর এনটোমোলজিতে ডক্টরেট করার জন্যে ফিরে এসেছেন আবার ইউ সি এল এ-তে। তিন বছর আগে পানামায়

গিয়েছিলেন পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা করতে। ডিগ্রি আর কোথায় কোথায় গবেষণার কাজে গিয়েছেন সেসব ছাড়াও বইয়ের জ্যাকেটে লেখা রয়েছে তিনি অবিবাহিত। ইউ সি এল এ-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন কিছুদিন।

বইটা রেফারেন্স ডেস্কে ফেরত নিয়ে এলো মুসা।

'যা জানার জেনেছো?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো তাকে।

'নিশ্চয়ই,' জোর করে মিথ্যে কথাটা বললো মুসা।

'তা জানবেই। একবার ডক্টর রেনহার্ডের কাছে কিছুদিন ক্লাস করেছিলাম। পিঁপড়ে সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, তখনই বুঝেছি। কতো কি যে জানেন! তার কাছে ক্লাস করলে পিঁপড়ের ব্যাপারে জানার আর বোধহয় বাকি থাকে না কিছু। পোকামানব যে বলে ওঁকে, ভুল বলে না।'

'কে বলে? তাঁর ছাত্রেরা বুঝি?'

হেসে উঠলো মেয়েটা। তারপর কি মনে হতে সরাসরি তাকালো মুসার দিকে। 'তুমি তাঁর কিছু হও নাকি?'

'নাহ্! দিন কয়েক আগে সান্তা মনিকা পর্বতের এক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। গবেষণার কাজে ব্যস্ত। ঠিকই বলে ওরা, পোকামানবই।'.

'ঠিক। লোকের সঙ্গে মেশেনও না তেমন একটা, পোকামাকড়ের সঙ্গে যতোটা মেশেন। তোমাদের সাথে যে কথা বলেছেন, এটাই অবাক লাগছে আমার।'

'তাঁর কাজ সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। খুব ইনটারেস্টিং মনে হয়েছে আমার কাছে। আগামী গ্রীষ্মে পিঁপড়ে নিয়ে একটা প্রোজেক্ট করার কথা আছে আমার। সে-জন্যেই সৈনিক পিঁপড়ে নিয়ে পড়াশোনা করছি। তুমি জানো, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই সৈনিক পিঁপড়ে আছে?'

'জানি। ডক্টর রেনের জন্যে খুব সুবিধে হয়েছে। পানামায় দৌড়াতে হয় না আর।'

চুপ করে রইলো মুসা। মেয়েটা আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বললো না। বইটা ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে শেলফে রেখে দিলো। আবার নোটবুক পড়ায় মন দিলো, যেটা পড়ছিলো এতোক্ষণ।

রোদে বেরিয়ে এলো মুসা। পকেটে নোটবুক। অভিনয় ভালোই করে এসেছে, সে-জন্যে খুশি। আবার একই সঙ্গে নিরাশও হয়েছে, কারণ ডক্টর রেনের ব্যাপারে নতুন কিছুই জানতে পারেনি। শুধু নিশ্চিত হতে পেরেছে লোকটা আসলই, নকল-টকল নয়। তিনি ইউ সি এল এ-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন, এটা ঠিক। সৈনিক পিঁপড়ের ওপর দুটো বইও লিখেছেন। জ্যাকেটের ছবিই প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি আসল লোক।

মুসা যখন এসব কথা ভাবছে, কিশোর তখন বেভারলি হিল-এর ডোহেনি ড্রাইভ থেকে দ্রুত নেমে আসছে। সেদিন সকালে এলিজা ওয়াগনারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে, নতুন লোক রাখার দরকার হলে কোন্ এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির সাহায্য নেন মিসেস রোজারিও। 'সম্ভবত ম্যাকমিলান কোম্পানি,' জবাব দিয়েছে এলিজা। 'খুব বিশ্বস্ত। আমার মা পছন্দ করতো ওদের। মিসেস রোজারিওও

হয়তো ওদেরকেই ফোন করে, লোকের দরকার হলে। জিজ্ঞেস করলো?'

'না না, প্লীজ,' অনুরোধ করেছে কিশোর। 'আমার তদন্তের ব্যাপারে কোনো কথাই তাঁকে বলবেন না।'

তারপর তার সবচেয়ে ভালো পোশাকটা পরে বেরিয়ে পড়েছে সে। বাসে করে চলে এসেছে বেভারলি হিলে।

ডোহেনির ছোটো একটা বিজনেস বিল্ডিঙের তিনতলায় চমৎকার আসবাবপত্রে সাজানো দুটো ঘর নিয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানির অফিস। বাইরের ঘরটায় বসা এক মহিলা, নীলচে-শাদা চুল আর টকটকে লাল চামড়া। কিশোরকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো?'

'আমার নাম কিশোর পাশা। কাজ খুঁজছি, আর...'

'কিন্তু...'

'আমি জানি আমার বয়েস কম,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'কিন্তু বুদ্ধি-টুদ্ধি ভালোই আছে আমার, অন্তত আমি তাই মনে করি। আর খুব পরিশ্রম করতে পারি। যতো বড় বাড়িই হোক, ঠিক সামলাতে পারবো। জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখতে পারবো, কিছু কিছু জিনিস মেরামতও করতে পারবো। কুকুর থাকলে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবো...'

হাসলো মহিলা। 'বাহ্, তাই নাকি! তোমার বয়সী একটা ছেলের এতগুলো গুণ থাকাটা খুবই ভালো। কিন্তু বড় বাড়ির লোকেরা বয়স্ক চাকর খোঁজে। খবরের কাগজে গিয়ে চেষ্টা করে দেখ না কেন? কিংবা মার্কেটগুলোতে গিয়েও খোঁজ নিতে পারো। মাঝে মাঝেই বক্স বয় চায় ওরা।'

চোখে মুখে হতাশা ফুটিয়ে তুললো কিশোর। 'আরও ভালো কাজ আশা করেছিলাম আমি। নিউম্যান আপনার কথা বলে বললো, 'আপনি নাকি জুটিয়ে দিতে পারবেন।'

'নিউম্যান?'

'ওই যে, ওয়াগনার এস্টেটে কাজ করে।'

চেয়ার ঘুরিয়ে বসলো মহিলা। ফাইলিং কেবিনেটের ড্রয়ার খুলে একটা ফোল্ডার বের করলো। পাতা উল্টে একজায়গায় থেমে হাসলো। 'হ্যাঁ, এই যে, নিউম্যান। লর্ড হ্যারিগানের লোক। হ্যাঁ, ব্রড আর তার স্ত্রীকে আমরাই কাজ দিয়েছি ওয়াগনারদের ওখানে। মিসেস রোজারিওর কাছে। ভালো লোক।'

'রেফারেন্স নিয়ে এসেছি আমি,' কিশোর বললো। 'নিউম্যান বললো আপনারা নাকি রেফারেন্স চান।'

'হ্যাঁ, চাই। বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে না পারলে এই ব্যবসায় বেশিদিন টিকতে পারতাম না। এই নিউম্যানের ব্যাপারটাই ধরো। সব রকম জেনে-শুনে তারপর কাজ দিয়েছি। এমনকি লণ্ডনে তার আগের মালিকের ওখানেও টেলিগ্রাম করেছিলাম। লর্ড হ্যারিগান যখন জবাব পাঠালেন, ব্রড নিউম্যান আর তার স্ত্রী খুব ভালো বাবুর্চি, তখনই শুধু ওয়াগনারদের ওখানে চাকরি দিলাম।

'তোমার বেলায় অবশ্য রেফারেন্স দিয়েও লাভ হবে না। আসলে, এই বয়েসী ছেলেদের চাকরি আমরা দিই না। সে-রকম ব্যবস্থা নেই।'

'তাই?'

'আমার অবাকই লাগছে, নিউম্যান তোমাকে এখানে আসতে বললো কিভাবে? ও তো জানে।'

'আসলে, ওভাবে বলেনি। যখন শুনলাম তাকে আপনারাই চাকরি দিয়েছেন, আমি ভাবলাম, যাই চেষ্টা করে দেখি।'

'তাই বলো। কয়েক বছর পর এসে দেখা কোরো আমাদের সঙ্গে। তখন ভালো কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পারবো আশা করি।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, খুব যেন নিরাশ হয়েছে এমন ভঙ্গি করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর। নিউম্যানের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। একজন ইংরেজ লর্ডের রেফারেন্স নিয়ে যখন এসেছে, লোকটা খারাপ হতে পারে না। এরকম একজন লোক কাকতাড়ুয়া সেজে লোকের বিছানায় পিঁপড়ে ছেড়ে দেবে, এটা আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

পশ্চিমে যাওয়ার বাসে চড়ে কিশোর যখন রকি বীচে ফিরে চলেছে, রবিন তখন আরও পুবে ব্যস্ত। রওনা দিয়েছিলো একই সাথে, পথে কিশোর নেমে যায়, সে চলে আসে গ্র্যাহাম আর্ট ইনস্টিটিউটের বিশাল বর্গাকার বাড়িটার কাছে। শিল্পকলা, ছবি আঁকা এসব শেখানো হয় এখানে। বেশ কিছু বড় বড় শিল্পী পাস করে বেরিয়েছে এখান থেকে। সামনের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রবিন ভারি ব্রোঞ্জের তৈরি দরজাটা ঠেলে ঢুকেছে ভেতরে।

লম্বা-চওড়া একটা হল ঘর। দু'পাশেই অনেক দরজা। গন্ধটা মসবি হাউজের কথা মনে করিয়ে দিলো তাকে। তেল রঙের গন্ধ।

'কাকে খুঁজছো?' নীল জিনসের প্যান্ট পরা এক তরুণ জিজ্ঞেস করলো। পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়েছে, হাতে ছোট একটা মই।

'আমি··· আমার খালাতো ভাইকে খুঁজছি,' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। ধমক লাগালো নিজেকে, মনে মনে। কিশোর হলে তোতলাতো না, কিংবা দ্বিধা করতো না। এমন ভাবে বলতো যেন সত্যি কথাই বলছে।

লম্বা করে দম নিলো সে। কাঁধ ছড়িয়ে দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলো। 'আমার খালাতো ভাই এখানে কাজ শিখেছিলো। তার ঠিকানা জানি না, এখন কোথায় থাকে, জানার জন্যেই ইস্কুলে চলে এলাম ঠিকানা জোগাড় করতে। ভাবলাম নিশ্চয় এখানে লেখা আছে।' হ্যাঁ, হয়েছে! নিজের পিঠ চাপড়ালো রবিন।

'নিশ্চয় আছে,' জবাব দিলো লোকটা। 'বেরিয়ে যাওয়ার পরও কে কোথায় আছে খোঁজ রাখার চেষ্টা করে ইনস্টিটিউট। তিনতলায় চলে যাও। সামনের দিকে রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস। জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হলের শেষ প্রান্তে সিঁড়ির দিকে চললো রবিন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো তিনতলায়। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, পেয়ে গেল অফিসটা। কাঁচের দেয়াল ঘেরা অনেকগুলো ছোট ছোট কেবিন, সবগুলোই খালি, একটা বাদে। ওখানে কাজ করছেন দাড়িওয়ালা একজন লোক। একটা কার্ড ফাইল ঘাঁটছেন।

রবিনকে কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

'আমার খালাতো ভাই এখানকার ছাত্র ছিলো। তার নাম স্টেবিনস কলিগ। লস অ্যাঞ্জেলেসে বেড়াতে এসেছি আমি। মা বলে দিয়েছিলো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যেতে। কিন্তু তার বর্তমান ঠিকানা জানি না। টেলিফোন বুকেও নাম নেই। ভাবলাম এখানে এলে পেতে পারি।'

'কলিগ, না? হ্যাঁ, আমারই ছাত্র ছিলো। মসবি মিউজিয়মের কিউরেটর এখন।'

এমন ভাব করে রইলো রবিন যেন মসবি মিউজিয়মের নামই শোনেনি। মুখ তুললেন শিক্ষক। 'রকি বীচ ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকলেই পেয়ে যাবে মসবি মিউজিয়ম। ফোনেও পেতে পারো স্টেবিনসকে। মিউজিয়মটাকে খুব ভালোবাসে সে, নিজের জিনিসের মতো। তার সাথে গিয়ে ইচ্ছে করলে মিউজিয়মও দেখে আসতে পারো। পুরনো মাস্টারদের আঁকা ভালো লাগে তোমার?'

'ছবির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। রেমব্র্যান্ত, ভ্যান ডাইক, ভারমিয়ারের মতো আর্টিস্টদের আঁকা ছবি। বোঝাই করে রেখেছে মসবি মিউজিয়ম।'

'তাই নাকি? ভালোই মনে হচ্ছে। কিউরেটর খুব দামী লোক, তাই না? মানে…বোনপো এরকম একটা পোস্টে কাজ করছে শুনলে খুশি হবে মা।'

কেমন এক ধরনের শূন্য দৃষ্টি ফুটলো দাড়িওয়ালা মানুষটির চোখে। 'দামী?…তা অবশ্য বলতে পারো। বেশ সিকিউরড পজিশন, নিরাপদেই আছে। একথা শুনে যদি খুশি হতে পারেন তোমার মা, হবেন।'

'নিরাপদ-টিরাপদ শুনলে কি আর কেউ খুশি হয়? খুশি হয় ভালো কাজ করছে শুনলে।'

'ভালো কাজ বলতে অনেক কিছুই বোঝায়,' সামান্য ধার ফুটলো শিক্ষকের কথায়। 'নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ আর দশজনের চেয়ে আলাদা হয় অনেক সময়। তবে সেটাও নির্ভর করে শিল্পীর মানসিকতার ওপর।'

'কতোটা আলাদা?'

'কি করে বোঝাই? আমার কথাই ধরো। আমি ভাবছি, স্টেবিনস তার প্রতিভার অপচয় করছে। অন্যের জিনিস মেরামত আর পাহারা দেয়ার চেয়ে নিজে কিছু আঁকা উচিত ছিলো তার। চেষ্টা করলে ভালো পারতো, আমি শিওর। তার হয়তো ধারণা নিরাপদে থাকাটাই বড় কথা। তাকে বলো, আমি বলেছি তার নিজের কিছু করার চেষ্টা করা উচিত। আমার নাম হাওয়ার্ড ডাবলিন। তোমার ভাই শুনবে বলে মনে হয় না, আগেও বহুবার বলেছি, শোনেনি। তবু, একটা প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেখলে খারাপ লাগে, সে-জন্যেই বলা। যদি মানসিকতার পরিবর্তন হয়।'

'বলতে বলছেন? আচ্ছাহ্। আসলে…আমি তাকে চিনিই না, দেখিনি কখনও। আমার মায়ের দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে। হয়তো আমাকেও খুব একটা পাত্তা দেবে না। মিউজিয়ম না-ও দেখাতে পারে। আপনি তো তাকে চেনেন। স্বভাব-

টভাব কেমন? মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে?'

'সরি, ইয়াং ম্যান, বেশি কথা বলে ঘাবড়ে দিয়েছি তোমাকে। ছবি আঁকবে না পাহারা দেবে সেটা নিয়ে তার সঙ্গে মতের অমিল রয়েছে আমার, কিন্তু তাই বলে লোক সে খারাপ নয়। সহজেই আন্তরিক হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে তোমার সাথে। হয়তো একদিনের ছুটি নিয়ে তোমাকে ডিজনিল্যাণ্ড কিংবা ম্যাজিক মাউনটেইনও দেখাতে নিয়ে যেতে পারে। ওর দোষটা হলো, ও সাংঘাতিক নকল বাজ। আসল কিছু করতেই তার যতো অনীহা। যে কোনো ছবি নকল করে ফেলতে পারে। পেইনটিঙে এক্সপার্ট না হলে দেখে বুঝতেই পারবে না ওটা আসল না নকল। জানো নিশ্চয়?' এক মুহূর্ত থামলেন ডাবলিন। তারপর বললেন, 'ও, না, তুমি জানবে কি করে। তুমি তো স্টেবিনসকেই চেনো না। আমার কথায় কান দিও না। আমি একজন পুরনো আদর্শবাদী। কে শুনবে আমার কথা? আধুনিক শিল্পীদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমার মিলবে না। ওরা নতুন কিছু দেয়ার চেয়ে নিরাপদে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। স্বভাব বদলাতে পারি না, তাই এখনও ছাত্রদেরকে···যাকগে।' হাসলেন তিনি। 'যাও, স্টেবিনসকে ফোন করো। ওর সাথে দেখা হলে বলো সময় করে যেন আমার সাথে এসে দেখা করে।'

'বলবো, স্যার।'

ঘুরতে যাবে রবিন, এই সময় ডাবলিন বললেন, 'খালাতো ভাই বললে না? আশ্চর্য! স্টেবিনসের কোনো আত্মীয় আছে বলেই শুনিনি। ওই সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেনি কারো সঙ্গে। একা একা থাকে···নিজের মতো করে।'

হাসলো রবিন। 'সব মানুষেরই আত্মীয় থাকে। কাছের না হোক, দূরের।'

'তা ঠিক। এখনও কারখানায় মানুষ তৈরি শুরু হয়নি তো, তাই। শিশু জন্ম দিতে বাবা-মায়ের দরকার হয়। আর হলেই আত্মীয়ের প্রশ্ন আসে। আত্মীয় থাকতেই হবে। যাক। যাও, ফোন করো। লস অ্যাঞ্জেলেস খুব ভালো জায়গা, অনেক কিছু দেখার আছে। দেখো। আর হ্যাঁ, স্টেবিনসকে বলতে ভুলো না কিন্তু, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। ওকে কিছু ধমক-ধামক দিতে হবে এবার।'

'বলবো, স্যার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বড় দরজাটা দিয়ে বাইরে বেরোলো রবিন। একটা বাস দেখা যাচ্ছে, দৌড় দিলো সেটা ধরার জন্যে। উঠে জানালার কাছে বসলো। উপকূল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। যেতে সময় লাগবে। যা যা জেনেছে খতিয়ে দেখতে লাগলো মনে মনে। জেনেছে, কলিগের প্রতিভা আছে। নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, একা একা থাকতে পছন্দ করে। ছবি এঁকে সুনাম কামানোর চেয়ে নিরাপদে নিশ্চিন্তে থাকাটাকে প্রাধান্য দেয়। লোকটাকে দেখে যা মনে হয়েছে, অন্যের মুখে তার স্বভাব চরিত্রের কথা শুনে আলাদা করে কিছু ভাবতে পারছে না সে। ডাবলিনের কথা শুনে বোঝা গেছে, দক্ষ কিউরেটর হওয়ার সমস্ত গুণাগুণ রয়েছে স্টেবিনসের।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। তদন্ত তো করলো, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই বের হলো না। কিশোর আর মুসা কি কিছু করতে পারলো? না পেরে থাকলে নতুন ভাবে তদন্ত চালাতে হবে, অন্য কিছু করতে হবে। যেভাবেই হোক,

ধরতে হবে ওই কাকতাড়ুয়াকে।

এগারো

'কি বলতে চাও তুমি? আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছো?' রেগে গেলেন ডক্টর রেন। 'সাহস তো কম না! যা যা বলার আমিই তো তোমাকে বলেছি, তারপর আবার কেন?'

'রাগ করবেন না, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। তদন্ত শেষ করার আগে পুরোপুরি বিশ্বাস কাউকেই করতে পারি না। এলিজা ওয়াগনারকে হেনস্তা করার ব্যাপারে যাকে যাকে সন্দেহ করেছি, সবার ব্যাপারেই খোঁজখবর নিচ্ছি। কাউকে খাতির করে বাদ দিলে তদন্ত হয় না, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকেলটা আলোচনা করে কাটিয়েছে তিন গোয়েন্দা। খেয়ে দেয়ে চলে এসেছে ওয়াগনার এস্টেটে, মক্কেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ল্যাবরেটরিতে দেখা হয়ে গেছে রেনের সঙ্গে। ইউ সি এল এ-তে গিয়ে যে খোঁজখবর নিয়েছে, সেকথা বলে দিয়েছে মুসা। তাইতেই ডক্টরের রাগ।

'আপনার কেমন লাগছে, বুঝতে পারছি, স্যার,' আবার বললো কিশোর। 'নিশ্চয় একমত হবেন আমাদের সাথে, অপরাধ তদন্তের সময় কাউকে খাতির করলে ফল ভালো হয় না।'

'তদন্ত করে যা বুঝলাম, এই এস্টেটে আছে এমন কারোরই এলিজাকে বিরক্ত করার পেছনে কোনো মোটিভ নেই। কাজেই অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে আমাদের। এই নিষ্ঠুরতা কে করছে এবং কেন তার কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু করে চলেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেন। 'মহিলার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। অস্থির স্বভাব। মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। তবে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, ইচ্ছে করে কারো কোনো ক্ষতি কখনও করেছে।'

'ইচ্ছে না করেও তো করে থাকতে পারে! আপনিই বলেছেন, কয়েকবার বিয়ে ঠিক হয়েছে তার, প্রতিবারেই ভেঙে দিয়েছে। এতে হয়তো রেগে গেছে কেউ। কষ্ট পেয়েছে।'

'মিসেস রোজারিও তো অন্য কথা বলেন। কাউকে নাকি কষ্ট দিতে পারে না এলিজা, নিজেই কষ্ট পায়।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। মিসেস রোজারিও এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন, এলিজার কিছু কিছু পাণিপ্রার্থীকে নাকি পছন্দ হয়নি তার ভাইয়ের, টাকা খাইয়ে বিদেয় করেছেন। ওরা লোক ভালো না, টাকার লোভেই এলিজাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, ফলে তাদের খসাতে বেগ পেতে হয়নি মিস্টার ওয়াগনারের। আর আমার ধারণা, তাদের অনেকেই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো কনের ওপরই, তার খাম-খেয়ালিপূর্ণ আচরণে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এখন কোথায় আছে?'

'বেভারলি হিলে। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না। কাল রাতে মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর নিজেকে বুঝিয়েছে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে মাকড়সাটা তার পা বেয়ে ওঠেনি। মিসেস রোজারিও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করেছিলেন কয়েক দিন বেভারলি হিলে গিয়ে থাকার জন্যে।

'আজ বিকেলে কিছু কফি চেয়ে আনতে গিয়েছিলাম ওয়াগনার ম্যানশনে। মিসেস রোজারিও বললেন, পুরনো একজন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে নাকি দেখা হয়ে গেছে এলিজার, বেভারলি উইলশায়ার হোটেলে। তাতে এতো অস্বস্তিতে পড়ে গেছে এলিজা, মিসেস রোজারিওকে ফোন করে বলেছে আজ রাতেই ফিরে আসবে।

'তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মিসেস রোজারিও, অন্য হোটেলে গিয়ে থাকার জন্যে। কিন্তু রাজি হয়নি এলিজা। গোঁ ধরেছে চলে আসবে, আসবেই।'

রেনের কথা শেষ হয়েও সারলো না, একটা চিৎকার শোনা গেল।

'ওই যে, এসে গেছে!' বলেই দরজার দিকে দৌড় দিলো মুসা।

তার পেছনে ছুটলো কিশোর আর রবিন। রাগে বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে ওদের পিছু নিলেন রেন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। চিৎকারটা চলেছেই। আগের চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়েছে যেন এলিজা।

'না!' চিৎকার করে বললো সে। 'না, না! প্লীজ, না!'

হঠাৎ থেমে গেল চিৎকার। ফোঁপাতে শুরু করলো এলিজা। তারপর ভয়াবহ একটা রূপকথার কল্পিত দানোর মতো তিন গোয়েন্দার প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়লো কাকতাড়ুয়াটা।

চত্বরের আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে। সেই আলোয় কাকতাড়ুয়ার মুখের একাংশ দেখতে পেলো ওরা। হাসছে ওটা। বাতিল ফেলে দেয়া চট দিয়ে তৈরি হয়েছে মুখটা। দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে দেয়া হয়েছে ঘাড়ের সঙ্গে। কালো রঙে তিনকোণা করে আঁকা হয়েছে চোখ। মাথায় বসানো কালো হ্যাট। শস্য খেতের বেড়ার ওপরে যে কাকতাড়ুয়াটা বসানো হয়েছে, ওটারই মতো পুরনো করডুরয়ের জ্যাকেট পরেছে এটাও, খড় বেরিয়ে রয়েছে হাতার ভেতর থেকে। রেন আর তিন গোয়েন্দাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো ওটা। আঁতকে উঠলেন ডক্টর। কাকতাড়ুয়ার হাতে একটা খড় কাটার বাঁকা কাস্তে।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

নিচু, খলখলে হাসির সঙ্গে সঙ্গে কাস্তেটা তুলে ধরলো কাকতাড়ুয়া। শাঁই করে বাতাসে কোপ মারলো একবার, এপাশ থেকে ওপাশে। তারপর ধেয়ে এলো তিন গোয়েন্দার দিকে। দস্তানা পরা হাতে কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরে রেখেছে কাস্তেটা।

সামনে রয়েছে রবিন। চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো একপাশে, কাস্তের সামনে থেকে সরে গেল।

দৌড় দিতে গিয়ে কিসে পা বেধে পড়ে গেল কিশোর। কোপ থেকে বাঁচানোর জন্যে হাত নিয়ে গেছে ঘাড়ের ওপর।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন মুসা। নড়ার শক্তিও নেই। তারপর কাস্তেটা যখন প্রায় চোখের সামনে চলে এসেছে, তখন সচল হলো, ডাইভ দিয়ে পড়লো একপাশে।

কাউকেই কোপ মারলো না কাকতাড়ুয়া। পালানোর সুযোগ পেয়ে একটা মুহূর্ত দ্বিধা না করে ছুটে গেল ঢাল বেয়ে। সামনে পড়েছিলেন রেন, তিনিও লাফিয়ে সরে গেছেন।

ইউক্যালিপটাসের ঝাড়ের ভেতর দিয়ে কাকতাড়ুয়ার ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। তারপর নীরবতা।

'মুসা!' সবার আগে কথা বললো রবিন। 'তুমি ঠিক আছো?'

আস্তে করে উঠে বসে কপাল ডলতে লাগলো মুসা। 'আছি। কোপটোপ লাগেনি।'

'শাঁই শাঁই করে যেভাবে ঘোরালো,' রেন বললেন, 'কোপ লাগলে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যেতো।'

মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, 'এই, শোনো!' ওপর দিকে তাকালো সে।

গোঁ গোঁ করছে এলিজা, ছোট জানোয়ার আহত হলে যেরকম করে অনেকটা সেরকম শব্দ। ওয়াগনার হাউসের সামনে আলো জ্বলছে। নিউম্যান আর মিসেস রোজারিওর কথা শোনা যাচ্ছে। সবাই মিলে শান্ত করার চেষ্টা করছে এলিজাকে।

রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ওরা যখন পৌঁছলো, এলিজাকে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সাহায্য করছে ব্রড। তার পেছনে হলে বসে রয়েছেন মিসেস রোজারিও। উদ্বিগ্ন। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিজার কনভারটিবল গাড়িটা। ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খোলা।

'ওটার···ওটার হাতে কাস্তে ছিলো!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো এলিজা। 'ঠিক গ্রিম রিপারের মতো! আমার মাথা কেটে ফেলতে চেয়েছিলো!'

'আরে না না, তা করবে কেন!' বোঝানোর চেষ্টা করলো ব্রড।

'করেছে!'

একে একে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো কিশোর, মুসা, রবিন।

'কাস্তে ছিলো,' কিশোর বললো। 'আমরাও দেখেছি।'

'অনেক হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!' বলে উঠলো নিউম্যানের স্ত্রী নরিটা। বাড়ির পাশ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়েছে। দম নিচ্ছে জোরে জোরে। কাত হয়ে আছে টুপিটা। 'এতো সব হট্টগোল! এবার আমি পুলিশকে ডাকবোই!'

'থাম তো!' ধমক দিলেন মিসেস রোজারিও।

'না, ডাকাই দরকার,' ছেলেদের পেছনে উঠে এসেছেন রেন। 'এবার আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না পুলিশ। ব্যবস্থা একটা করবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' নরিটা বললো। এলিজার কাছে গিয়ে হাত ধরে তাকে নিয়ে চললো লিভিং রুমের দিকে। 'আসুন, মিস। ভালো এক কাপ চা বানিয়ে দেবো। শান্ত হোন। আর আপনাকেই বা বলবো কি? আমার সামনে পড়লে আমিও ওরকম চেঁচাতাম। জানালা থেকে দেখেছি, তাতেই যেরকম ভয় লাগলো! ভূতের মতো চেহারা, হাতে কাস্তে, আরেব্বাপরে বাপ!'

রাস্তায় গাড়ির টায়ার ঘষার শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখলো, হেডলাইট। মসবি মিউজিয়মের ড্রাইভওয়েতে থামলো গাড়িটা। হেডলাইট নিভলো। বেরিয়ে এলো একজন লোক। হেঁটে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। কাছে এলে চেনা গেল, স্টেবিনস কলিগ। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন কিউরেটর। 'কি হয়েছে?'

'আবার কাকতাড়ুয়াটাকে দেখা গেছে, স্যার,' দরজার কাছে গিয়ে বললো ব্রড। 'ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে ছিলো। এই সময় গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন মিস এলিজা।'

'ও!'

'এমন করে "ও" বললেন, যেন বানিয়ে বলেছেন এলিজা!' রেগে গেলেন রেন। টাক চকচক করছে, জ্বলে উঠেছে চোখ। অতিবুদ্ধিমান অতিকায় একটা পিঁপড়ের মতোই লাগছে এখন তাঁকে, মুসার মনে হলো। 'আমরাও দেখেছি। ভয়ংকর চেহারা! বাতাসে যেরকম কোপাকোপি করলো কাস্তে দিয়ে, অল্পের জন্যে বেঁচেছি আমরা সবাই।'

দূরে সাইরেন শোনা গেল। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে আসছে গাড়ি।

'ওই যে, পুলিশ আসছে,' নরিটা বললো। 'ভাবলাম, আসবে না। অফিসারের কথা শুনে তো খুব একটা গুরুত্ব দিলো বলে মনে হলো না। বিশ্বাসই করেনি হয়তো।'

'নিশ্চয় চীফ ফ্লেচারও আছেন ওদের সঙ্গে,' গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। 'নইলে আসতো না। আমাদের দেখে আবার কি বলেন, কে জানে!'

বারো

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিন বিকেলে ওয়াগনার ম্যানশনে তিন গোয়েন্দাকে দেখে অখুশি হননি চীফ, তবে খুশি হয়েছেন কিনা সেটাও বুঝতে দেননি। বরং গম্ভীর হয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ওদেরকে কাকতাড়ুয়ার কেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। বিপদ হতে পারে হুঁশিয়ার করেছিলেন আগেই। কিন্তু কান দেয়নি তিন গোয়েন্দা। ওরা নাক গলিয়েছেই। কড়া গলায় ওদেরকে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। কাকতাড়ুয়ার কথা ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

চীফ যা-ই বলুক, কেস থেকে সরে দাঁড়ানোর কিংবা কাকতাড়ুয়ার কথা ভুলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই তিন গোয়েন্দার। 'তবে সাবধান থাকতে হবে আমাদের,' কিশোর বললো। 'ওয়াগনার ম্যানশনে আবার আমাদের দেখতে পেলে সত্যি সত্যি রেগে যাবেন চীফ।'

'সাবধান থাকার কথা আর বলতে হবে না,' মুসা বললো। 'কাল যে কাস্তে দেখেছি শয়তানটার হাতে! আফ্রিকার জঙ্গলই ভালো। বন্দুক-টন্দুক থাকে হাতে। এখানে তো ওসব কিছুই ব্যবহার করতে পারবো না। খপ করে এসে চেপে ধরবে পুলিশ।'

'কাল বিপদটা অবশ্য তোমার ওপর দিয়েই বেশি গেছে,' রবিন বললো।

'এলিজাকে বাদ দিলে। তবে তার একটা সুবিধেও হয়েছে। এখন সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া একটা সত্যি আছে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'কিছু জিনিস ঘটেছে, যেগুলো বিশ্বাস করাই কঠিন। সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, যদি স্নায়ুর জোর কম হয়,' চেয়ারে হেলান দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। জোরে জোরে বার দুই চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। 'গতরাতে অনেকেই আমরা কাকতাড়ুয়াটাকে দেখেছি। ওটা আছে কিনা এ-ব্যাপারে সন্দেহের অবসান ঘটলো। আমরা দেখেছি। ডক্টর রেন দেখেছেন। নরিটা নিউম্যান বলেছে, সে-ও জানালা থেকে দেখেছে। ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন ওখানে ছিলেন মিসেস রোজারিও আর ব্রড নিউম্যান। দেখেননি শুধু স্টেবিনস কলিগ।'

'এই, উনি সহজেই কাকতাড়ুয়া হতে পারেন, মানে হয়ে থাকতে পারেন,' রবিন বললো। 'ধরো, রক রিম ড্রাইভে গাড়িটা ফেলে এলেন তিনি। এলিজাকে ভয় দেখানোর পর ছুটে গিয়ে কাকতাড়ুয়ার পোশাক খুলে রেখে, গাড়ি নিয়ে ফিরে আসার যথেষ্ট সময় পেয়েছেন, পুলিশ পৌঁছার আগেই।'

'সেটা সম্ভব,' কিশোর বললো। 'কলিগ জানেন এলিজা কাকতাড়ুয়া আর পোকামাকড়কে ভয় পায়। বেভারলি হিল থেকে যে এলিজা ফিরে আসছে, এটাও তাঁর পক্ষে জেনে নেয়া সম্ভব।

'কিন্তু আমাদের রহস্যময় অচেনা লোকটার কথা ভুলে গেলে চলবে না, সেদিন খেতের মধ্যে যে আমাদের ওপর নজর রেখেছিলো, যাকে তাড়া করে গিয়েছিলাম আমরা। রক রিম ড্রাইভের পুরনো বাড়িটা থেকে ওয়াগনার হাউসের ওপরও নজর হয়তো সে-ই রেখেছিলো। কাকতাড়ুয়া সে-ও হতে পারে। কিন্তু যতোক্ষণ না হাতেনাতে পাকড়াও করতে পারছি, নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।'

গায়ে কাঁটা দিলো মুসার। 'অশরীরী কিছু হলে ধরার দরকার নেই। কাল যে কাণ্ডটা করলো···আরেকটু হলে নিজেই অশরীরী হয়ে যেতাম!'

'সাবধানে থাকতে হবে আমাদের, খুব সাবধানে,' কিশোর বললো। 'তবু কাকতাড়ুয়ার ওপর নজর রাখতেই হবে। পুলিশ এখনও তেমন জড়ায়নি এর সঙ্গে, যেরকমটা আমরা জড়িয়েছি। ওটাকে দেখেছি আমরা, কিছু সূত্র আছে হাতে, যেগুলো বেশ সাহায্য করবে।'

'জানি তো শুধু ওটার হাতে একটা কাস্তে ছিলো। আর কি জানি?'

'জানি, সব সময় সন্ধ্যাবেলায় আসে ওটা। অন্তত এলিজা যতোবার দেখেছে। তখন আলো থাকে কম, স্পষ্ট দেখা যায় না।'

'যাতে চেহারা চিনতে না পারে কেউ,' রবিন বললো।

'ঠিক। আজ বিকেলে, অন্ধকার হওয়ার আগেই, ওয়াগনার হাউসে যাবো আমরা। চোখ রাখবো। অপেক্ষা করবো।'

'যদি কিছু না ঘটে?'

'তাহলে কাল রাতে আবার যাবো।'

'আর যদি ঘটে?' কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ, 'যদি আসে কাকতাড়ুয়াটা?' ওটাকে ভূত ভাবছে সে।

'তাহলে আড়ালে থেকে তার ওপর চোখ রাখবো। কোথায় যায়, দেখার চেষ্টা করবো। শোনো, ওয়াকি-টকি নিয়ে যাবো আমরা, যাতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি। রবিন, তুমি চোখ রাখবে মসবি হাউসের ওপর। স্টেবিনস কলিগকেও এখন সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। মুসা, তুমি লুকিয়ে থাকবে রক রিমের পুরনো বাড়িটার ওপর। আর আমি থাকবো ওয়াগনার হাউসের আশেপাশে।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বললো, 'আচ্ছা, তাই হবে। আমার ভাল্লাগছে না কাকতাড়ুয়ার পিছে লাগতে, মানুষখেকো সিংহও এর চেয়ে অনেক ভালো। চিতামানবদেরও ভয় পাই না, কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল সে।

সেদিন বিকেলে ওয়াগনার হাউসের পোয়াটাক মাইল দূরে একটা ঝোপের ভেতরে যখন সাইকেল ঢুকিয়ে রাখছে কিশোর আর রবিন, তখনও মন খারাপ করে রেখেছে মুসা। তারটা আগেই ঢুকিয়েছে ঝোপের ভেতর। হাতে একটা ওয়াকি-টকি দিলো কিশোর, আরেকটা রবিনের হাতে।

এই খুদে যন্ত্রগুলো নিজের ওয়ার্কশপে বানিয়েছে কিশোর। দেখতে অনেকটা সিবি রেডিওর মতো, একটা করে স্পীকার আর একটা করে মাইক্রোফোন লাগানো রয়েছে। নিজেদের তৈরি বিশেষ বেল্ট কোমরে পরেছে তিন গোয়েন্দা। ভেতরে সেলাই করা রয়েছে তামার তার। তারের একমাথা বের করা। তাতে প্লাগ লাগানো। সেই প্লাগ ঢুকিয়ে দেয়া হয় ওয়াকি-টকির সকেটে, অ্যানটেনার কাজ করে তখন তামার তারটা। আধ মাইল দূরের সঙ্কেত ধরা যায়, সঙ্কেত পাঠানো যায়। যন্ত্রের সঙ্গে শক্ত লুপ লাগানো রয়েছে, বেল্টে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে। মাইক্রোফোনে কথা বলার সময় একটা বোতাম টিপে ধরতে হয়, স্পীকারে কথা শোনার সময় ছেড়ে দিতে হয়।

'যদি ওটাকে দেখো, ধরার চেষ্টা করবে না,' সকেটে প্লাগ ঢোকাতে ঢোকাতে সতর্ক করলো কিশোর। 'শুধু চোখে চোখে রাখবে। সাহায্য দরকার হলে ওয়াকি-টকি ব্যবহার করবে।'

মাথা ঝাঁকালো মুসা। দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো। ওয়াগনার হাউসের কাছে এসে বাঁয়ের পথটা ধরলো সে, কোণাকুণি হেঁটে পেরোলো সামনের খোলা জায়গাটা, তারপর ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চললো রক রিম ড্রাইভের পুরনো বাড়িটার দিকে।

পুরনো রাস্তাটায় পৌঁছে কোনো যানবাহন চোখে পড়লো না মুসার। কোনো গাড়ি পার্ক করা নেই। বাড়িটাকে দেখতে লাগছে শূন্য, কালো, নিঃসঙ্গ। লতাপাতায় ছেয়ে ফেলেছে দেয়াল। সামনের সিঁড়ির দু'পাশে আগাছা, ঢেকে দিয়েছে অনেকখানি।

ড্রাইভওয়ের পাশে একটা ঘন ঝোপ খুঁজে বের করলো মুসা। ওটাতে লুকালে সুবিধে হবে। সূর্য ডুবছে তখন।

'নাম্বার টু,' কথা বলে উঠলো ওর স্পীকার, 'কোথায় তুমি, নাম্বার টু?'

কিশোরের কণ্ঠ।

রেডিওর বোতাম টিপলো মুসা। 'পুরনো বাড়িটার কাছে. ঝোপের মধ্যে।'

শান্ত রাখার চেষ্টা করছে কণ্ঠস্বর। 'এখানে কিছু নেই।'

'গুড, টু। বসে থাকো। দেখো, কি হয়। রবিন, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

কুট করে একটা শব্দ হলো। রবিনের বোতাম টেপার। 'আমি মসবি হাউসের পেছনে।'

'বেশ। অন্ধকার হচ্ছে। সতর্ক থাকবে। তেমন দরকার না পড়লে ওয়াকি-টকি ব্যবহার করবে না।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। মাটিতে বসে দুই পা বাঁকা করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে হাঁটুতে থুতনি রাখলো মুসা। কান পেতে রইলো শব্দ শোনার আশায়। প্রথমে কিছুই শুনতে পেলো না। তারপর, দূরে অস্পষ্ট শোনা গেল একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। লো গীয়ারে খারাপ রাস্তা দিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে উপকূলের দিক থেকে।

সজাগ হলো তার স্নায়ু। চ্যাপারাল ক্যানিয়ন রোড ধরে এ-সময়ে গাড়ি আসাটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। হতে পারে, পর্বতের ওপর দিয়ে পার হয়ে ওপারের স্যান ফারনানদো ভ্যালিতে নেমে যাবে।

নাকি রক রিম ড্রাইভের দিকে আসবে?

এঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল। আরও লো গীয়ারে নামিয়েছে ড্রাইভার। ট্রাক আসছে, আন্দাজ করলো মুসা। ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে শক অ্যাবজরভারের স্প্রিং। হেডলাইট দেখা গেল। রক রিমের দিকেই আসছে।

মুসার লুকানো জায়গাটা যেন ভেদ করে গেল তীব্র আলোকরশ্মি। ভয় হলো তার, তাকে না দেখে ফেলে ড্রাইভার। ঝাঁকি খেতে খেতে এসে ড্রাইভওয়েতে উঠলো গাড়িটা, থামলো গিয়ে বাড়ির সামনে। এঞ্জিন বন্ধ হলো। আলো নিভলো। হ্যাণ্ডব্রেক টানার শব্দ হলো।

কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একজন লোক। ছায়া-ঢাকা পথ ধরে নিঃশব্দে চলে গেল বাড়ির পেছনে। দরজা খোলার শব্দ হলো। খানিক পরেই জানালার তক্তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো কাঁপা আলো।

সোজা ওপরতলায় চলে গেল লোকটা। নগ্ন কাঠের মেঝেতে আর নড়বড়ে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হয়েছে জোরে জোরে, স্পষ্টই কানে এসেছে মুসার।

সাবধানে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে বসলো সে, যাতে দোতলার জানালাগুলো দেখতে পারে, যেগুলো থেকে ওয়াগনার ম্যানশনটা দেখা যায়। শূন্য, কালো জানালা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতে দেখা গেল একটাতে। চকিতের জন্যে একটা মুখ দেখতে পেলো মুসা। রোদে পোড়া চামড়া। নাকের কাছ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে গভীর রেখা।

সিগারেট ধরালো লোকটা। মাথায় ঝাঁকড়া শাদা চুল। নিভে গেল দিয়াশলাইয়ের কাঠি। সিগারেটের মাথার লাল আলোটা ছাড়া পুরো বাড়িটা এখন অন্ধকার।

উত্তেজনায় কাঁপছে মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো ট্রাকের পেছন দিকে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে এলো আরেকটা জায়গায়, যেখান থেকে লোকটা যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকটা দেখা যায়।

কি দেখছে? ভাবলো মুসা। নিশ্চয় ওয়াগনার হাউস। কিন্তু ম্যানশনে কি

রয়েছে? এমন কিছু ঘটছে কিংবা ঘটানো হবে, যেটা একটা সঙ্কেত? দেখার অপেক্ষা করছে লোকটা? দেখলেই পুরনো করডুরয়ের কোট পরে, রঙ করা একটা চটের থলে মাথায় গলিয়ে, কালো হ্যাট মাথায় পরে কাকতাড়ুয়া সেজে বেরিয়ে পড়বে?

কিশোরের সঙ্গে কথা বলবে কিনা ভাবলো মুসা। বাতিল করে দিলো ভাবনাটা। এখন সামান্য ফিসফিসানিও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। বরং উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাকের পেছনের দরজার হাতল ধরে টান দিলো। খুলে গেল দরজাটা।

ভেতরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। খানিকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে সয়ে এলো অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে জালের মতো একটা জিনিস ছুঁয়ে দেখলো মুসা। ধাতব একটা চাকতিতে লাগানো জিনিসটা। এছাড়াও প্লাস্টিকের জিনিস রয়েছে–লম্বা হাতলওয়ালা একটা রেঁদার মতো যন্ত্র। তীব্র রাসায়নিক গন্ধ বাতাসে।

ভেতরে উঠে পড়লো সে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলো জিনিসগুলো। গন্ধের জন্যে নাক কুঁচকে রেখেছে। চিনতে পারলো গন্ধটা, ইস্কুলের ল্যাবরেটরিতে এই গন্ধ বহুবার পেয়েছে। ক্লোরিন। আর যন্ত্রগুলো সুইমিং পুল পরিষ্কারের কাজে লাগে। তাহলে কি লোকটা সুইমিং পুলের মিস্ত্রী?

আনমনেই নিঃশব্দে হাসলো মুসা। লোকটাকে নিশ্চয় ভাড়া করে আনা হয়েছে। নিউম্যানরা আনতে পারে। স্টেবিনস কলিগ, এমনকি ডক্টর রেনও আনতে পারেন। তাদের কেউ একজন হয়তো এলিজা ওয়াগনারকে পছন্দ করে না। লোক ভাড়া করে এনেছে তাকে ভয় দেখানোর জন্যে। কিংবা হতে পারে, এই লোকটা নিজে নিজেই এসেছে, কেউ ভাড়া করেনি। বিকৃত রুচির লোক। মানুষকে ভয় দেখাতে ভালোবাসে। এলিজার পেছনে লেগেছে।

কোনোভাবে একবার কাকতাড়ুয়া সাজার পোশাকটা বের করতে পারলেই হয়। নিয়ে চলে যাবে মুসা। প্রমাণ।

হঠাৎ বরফের মতো জমে গেল যেন মুসা। খামচে ধরেছে ট্রাকের ধার। নড়তে আরম্ভ করেছে যানটা।

'খাইছে!' ফিসফিস করে নিজেকেই বললো সে।

মরিয়া হয়ে উঠলো সে। কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই সিটের ওপর দিয়ে এসে ঢুকলো কেবিনে। চেপে ধরলো হ্যাণ্ড-ব্রেকের হাতল। নষ্ট। ঢিল হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি স্টিয়ারিং হুইল ধরে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়লো। ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে ট্রাকের গতি আর দিক পরিবর্তনের চেষ্টা করলো। দ্রুত বেগে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওটা। ক্রমেই বাড়ছে গতি। পিছিয়ে চলেছে। ব্রেক প্যাডাল চেপে ধরলো সে। ব্রেক ফ্লুইডের কড়া গন্ধ এসে লাগলো নাকে। একটা সিলিণ্ডার ফেটে গেছে, কিংবা মুখ খুলে গেছে। কাজ করছে না ব্রেক।

লো গীয়ারে দিলে গতি কমতে পারে। তবে ওটাও কাজ করবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে এখন তার। একটা করে সেকেণ্ড যাচ্ছে, আর বেড়ে চলেছে ট্রাকের গতি।

ঠেলে দরজা খুললো সে। আবছা অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে পাশ কাটাতে দেখলো গাছগুলোকে। আর কোনো উপায় নেই, লাফিয়েই পড়তে হবে। লম্বা করে দম

নিয়ে ঝাঁপ দিলো সে।

ওপরে আকাশ, নিচে রাস্তা। মাটিতে এসে পড়লো মুসা। গড়ান খেলো কয়েকটা। ট্রাকটা সরে চলে গেছে। গাছের সঙ্গে ওটার বাড়ি লাগার শব্দ শুনতে পেলো। তারপরই পথের পাশের একটা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। শক্ত কিছুতে বাড়ি খেলো মাথা। পলকের জন্যে চোখে পড়লো সন্ধ্যার কোমল নীলচে-সবুজ আকাশের রঙ, পরক্ষণেই হাজারটা উজ্জ্বল তারা জ্বলে উঠলো যেন মাথার ভেতর।

নিথর হয়ে গেল মুসা।

তেরো

ওয়াগনার হাউসের চারপাশে চতুর্থ বার ঘুরে এলো কিশোর। চাঁদ উঠছে তখন। ম্যানশনের পেছনে একটা উঁচু জায়গায় এসে থামলো। উষ্ণ রাত। তাই কাকতাড়ুয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও জানালার পর্দা টানা হয়নি। আলোকিত ঘরের ভেতরে তাকালো সে। রান্নাঘরে রয়েছে নরিটা। কি যেন ধুচ্ছে সিংকে। বাঁয়ের ছোট লিভিং রুমটায় টিভি চলছে। ঘর অন্ধকার। টেলিভিশনের আলোয় আবছা ভাবে চোখে পড়ছে ব্রড নিউম্যানকে, চেয়ারে বসে বেস বল খেলা দেখছে।

ডানে মিসেস রোজারিওর সিটিং রুম। স্টেবিনস কলিগের সঙ্গে দাবা খেলছেন তিনি। একসময় হাসলেন কলিগ, মিসেস রোজারিওর দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন। দাবার চাল চাললেন। মুখ বিকৃত করে ফেললেন মিসেস রোজারিও।

কিশোর বুঝলো, জিততে চলেছেন কিউরেটর।

উঠে দাঁড়িয়ে স্পোর্টস জ্যাকেটের বোতাম লাগালেন কলিগ। কথা বলছেন। তারপর মিনিট দুয়েক বাদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন মিসেস রোজারিও। তাকিয়ে রয়েছেন ভারমিয়ারের পেইন্টিংটার দিকে। তারপর হঠাৎ যেন একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে চলে গেলেন কোণের বেডরুমটায়। আলো জ্বাললেন। বড় একটা আলমারির কাছে গিয়ে ওটার দরজা খুললেন। হ্যাঙারে ঝোলানো রয়েছে সারি সারি কাপড়। নানারকম পোশাকের ওপরের তাকে সাজানো রয়েছে অনেক বাক্স।

চট্ করে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালেন তিনি। যেন বুঝতে পেরেছেন অন্ধকার লনে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর চোখ রাখছে কেউ। কি ভেবে এগিয়ে এলেন জানালার কাছে। পর্দা টেনে দিলেন।

আপন মনেই হাসলো কিশোর। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলো। চলে এলো বাড়ির ডান কোণে। ওখান থেকে জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে বেরিয়ে থাকা পাতালঘরের দেয়ালের কাছে। মিসেস রোজারিওর ঘরের নিচের পাতালঘর থেকে বেরোনোর একটা দরজা আছে। দরজার সামনেই পথ। যুক্ত হয়েছে গিয়ে ডানের ড্রাইভওয়ের সঙ্গে। কিশোর আন্দাজ করলো, এই দরজাটা ঝাড়ুদার আর মাল সরবরাহকারী লোকদের প্রবেশ পথ।

বাড়ির পাশ ধরে হাঁটতেই থাকলো সে। চারটে গাড়ি রাখা যায় এতোবড় গ্যারেজের পাশ দিয়ে নেমে চলে এলো ড্রাইভওয়েতে। সামনের দিকে ড্রাইভওয়েটা দুই ভাগ হয়ে একটা ভাগ চলে গেছে বাঁয়ে। সেটা ধরেই চললো কিশোর। তারপর পাশের ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে এগোলো বারান্দার দিকে।

বারান্দার ওপাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। আবার দেখা গেল সিংকে কাজ করছে নরিটা। তার স্বামী টেলিভিশন দেখছে। পা টিপে টিপে বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে টবে লাগানো বড় একটা গাছের আড়ালে লুকালো কিশোর। বাঁয়ে লিভিং রুমের বিশাল জানালাগুলো সব খোলা। উঁকি দিয়ে দেখলো সে, সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে এলিজা ওয়াগনার। সামনের কফি টেবিলের ওপর রাখা একটা পাশার ছক। তার সামনে একটা খাড়া পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে রয়েছেন ডক্টর হেনরি রেনহার্ড। আলোয় চকচক করছে তাঁর টাক। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছেন পাশার ছকের দিকে।

ঘরের ভেতর ঢুকলেন কলিগ। তাঁকে বলতে শুনলো কিশোর, 'ও, শক্রতা দেখি শেষ হয়ে গেছে!'

'একটা বিশেষ শক্রর সাথে লড়াইয়ের জন্যে একজোট হয়েছি আমরা,' জবাব দিলেন রেন। পাশার ছক থেকে মুখ তুললেন না।

'ভালো, ভালো। গুড নাইট জানাতে এলাম। ছুটিতে যাবো তো। কিছু জরুরী কাজ সারতে হবে।'

'ছুটিতে যাবেন?' অবাক হলো যেন এলিজা। 'তাহলে মসবি কালেকশনগুলোর কি হবে? দর্শকরা আসবে না?'

'মিউজিয়ম বন্ধ থাকবে,' কলিগ বললেন। 'প্রতি বছরই আগস্টের শেষ দুটো হপ্তা বন্ধ থাকে, জানো তুমি। আমি না থাকলে চারতলার একটা বাড়তি ঘরে একজন গার্ড থাকে। যাতে কিছু নষ্ট না হয়, দেখে।'

'তাই। মিসেস রোজারিও খুব মিস করবে আপনাকে। তা কখন যাচ্ছেন?'

'শুক্রবারে। যাবার আগে দেখা করে যাবো অবশ্যই।'

ঘুরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে লনে নেমে পড়লো কিশোর। প্রায় দৌড়ে চলে এলো বাড়ির সামনের দিকে, কলিগকে দেখার জন্যে। রাস্তা পার হয়ে মিউজিয়মের দিকে চলে গেলেন কিউরেটর।

মসবিদের এলাকায় রয়েছে রবিন। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে হাত নাড়লো কিশোরের উদ্দেশ্যে, তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারান্দায় ফিরে এসে উঠলো কিশোর। দেখলো, হুইল চেয়ার চালিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এলেন মিসেস রোজারিও। কোলের ওপর বড় একটা বাক্স।

'এলিজা, শোনো,' কোমল গলায় ডাকলেন তিনি। 'তোমার খেলা হয়ে গেলে এসো। ছবিগুলো খুলে দেখবো।'

'কিসের ছবি?'

'তোমার। ঠিকঠাক মতো সব করিয়ে আনতে অনেক দিন বসে থাকতে হয়েছে আমায়। সেই বুবার্ডে থাকার সময় থেকে তোমার যতো ছবি তুলেছি, সব আছে এখানে। যখন থেকে বেশি বেশি বিদেশে যাওয়া শুরু করলে, তার আগে

পর্যন্ত সব আছে।'

চিন্তিত লাগলো মিসেস রোজারিওকে। 'তুমি এখানে আছো, ভালোই লাগছে। তবে এখন তোমার ইউরোপে থাকার কথা। কেন তোমার ভাইয়ের কাছে চলে যাও না? ভূমধ্যসাগরে নিশ্চয় ঘুরছে এখনও, তাই না? ওর কাছে চলে গেলেই ভালো করবে। এই হতচ্ছাড়া কাকতাড়ুয়ার ভয় আর পেতে হবে না। উইলিয়াম দেখাশোনা করতে পারবে তোমার। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'মিসেস রোজারিও, আমি ভাইয়াকে বেকায়দায় ফেলে দিই, আপনি ভালো করেই জানেন। আর তাছাড়া আমি···আমি কিছুতেই যাবো না ওই দানবটার ভয়ে। শয়তানী করে আমার বাড়ি থেকে বের করে দেবে, এ-কিছুতেই হতে দেবো না।'

'ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো।' বাক্স খুলে ছবি বের করে দেখতে শুরু করলেন মিসেস রোজারিও।

পা টিপে টিপে বারান্দা থেকে নেমে এলো কিশোর। আবার চললো তার টহল। অস্বস্তি বোধ করছে। লিভিং রুমেরই কোনো একটা ব্যাপার নাড়া দিয়েছে তাকে। কিছু একটা গোলমাল রয়েছে ওখানে। তবে সেটা কি বোঝার আগেই তার মনে হলো, ইউক্যালিপটাসের ছায়ার মধ্যে কে যেন হাঁটছে।

ধড়াস করে এক লাফ মারলো তার হৃৎপিণ্ড। কাকতাড়ুয়া! হ্যাঁ, ওটাই হবে! কলিগ চলে গেছেন তাঁর মিউজিয়মে।-ওয়াগনার ম্যানশনের বাসিন্দারাও সব ঘরের ভেতরে।

নিঃশব্দে গাছগুলোর দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর। মট্ করে ছোট একটা ডাল ভাঙলো। পাতায় শরীরের ঘষা লেগে খসখস শব্দ হলো। গোলাঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে ওটা।

গাছের নিচের ছায়ায় পৌঁছলো কিশোর, ওটাও বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। কাকতাড়ুয়াই। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে গোলা-ঘরের দিকে। একবারও পেছনে ফিরে তাকালো না। গোলার দরজায় পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো।

কিশোর আন্দাজ করলো, নিশ্চয় বড় শক্ত খিল আটকানো দরজায়। একবার বাড়ি খেয়েছেন রেন। আরেকবার পাহাড়ের কাকতাড়ুয়ার তাড়া খেয়েছেন। হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন এখন। ভালোমতো আটকে রেখেছেন ল্যাবরেটরির দরজা।

বিচিত্র একটা গর্জন করলো কাকতাড়ুয়া। অন্ধকারে ওরকম একটা অদ্ভুত জীবের ডাক স্নায়ুর ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। পিছিয়ে এলো কিশোর।

আলগা পাথরেই পা পড়লো বোধহয়। বাঁকা হয়ে গেল গোড়ালি। তাল সামলাতে না পেরে ম্যানজানিটা ঝোপের ওপর পড়ে গেল সে।

পাঁই করে ঘুরলো কাকতাড়ুয়া।

দেখতে পাচ্ছে কিশোর, তার দিকে ছুটে আসছে ওটা। অবচেতন ভাবেই হাত চলে এলো মুখের ওপর। গড়িয়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

রোম খাড়া করা একটা চিৎকার দিয়ে লাফ দিলো কাকতাড়ুয়া।

চোদ্দ

আঘাত বাঁচাতে তৈরি হলো কিশোর। গড়িয়ে সরে গেল। তারপর ঝটকা দিয়ে সরিয়ে ফেললো মাথা। আর একটা মুহূর্ত দেরি হলেই তার মাথায় লাগতো কাকতাড়ুয়ার বুট। তবে ওই একবারই, আর লাথি মারার চেষ্টা করলো না ওটা। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে যেতে লাগলো। একা পড়ে রইলো কিশোর।

একা এবং অক্ষত।

উঠে বসলো কিশোর। শরীর কাঁপছে। দাঁড়ালো। টলোমলো করে উঠলো পা, দেহের ভার রাখতে কষ্ট হচ্ছে যেন। ওয়াকি-টকিটা পড়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করলো ওটা। সুইচ টিপে বললো, 'রবিন! মুসা!' গলা কাঁপছে তার। 'ওটা এসেছিলো! আমি দেখেছি! শুনতে পাচ্ছো?'

রবিনের কণ্ঠ শোনা গেল, 'তুমি কোথায়?'

'পাহাড়ের ঢালে। ইউক্যালিপটাসের ঝাড়ের মধ্যে। মনে-হচ্ছে ওয়াগনার হাউসের দিকেই গেল কাকতাড়ুয়াটা।'

'না, এদিকে তো আসেনি,' মুসা জানালো। কণ্ঠস্বর কেমন বদলে গেছে তার। 'আমিও একজনকে দেখেছি, তবে সেটা কাকতাড়ুয়া নয়। হতে পারে না। মিনিটখানেক আগেও পুরনো বাড়িটাতে ছিলো। তারপর গিয়ে ট্রাকে উঠলো। হয়তো বুঝেছে আজকের রাতে সুবিধে হবে না। সোজা চলে গেল।'

'লাইসেন্স নম্বরটা রাখতে পেরেছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'না। সরি…'

'কি ব্যাপার?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'তোমার কিছু হলোটলো নাকি?'

'না, তেমন কিছু না। পড়ে গিয়েছিলাম, ব্যস।'

'ঠিক আছে। নজর রাখো। কাকতাড়ুয়াটা ওদিকেও যেতে পারে। রবিন, তুমি চোখ রাখো বাড়ির দিকে।'

'তুমি কি করছো?' জানতে চাইলো রবিন।

'কাকতাড়ুয়াটা কোথায় গেল বোঝার চেষ্টা করছি।'

'খাইছে! কিশোর, সাবধান থেকো, খুব সাবধান!' হুঁশিয়ার করলো মুসা।

হুঁশিয়ারই রইলো কিশোর। ছায়ার মতো নিঃশব্দে এগোলো ইউক্যালিপটাসের ঝাড়ের ভেতর দিয়ে। নিজেকে কাকতাড়ুয়া কল্পনা করে ভাবতে লাগলো, সে যদি ওটা হতো, আর হঠাৎ চমকে যেতো, তাহলে কোথায় যেতো? তাড়াহুড়ো করে লুকানোর দরকার পড়লে?

কান পেতে শুনছে কিশোর। ঝিঁঝির কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঝোপের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। পাহাড়ের ওপর মস্ত বাড়িটা চোখে পড়ছে। বারান্দার ওপরের জানালাগুলোয় উজ্জ্বল আলো। লোকজন দেখা যাচ্ছে। কেউ পাশা খেলছে, কেউ ছবি দেখছে বা এমনি কোনো সাধারণ কাজ করছে। ওখানেই পাহাড়ের কোনো অন্ধকার জায়গায় গিয়ে লুকিয়েছে কাকতাড়ুয়াটা।

আত্মগোপন করেছে কোনো রহস্যময় জায়গায়।

কিশোরের পেছনে রয়েছে শস্যের খেতটা। বিশেষ গুরুত্ব দিলো না জায়গাটাকে। ওখানে যায়নি কাকতাড়ুয়া। ওটা দৌড়ে গেছে বাড়ির পেছনের পরিষ্কার জায়গা দিয়ে। ডানে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে সেদিকেই হেঁটে চললো সে। পেছনের লনে কিছু নড়ছে না। ওয়াগনার ম্যানশন থেকে ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া পায়ে চলা পথ ধরে ওকের জটলার পাশ কাটিয়ে নেমে এলো সে। চোখে পড়লো একটা ছোট কটেজ। এমন একটা জায়গায় তৈরি হয়েছে ওটা, সহজে চোখে পড়ে না। নিশ্চয় ওটাই গেস্ট হাউস, যেখানে বাস করেন ডক্টর রেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কিশোর। রেনের ঘরে গিয়ে লুকানোর সাহস করবে কি কাকতাড়ুয়াটা? এখনও ওখানেই রয়েছে? নজর রেখেছে তার ওপর? যদি কটেজটার পাশ কাটাতে চায় কিশোর তাহলে কি করবে ওটা? হামলা চালাবে? রক রিম ড্রাইভের দিকে পালানোর চেষ্টা করবে? নাকি পাহাড়ের জঙলা জায়গায় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই?

ধীরে ধীরে ছোট ঘরটার দিকে এগোতে শুরু করলো কিশোর। কটেজের কাছে পৌছে সাবধানে উঠে এলো বারান্দায়। বুঝলো, এই সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই। তার ওপর চোখ রেখে থাকলে এতোক্ষণে তাকে দেখে ফেলেছে ওটা।

দরজায় থাবা দিলো কিশোর, যেন ডক্টর রেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। 'ডক্টর রেন? আমি, কিশোর। ঘরে আছেন?'

থাবা দিয়ে আবার ডাকলো। দরজার নব ধরে মোচড় দিলো। ধক্ করে উঠলো বুক। দরজার পাল্লাটাও ঠিকমতো লাগানো নেই। ঘুরে গেছে নব। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললো পাল্লা। অপেক্ষা করছে সে। কিছুই ঘটলো না। যখন কিছু নড়লোও না ঘরের ভেতর, জোরে জোরে ডাকলো আবার রেনের নাম ধরে। তারপর আনমনেই বললো, 'ঠিক আছে। একটা নোট রেখে যাই তাঁর জন্যে।' দরজার পাশে হাতড়াতে শুরু করলো। সুইচ পেয়ে টিপতেই একসাথে জ্বলে উঠলো কয়েকটা বাতি।

ছোট একটা লিভিংরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। মরচে পড়ে গেছে লোহার আসবাবপত্রে। একটা পাথরের ফায়ারপ্লেস রয়েছে। রান্নাঘরটা ডানে। একটা কাউন্টারের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে ছোট একটা চোরকুঠুরি।

লুকানোর কোনো জায়গা চোখে পড়লো না কিশোরের। তাই ঘরের শেষ প্রান্তের আরেকটা দরজার দিকে এগোলো। ওপাশে ছোট একটা হলওয়ে আছে। বাথরুম আছে। আর আছে একটা বেডরুম, তাতে দুটো বিছানা। বাথরুমে কেউ নেই। বিছানার নিচে, আলমারির ভেতরে কিংবা দরজার আড়ালেও লুকিয়ে থাকতে দেখা গেল না কাউকে। খালি বাড়ি।

সন্তুষ্ট হয়ে লিভিংরুমে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেই স্থির হয়ে গেল সে। মনে পড়ে গেল সৈনিক পিঁপড়ের ওপর রেনের দেয়া বক্তৃতাগুলো।

'সৈনিক পিঁপড়ের গজখানেক চওড়া সারি কখনও দেখেছো?' তিনি বলেছিলেন।

'ভাবতে পারো, পিলপিল করে চলেছে ওরা, চলার পথে জীবন্ত যা কিছু পাচ্ছে সব কিছুর ওপর চড়াও হচ্ছে, এমনকি বিল্ডিঙের মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে!'

কল্পনা করার দরকার হলো না কিশোরের। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। চৌকাঠ আর পাল্লার মাঝের ফাঁক দিয়ে আসছে ওগুলো। হাজারে হাজারে। মেঝে আর আসবাবপত্র ছেয়ে ফেলছে। একটা চেয়ার ইতিমধ্যেই ঢাকা পড়ে গেছে পিঁপড়ের চলমান কার্পেটে।

আবার রেনের কথা মনে পড়লো কিশোরের; 'জ্যান্ত সব কিছুই ওদের খাবার।'

'না, তা হতে পারে না!' নিজে বলে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজলো সে। 'এগুলো সেরকম নয়! কারণ এগুলো আফ্রিকান পিঁপড়ে নয়!'

তারপর তার মনে পড়লো, পাহাড়ের পিঁপড়েগুলো নতুন প্রজাতির। যাদের স্বভাব-চরিত্র রেনও খুব কম জানেন। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কিশোর, তাকে ছেঁকে ধরেছে পিঁপড়ে। কামড়ে কামড়ে মাংস তুলে নিচ্ছে। জ্যান্ত অবস্থায়ই খেয়ে ফেলছে একটু একটু করে।

দাঁড়িয়ে থেকে পিঁপড়ের খাবার হতে চাইলো না সে। এক দৌড়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে। জানালার কাছে এসে খোলার চেষ্টা করলো। পারলো না। শক্ত করে লাগানো।

একটানে পায়ের একটা জুতো খুললো বাড়ি মেরে কাঁচ ভাঙার জন্যে। থেমে গেল। এই প্রথম খেয়াল করলো, লোহার গ্রিল লাগানো রয়েছে। কাঁচ ভাঙলেও বেরোতে পারবে না।

ঘুরে তাকালো আবার। এগিয়ে আসছে পিঁপড়ের দল। বন্যার পানির মতো ঘরের ভেতরে ঢুকছে। বেডরুমের বাইরে হলওয়ে ছেয়ে ফেলেছে দেখতে দেখতে।

আটকা পড়েছে কিশোর!

পনেরো

মারাত্মক, আঠালো কোন তরলের মতো লাগছে পিঁপড়ের চলমান চাদরকে। হলওয়ে ছেয়ে এগিয়ে আসছে, আরও, আরও।

ওয়াকি-টকির বোতাম টিপলো কিশোর। 'মুসা! রবিন!' চিৎকার করে বললো সে। 'পিঁপড়ে! লাখ লাখ পিঁপড়ে! গেস্ট হাউসে! জলদি এসো! ডক্টর রেনকে নিয়ে!'

বেডরুমের দরজা দিয়ে ঢুকছে পিঁপড়ে।

'অবস্থা কি খুব খারাপ?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হ্যাঁ! জলদি এসো! আটকা পড়েছি আমি!'

একটা বিছানায় এসে উঠলো কিশোর। একটানে তুলে আনলো বেডকভারটা, যাতে মেঝে ছুঁয়ে না থাকতে পারে। দলামোচড়া করে ফেললো বিছানার মাঝখানে। পায়া বেয়ে এমনিতেও উঠবে ওগুলো। তবে চাদর বেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি উঠে যেতো। যতোটা দেরি করানো যায় তা-ই লাভ।

'মুসা! রবিন! জলদি এসো!'

ভেতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ছে পিঁপড়েরা। আরও এগিয়ে এসেছে। রেডিওতে চিৎকার করে সাহায্য চাইলো কিশোর।

বাইরে কার পায়ের শব্দ এসে থামলো। 'সর্বনাশ!' শোনা গেল রেনের চিৎকার।

'কিশোর!' রবিনের ডাক শোনা গেল। 'কোথায় তুমি? ঠিক আছো তো?'

'বেডরুমে!' প্রায় ককিয়ে উঠলো কিশোর। 'জলদি এসো!'

নরিটার কণ্ঠ শুনতে পেলো সে। গালাগাল করছে পিঁপড়েকে। তাকে সরে দাঁড়াতে বললেন রেন। বেডরুমের জানালায় থাবা মারছে কেউ।

পিঁপড়ের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে জানালার দিকে তাকালো কিশোর। দেখলো গ্রিলের ওপাশে মুসার উদ্বিগ্ন মুখ। তার পাশে রবিন। জানালাটা খোলার চেষ্টা করছে মুসা।

'আটকে আছে!' চেঁচিয়ে বললো কিশোর। 'মনে হয় রঙটঙ লেগে আটকেছে!'

নিউম্যান আর রেন এগিয়ে আসতেই সরে তাঁদেরকে জায়গা করে দিলো রবিন আর মুসা। ডক্টরের হাতে একটা পাথর। ছুঁড়ে মারলেন জানালার কাঁচ সই করে। ঝনঝন করে ভেঙে গেল কাঁচ।

'অ্যাইই, ধরো!' বলেই একটা টিন কিশোরের দিকে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। পোকামাকড় মারার বিষ রয়েছে ওটাতে। 'ছিটিয়ে দাও। জলদি পথ করে এগিয়ে এসো জানালার কাছে।'

'জানালার পাশে একটা হুড়কো আছে,' নিউম্যান বললো। 'ওটা খুলতে পারলেই গ্রিলটা খুলে যাবে। বেরোতে পারবে।'

বিছানার পায়া বেয়ে উঠতে শুরু করলো পিঁপড়ে। এখনও মেঝেটা পুরোপুরি ভরে যায়নি পিঁপড়েতে। ওষুধ ছিটাতে লাগলো কিশোর। পায়া বেয়ে যেগুলো ওঠার চেষ্টা করছে, প্রথমে ওগুলোকে, তারপর তার নিচের গুলোকে। মরা পিঁপড়ের ওপর নেমে পড়লো সে। মড়মড় করে পিষে গেল ওগুলো। শব্দটা শুনলেই কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। শিউরে উঠলো কিশোর। এক পা এগোচ্ছে, ওষুধ ছিটাচ্ছে, আরেক পা বাড়াচ্ছে, আবার ছিটাচ্ছে।

চলে এলো জানালার কাছে। মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা কাঁচে পা পড়লো। 'হুড়কো?' পাগলের মতো খুঁজছে ওটা সে। 'কোথায় ওটা?'

হাত তুলে একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার দেখালো নিউম্যান। 'ওটা সরাও। দেয়ালে দেখতে পাবে ওটা।'

ছোট চেস্টটা ধরে টান দিলো কিশোর। পিছলে সরে এলো ওটা। অসংখ্য পিঁপড়েকে পিষে দিয়ে।

সহজ হুড়কো। গ্রিলের ফ্রেমের একটা বাড়তি অংশে ছিদ্র করে তার মধ্যে ছিটকানির মতো একমাথা বাঁকা একটুকরো শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। টান দিতেই খুলে চলে এলো। 'খুলেছে!' চিৎকার করে বললো সে।

'গুড!' রেন বললেন। তিনি আর নিউম্যান ধরে টানতেই কজার ওপর পাল্লা যেমন করে খোলে তেমনি করে খুলে গেল গ্রিলটা।

মুহূর্ত পরেই বাইরে ঘাসের ওপর লাফিয়ে পড়লো কিশোর। তার ওপরই এসে প্রায় বসে পড়লো নরিটা, বাচ্চার ওপর মা মুরগী যেমন করে গিয়ে বসে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়ে রইলেন রেন। অভিভূত করে দিয়েছে যেন তাঁকে পিঁপড়েগুলো। বিছানাটা ছেয়ে ফেলেছে, একটু আগে কিশোর যেখানে ছিলো।

দৌড়ে এলো এলিজা ওয়াগনার। গেস্ট হাউসের নরম আলোয় তার মুখ দেখতে পাচ্ছে কিশোর। চোখেমুখে আতঙ্ক। হাতে লাল একটা ক্যান।

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। বুঝে ফেললো কি করতে এসেছে এলিজা।

'না না, মিস ওয়াগনার, না!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'সরো! সরে যাও! আমার ধারে কাছে আসবে না!'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এলিজার কণ্ঠ। যেন খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে। ক্যানটাকে এমন করে তুলে ধরেছে, যেন কিশোর বাধা দিতে এলে তার ওপরেই ছুঁড়ে মারবে।

'এলিজা, প্লীজ!' অনুনয় করে বললেন রেন। 'আমার পিঁপড়ে ওরা! আমার রিসার্চ...প্লীজ!'

কানেই তুললো না এলিজা। রেনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো, যেন ডক্টরও আরেকটা বড় সর্বনেশে পিঁপড়ে। টিন থেকে তরল পদার্থ ঢালতে শুরু করলো কটেজের সামনের বারান্দা আর দেয়ালে।

পেট্রোলের গন্ধ এসে নাকে লাগলো কিশোরের।

খোলা দরজা দিয়ে টিনটা ভেতরে ছুঁড়ে ফেললো এলিজা। লিভিং রুমের ভেতরে যেখানে পিলপিল করছে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে। সোয়েটারের পকেট থেকে বের করলো অন্য আরেকটা জিনিস।

'এলিজা! না আ আ!' লাফ দিয়ে আগে বাড়লেন রেন।

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেই ছুঁড়ে মারলো এলিজা।

ফুৎ করে একটা শব্দ হলো। চোখের পলকে আগুন লাফিয়ে উঠলো কটেজের সামনের অংশে। ছড়াতে শুরু করলো। লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো লিভিং রুমের ভেতরে।

'হয়েছে!' উন্মাদের মতো চিৎকার করে বললো এলিজা। 'এইবার হয়েছে! বুঝবে এখন ঠেলা! মরুক! ইস্, আর সহ্য করতে পারছি না আমি!'

বলতে বলতেই ঘুরে দৌড় মারলো পাহাড়ের দিকে।

ষোলো

'ইস্, যদি খালি ট্রাকের লাইসেন্স নম্বরটা রাখতে পারতাম!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'আমি একটা ছাগল! পারলাম না কেন?'

কেবিনে যেদিন আগুন লেগেছে তার পরদিন সকাল। হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে।

'পুল দেখাশোনার লোক,' রবিন বললো। 'এখন আমরা জানি তার কাজটা কি। আর তাকে খুঁজে বের করাও হয়তো কঠিন কিছু নয়।'

'দরকার নেই,' কিশোর বললো। 'মুসা, তুমি বললে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেহুঁশ হয়ে ছিলে। যখন হুঁশ ফিরলো দেখলে লোকটা ট্রাকের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'খাদে পড়ে থেমে গেল ট্রাকটা। ওটাতেই চড়লো লোকটা। খাদ থেকে তুলে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। ব্রেক কাজ করছে কিনা সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালো না।'

'তাহলে আমাদের রহস্যময় পুল মেরামত করার লোকটি কাকতাড়ুয়া নয়। কারণ ওই মুহূর্তে সে তার ট্রাক নিয়ে পালাতেই ব্যস্ত। যখন কাকতাড়ুয়াটা ডক্টর রেনহার্ডের ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে।'

'তাহলে কে কাকতাড়ুয়া সাজে?' মুসার প্রশ্ন।

'নিউম্যান দম্পতিকে বাদ রাখা যায়,' কিশোর বললো। 'কারণ কাকতাড়ুয়াটাকে দেখার আগের ক্ষণেও ওদেরকে ওয়াগনার হাউসে দেখেছি। ডক্টর অবশ্য কাল আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু অন্য রাতে যখন দেখলাম ওটাকে তখন ছিলেন। বাকি থাকলেন স্টেবিনস কলিগ, কিন্তু তিনি একাজ করবেন বলে মনে হয় না।'

সামনে ঝুঁকে টেবিলে কনুইয়ের ভর রাখলো সে। 'এখন যা অবস্থা, সারা জীবন আলোচনা করেও এ-কেসের সমাধান আমরা করতে পারবো না এভাবে। কারণ খুব বেশি সূত্র নেই আমাদের হাতে। অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। হামলার শিকার হলো এলিজা ওয়াগনার। কাকতাড়ুয়ার নজর তারই দিকে। কাল রাতের মানসিক আঘাতটা নিশ্চয় এতোক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। গিয়ে তাকে এখন কিছু প্রশ্ন করা দরকার। জিজ্ঞেস করতে হবে তাকে এভাবে অস্থির করে দিয়ে কার কি লাভ।'

'আবার খেপে যেতে পারে,' হুঁশিয়ার করলো মুসা।

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তার। তাকে কেউ অপছন্দ করবে একথা ভাবলেই আবার রাগবে।'

'কিন্তু অন্তত একটা লোক যে তাকে অপছন্দ করে একথা মেনে না নিয়ে পারবে না,' কিশোর বললো। 'কাকতাড়ুয়া। এলিজার সঙ্গে কথা বলতে হবে। চলো।'

মিনিট কয়েক পরেই সাইকেল চালিয়ে কোস্ট হাইওয়েতে চলে এলো তিন গোয়েন্দা। ওয়াগনার হাউসে এসে কলিং বেল বাজালে দরজা খুলে দিলো এলিজাই। সব সময় যেমন পরে তেমনি ভাবেই পোশাক পরেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু চেহারা একেবারে রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। চোখের চারপাশে কালি।

'মিস ওয়াগনার,' ভদ্র কণ্ঠে বললো কিশোর। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারবো?'

'যদি বেশি জরুরী হয়'। শরীরটা ভালো না। টায়ারড্ লাগছে। কাল রাতে দমকল বাহিনীর চীফ এসেছিল এখানে। ভীষণ রেগে গেছে আমার ওপর,' মুখ বাঁকালো এলিজা। 'অনেক কথা বলে গেল। বললো, ঘরে আগুন না ধরিয়েও পিঁপড়ে মারার নাকি আরও অনেক উপায় আছে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর, মুখে কিছু বললো না। দমকল বাহিনীর ফায়ার চীফের সঙ্গে একমত।

'কাল রাতে ঘুম ভালো হয়নি,' এলিজা বললো। 'মিসেস রোজারিওরও শরীর ভালো ছিলো না। পেট ব্যথা করছিলো। একা থাকতে কষ্ট হবে ভেবে আমি গিয়ে কিছুক্ষণ থেকেছি তার সঙ্গে। এখনও ওখানেই বসে ছিলাম।'

'আমি গিয়ে বরং বসি তাঁর সঙ্গে,' প্রস্তাব দিলো রবিন। 'আপনি কিছুক্ষণ ছুটি পাবেন তাহলে।'

মলিন হাসি হাসলো এলিজা। 'ভালোই হয়। সিটিংরুমে আছে। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকো।'

বাড়ির পেছনে মিসেস রোজারিওর ঘরের দিকে চলে গেল রবিন। অন্য দু'জনকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এলো এলিজা। নিজে সোফায় বসে ছেলেদেরকে চেয়ার দেখিয়ে দিলো।

'আপনার চেনাজানা মানুষদের সম্পর্কে কথা বলতে চাই,' কিশোর বললো। 'আপনাকে পছন্দ করে না এমন কারও নাম বলতে পারেন?'

'আমাকে অপছন্দ করে?'

'হ্যাঁ। স্টেবিনস কলিগকে কেমন মনে হয়?'

'দূর, কি বলো! তিনি তো আমাদের ঘরের লোক। ছবি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না তিনি।'

'তাহলে এখানে যারা কাজ করে তাদের কেউ?'

'নিউম্যানদের কথা জিজ্ঞেস করছো!'

'না। আমরা শিওর হয়ে গেছি, নিউম্যান কাকতাড়ুয়া সাজেনি। অন্য কেউ? মালি-টালি? আমি জানি, হপ্তায় দু'দিন করে আসে ওরা। তারপর রয়েছে পুল মেরামতের লোক। সে-ও তো নিয়মিতই আসে, নাকি?'

'আসে। কিন্তু আমাকে অপছন্দ করবে কি কারণে? তাকে ভালোমতো চিনিই না আমি। ইউ সি এল এ-র ছাত্র সে, যদ্দূর জানি।'

'তরুণ?' অবাক হয়েছে কিশোর।

'নিশ্চয়।'

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করলো।

'বুঝতে পারছি, আর বেশি দিন থাকতে পারবো না এখানে,' এলিজা বললো। 'না পারলে নাই। ইউরোপে চলে যাবো আবার।...ও হ্যাঁ, কাল রাতে আবার এসেছিলো কাকতাড়ুয়া।'

তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর আর মুসা।

'মাঝরাতের দিকে। তখন আমি মিসেস রোজারিওর ঘরে। আলো নেভানো। ড্রাইভওয়েতে দেখা গেছে তাকে। একটা ঠেলা ঠেলে নিয়ে চলেছিলো গ্যারেজের দিকে।'

'ঠেলা?' প্রতিধ্বনি করলো যেন কিশোর। 'খালি? নাকি মাল ছিলো?'

'স্তূপ করে রাখা ছিলো কি যেন। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। মাটি-টাটি হতে পারে।'

'কাউকে ডাকেননি?'

'না। ডাকতে ডাকতে বিরক্ত হয়ে গেছি,' কেমন যেন শূন্য মনে হলো তার কণ্ঠস্বর। 'লোকের কাছে পাগল সেজে লাভ কি? তার চেয়ে চুপচাপ থাকবো, এই ভালো।'

'হুঁ।'

'আমি জানিই না আমার বিরুদ্ধে কার এমন ক্ষোভ আছে। হলে খুব পুরনো শত্রুতা হবে। কারণ মাঝখানে বহু বছর লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকিনি আমি।'

ডাইনিং রুম আর লিভিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়ালো নরিটা। জানালো, তার স্বামী রকি বীচ বাজারে যাচ্ছে। জানতে চাইলো এলিজার জন্যে কিছু আনতে হবে কিনা।

'অ্যাসপিরিন,' বলে দিলো এলিজা।

'আচ্ছা।'

চলে গেল নরিটা। উঠে দাঁড়ালো এলিজা। 'তোমরা কি থাকবে আরও কিছুক্ষণ? থাকলে ভালোই হয়। তোমরা থাকলে বেশ সাহস পাই, নিরাপদ বোধ করি।'

'নিশ্চয়ই থাকবো,' কিশোর বললো। 'আচ্ছা, ডক্টর রেন কোথায়?'

'গেস্ট হাউসটা পুড়ে যাওয়ায় গোলাঘরে ঠাঁই নিয়েছে। হয়তো ওখানেই আছে এখন, বিশ্রাম নিচ্ছে। আমারও বিশ্রাম দরকার, যাই।'

হলের দিকে রওনা হলো এলিজা। কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল। 'দেখি, নরিটাকে নিয়ে যাই। একা যেতে ভয় লাগে।'

'তাই করুন।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল এলিজা। একটু পরেই নরিটার আন্তরিক কণ্ঠ কানে এলো দুই গোয়েন্দার। সিঁড়ি বেয়ে দু'জন মানুষের উঠে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। সামনের একটা জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। দেখলো, বড় কালো একটা বুইক গাড়ি চলে যাচ্ছে চ্যাপারাল ক্যানিয়ন ধরে, খুব আস্তে চলেছে গাড়িটা। 'নিউম্যান শহরে যাচ্ছে,' জানালো সে।

এই সময় সেখানে এসে ঢুকলো রবিন। 'মিসেস রোজারিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন ব্যথায়।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো সে। তারপর বললো, 'অবাক কাণ্ড, বুঝলে। তাঁর হুইল চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে চলেছি, বেডরুমে দিয়ে আসার জন্যে। মিউজিয়মে ঝোলানো আসল ভারমিয়ারটার কথা বললেন তিনি তখন। ঝাড়বাতিদানটার কথাও বললেন। বুঝিয়ে দিলেন কি করে প্রিজমগুলো কাঁপে, যখন সিঁড়ির গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটা বাজে।'

তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'বলেছেন? কি করে? তিনি তো সিঁড়ি বেয়েই উঠতে পারেন না। জানলেন কিভাবে?'

'নিশ্চয় কলিগ বলেছেন,' কিশোর বললো। 'ওই ঝাড়বাতিদানটা তাঁর খুব পছন্দ।'

উজ্জ্বল হলো তার চোখ। 'এই শোনো, এখন মিসেস রোজারিও ঘুমোচ্ছেন। এলিজাকে নিয়ে নরিটা গিয়ে ওপরতলায় উঠেছে। নিউম্যান চলে গেছে বাজারে।

এটাই সুযোগ। অনেক আগেই যা করা উচিত ছিলো, এখন সেটা সেরে ফেলা দরকার।'

'কী?' জানতে চাইলো মুসা।

'বাড়িটা তল্লাশি।'

সতেরো

নিঃশব্দে কাজ করছে তিন গোয়েন্দা। ওপরতলায় এলিজা আর নরিটা যে জেগে রয়েছে, একথাটা অবশ্যই মনে রেখেছে। আলমারির ভেতরে, ক্লোজেটের ড্রয়ারে, কেবিনেটের ওপরে, সমস্ত জায়গায় খুঁজছে।

রান্নাঘর আর ভাঁড়ারে কোনো সূত্র পেলো না, কাকতাড়ুয়াকে ধরতে যেটা সাহায্য করবে। চাকরদের ছোট সিটিংরুমেও কিছু মিললো না। বাকি রইলো ওদের দুটো বেডরুম।

একটা ঘরের ক্লোজেটে কিছু ইউনিফর্ম দেখা গেল। কিছু শার্ট-প্যান্ট আছে, জ্যাকেট আছে, মোজা আছে। কিন্তু চটের বস্তাও নেই, কালো হ্যাটও নেই, যা পরে কাকতাড়ুয়া সাজা যায়।

'নিউম্যান যদি কাকতাড়ুয়া না-ই হয়ে থাকে,' রবিন বললো, 'এখানে কেন খুঁজতে এসেছি আমরা?'

'কারণ না খোঁজাটা বোকামি,' জবাব দিলো কিশোর। 'সব জায়গায়ই খুঁজতে হয়। কিছুই বাদ দেয়া উচিত হবে না। এখানে কিছু পাওয়ার আশা করছি না, তবু দেখবো। তারপর যাবো বেসমেন্টে।'

বাড়িটা যেমন বিরাট তার সেলারও তেমনি। কয়েকটা কামরায় ভাগ করা। একটাতে মদ রাখা হয়। একটা হলো ফারনেস রুম, কয়েকটা আছে স্টোর রুম, এর একটা ওয়ার্কশপ। আগে আগে চলেছে কিশোর। মিসেস রোজারিওর ঘরের নিচের ঘরটায় চলে এলো। আগের রাতে এই ঘরের দরজা খুলেই লনে লোক বেরোতে দেখেছে সে। ওখানটায় বাইরের মাটি আর বেসমেন্টের মেঝে একই সমতলে।

'দেখছো?' নরম গলায় বলে হাত তুলে দেখালো কিশোর। সিমেন্টের মেঝেতে টায়ারের দাগ। 'এখান দিয়েই ঠেলাটা বের করে নিয়ে গেছে কাকতাড়ুয়া। রবারের চাকা। মাটি বোঝাই করা হয়েছিল। ওই যে দেখ, মাটির ঢেলা পড়ে রয়েছে।'

'কিন্তু এলো কোত্থেকে মাটি?' অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে রবিন।

চাকার দাগ ধরে এগোলো তিন গোয়েন্দা। দাগের পাশে পড়ে রয়েছে মাটির টুকরো। অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না। সরু একটা করিডরে এসে ঢুকলো ওরা। অব্যবহৃত একটা স্টোর রুম আর ভারি কাঠের দরজাওয়ালা একটা ঘরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথটা। দ্বিতীয় ঘরটার আলো জ্বাললো মুসা। ছাতে কিছু পাইপ দেখা গেল, ময়লা লেগে রয়েছে।

'গোশত রাখার ঘর ছিলো এটা একসময়,' বললো মুসা। 'রকি বীচ মার্কেটে

কোল্ড রুম দেখেছো না, ওরকম। অতোটা বড় না আরকি।'

'একটা বাড়িই ছিলো তখন,' রবিন বললো। 'ওয়াগনাররা সবাই যখন থাকতো এখানে। ভাবতে পারো, বাড়ির মধ্যে ব্যক্তিগত কোল্ড স্টোরেজ!'

সামান্য মাথা ঝোকালো কিশোর। তবে রবিনের কথায় বিশেষ কান দিলো না। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। যেন যা খুঁজতে এসেছিলো পেয়ে গেছে। হাত তুলে করিডরের শেষ প্রান্ত দেখিয়ে বললো, 'মাটি এসেছে ওখান থেকে।'

রবিন আর মুসাও তাকালো। করিডরের শেষ মাথায় সিমেন্টের দেয়াল থাকার কথা যেখানে, সবখানেই যেরকম আছে, সেরকম কিছু নেই। তার জায়গায় যেন হাঁ করে রয়েছে কালো একটা ফোকর।

'খাইছে!' ফিসফিস করে বললো মুসা, 'সুড়ঙ্গ!'

পকেট থেকে টর্চ বের করলো কিশোর। 'রান্নাঘরের ড্রয়ারে পেয়েছি,' বললো সে। 'ভাবলাম, কাজে লাগতে পারে। তাই নিয়ে এসেছি।'

আলো ফেললো সুড়ঙ্গে।

'বাবারে!' বলে উঠলো রবিন, 'কাঠের বীম পর্যন্ত লাগিয়ে দিয়েছে ছাতে, যাতে ধসে না পড়তে পারে। প্রচুর খেটেছে।'

'খনির সুড়ঙ্গের মতো,' মুসা বললো। 'তাহলে কাকতাড়ুয়া মিয়া একাজেই ব্যস্ত। কিন্তু···কিন্তু···' থেমে গেল সে।

'কিন্তু কেন এরকম একটা কাজ করলো,' কিশোর বললো।, 'বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? আরেকজনের বাড়ির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়া···ধরা পড়ে যেতে পারতো। অচেনা হলে।'

'তার মানে এবাড়িরই কেউ,' অনুমান করলো মুসা। 'সে নিজে হয়তো কাকতাড়ুয়া নয়, তবে ওটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নিউম্যানরা?'

'নজরটা তো ওদের দিকেই যায়,' কিশোর বললো। 'এই সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে আন্দাজ করতে পারছি।'

দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। বাড়ির একপাশে, রাস্তার দিকে মুখ করে রয়েছে ওটা। 'রাস্তার নিচ দিয়ে মসবি হাউসে চলে গেছে সুড়ঙ্গটা,' বললো সে ফিসফিস করে। 'মসবি মিউজিয়মে ঢোকার প্ল্যান করেছে কেউ।'

'চলোই না, দেখি।'

ভেতরে ঢুকে পড়লো কিশোর। ডানে বাঁয়ে আলো ফেলছে।

পেছনে ঢুকলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। কারো মুখে কথা নেই। নরম মাটিতে জুতোর শব্দ হচ্ছে না। যতোই এগোচ্ছে এক ধরনের ভেজা ভেজা গন্ধ বাড়ছে বাতাসে। পথ যেন আর ফুরায়ই না। অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে যেন কয়েক যুগ চলার পর থেমে গেল কিশোর। থামতেই হলো। কারণ সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সিমেন্টের দেয়াল। ছুঁয়ে দেখলো ওটা। কিল মেরে দেখলো। নিরেট। 'মসবি হাউসের বেসমেন্ট,' ফিসফিসিয়ে বললো সে। 'মিউজিয়মের এই একটিমাত্র দিকে পাহারা নেই। তবে বার্গলার অ্যালার্ম সব জায়গায়ই আছে।'

রবিন আর মুসা দু'জনেই মাথা ঝাঁকালো। টর্চটা রবিনের হাতে তুলে দিলো কিশোর। ঘুরলো তিনজনেই। ফেরার পথে এবার আগে আগে রইলো রবিন। মুসা

আগের মতোই মাঝখানে। কিশোর সবার পেছনে।

'অবিশ্বাস্য!' ওয়াগনার হাউসের বেসমেন্টে ফিরে এসে বলে উঠলো মুসা 'এই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে নিশ্চয় অনেক দিন লেগেছে। কয়েক মাস।'

'এখন আমরা জানি,' কিশোর বললো। 'এলিজাকে কেন ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে কাকতাড়ুয়া। ওটার ভয়, যে কোনো সময় বেসমেন্টে ঢুকে সুড়ঙ্গটা দেখে ফেলতে পারে সে। কিংবা রাতের বেলা জানালার বাইরে চোখ পড়লে কিছু দেখে ফেলতে পারে। সর্বক্ষণ তো আর হুঁশিয়ার থাকতে পারবে না কাকতাড়ুয়া।'

টর্চ নিভিয়ে দিলো রবিন। করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে চললো তিন গোয়েন্দা।

'আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারছি এখন,' আবার বললো কিশোর। 'রকি বীচে বাজার করতে যাওয়ার সময় এতো আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলো কেন ব্রড। মাটিতে বোঝাই ছিলো গাড়িটা। সুড়ঙ্গের মাটি ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে ভরে রেখেছিল গাড়িতে। সেগুলোই ফেলতে গেছে। বাড়ির কাছাকাছি ফেললে লোকের নজরে পড়ে যাবে, এই ভয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

পরিত্যক্ত কোল্ড স্টোরেজের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো মুসা। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগলো। বললো, 'কি যেন পুড়ছে! এই, গন্ধ পাচ্ছো?'

সুইচ টিপে আবার আলো জ্বেলে দিলো সে।

ধোঁয়ায় ভরে গেছে পুরনো ঘরটা। এক কোণে স্তূপ করে রাখা পুরনো কম্বল। আর গোটা দুই রঙের টিন, ঢাকনা খোলা।

'চমৎকার!' মুসা বললো। 'কে ফেলে গেছে এখানে এগুলো?'

এগিয়ে গিয়ে লাথি মারলো কম্বলের স্তূপে। ছড়িয়ে পড়লো কম্বল। ছিটকে গেল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কয়েকটাতে লাফিয়ে উঠলো আগুন।

'সাবধান!' মুসার পেছনে আগুন দেখে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। দৌড়ে গেল আগুন নেভাতে মুসাকে সাহায্য করার জন্যে। কিশোরও গেল।

হঠাৎ দরজার কাছে শোনা গেল খসখসে হাসি।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো তিনজনে।

ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কাকতাড়ুয়া। ছাতে ঝোলানো ইলেকট্রিক বাল্বের পরিষ্কার আলোয় বিকট লাগছে ওটার রঙ করা মুখ। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো ওটা। তারপর হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো ভারি দরজাটা, একটানে বন্ধ করে দিলো।

'না না!' বলে চিৎকার করে উঠে দৌড় দিলো মুসা। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়লো দরজার ওপরে। হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে টান মারলো।

নড়লো না দরজা।

'এই শোনো শোনো!' চেঁচাতে লাগলো মুসা। 'শুনে যাও! খুলে দাও দরজাটা!'

'হয়েছে, থামো!' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে কিশোর। 'চেঁচিয়ে লাভ হবে না। খুলবে না ও। আমাদেরকে আটকে রেখে গেছে ইচ্ছে করেই। কখনোই আর খোলার ইচ্ছে আছে কিনা, তা-ই বা কে জানে!'

দরজার ভেতর দিকের হুড়কোটা পরীক্ষা করে দেখলো রবিন। 'আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে! এটা ভাঙা!'

'ভাগ্যটাগ্য সব ফালতু কথা,' কিশোর বললো। 'আসল ব্যাপার হলো, কাকতাড়ুয়াটা আমাদেরকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে দেখেছে। আন্দাজ করে নিয়েছে আমরা অনেক কিছু জানি। হুড়কোটা ভেঙেছে। তারপর আগুনের টোপ দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে এনে ভরেছে।'

'আর আমরাও বোকা গাধা,' তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'তার টোপ দেখে মজে গেলাম। বাড়িটা এখন পুড়ে না গেলেই হয়।'

'পুড়বে না। এই সুবিধেটাই তো নিতে চেয়েছে কাকতাড়ুয়া। এই ঘরে আমাদের আটকে চুপ করিয়ে রাখতে চেয়েছে। যতোই চেঁচাই, দরজা ধাক্কাই, কেউ শুনতে পাবে না। এখানে যে আগুন লেগেছে, বাইরের কেউ দেখতে পাবে না।'

'ওই পাইপগুলোতে যদি বাড়ি মারি? বাইরের ঘরে কি ওই আওয়াজও যাবে না? পাইপ তো শব্দ বয়ে নিয়ে যাওয়ার ওস্তাদ।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'বাইরের ঘরের সঙ্গে এই পাইপের যোগাযোগ নেই। কোনো একটা রেফ্রিজারেশন ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ওগুলো। বাইরেই কোথাও আছে ওটা। বাড়ি মারলেও কেউ শুনবে না। তবে বেসমেন্টের কাছাকাছি থাকলে শুনলেও শুনতে পারে।'

ধপ্ করে মেঝেতে বসে পড়লো মুসা। 'তাহলে কাকতাড়ুয়াটা আমাদের ভালোমতোই আটকে রেখে গেল! আর কোনোদিন বেরোতে পারবো না!'

'তা বোধহয় রাখতে পারবে না। খোঁজাখুঁজি শুরু হবেই,' নিজেকেই যেন ভরসা দিলো কিশোর। 'সাইকেলগুলো ফেলে এসেছি আমরা। এলিজার গাড়ির পাশে। তার চোখে পড়বেই।'

'চোখে পড়লেই কি আর এখানে আসবে?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। 'এই মাটির তলার ঘরে? মাকড়সার মধ্যে?'

কথাটা ভেবে দেখলো কিশোর। 'না, তা আসবে না,' বিষণ্ন শোনালো তার কণ্ঠস্বর। 'সাইকেলগুলো দেখলে ভাববে ডক্টর রেনের সঙ্গে রয়েছি। আর নিউম্যানদের চোখে যদি পড়ে··· তাহলে কি করবে আল্লাই জানে। ওরা সাহায্য করতে আসবে বলে মনে হয় না।'

চুপ হয়ে গেল তিনজনেই। ভাবছে। একসময় অসহ্য লাগলো ওই নীরবতা।

'মেরিচাচী জানে আমরা কোথায় এসেছি,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো কিশোর। 'বোরিস আর রোভারকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকেও ফোন করতে পারে। তবে সেটা অনেক সময়ের ব্যাপার···'

আবার চুপ হয়ে গেল সে। অন্য দু'জনও কোনো কথা বললো না। তিনজনের মনেই একটা ভাবনা,ততোক্ষণ ঘরে বাতাস থাকবে তো? নাকি উদ্ধারকারী দল এসে দেখবে তিনটে লাশ পড়ে রয়েছে মেঝেতে, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত?

শামুকের মতো ধীর গতিতে যেন এগোতে লাগলো সময়। একটা দীর্ঘ সেকেণ্ডের পর আরেকটা সেকেণ্ড। এমনি করে যেন বহুযুগ পরে কাটলো একটা ঘন্টা। পেটে মোচড় দিতে আরম্ভ করেছে কিশোরের। বাতাসের কথাই শুধু

ভাবছে, খিদের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলো।
হঠাৎ যেন মৃদু কেঁপে উঠলো ঘরটা।
'কি হলো?' শুয়ে পড়েছিলো, ঝট্ করে উঠে বসলো মুসা।
'ভূমিকম্প, আর কি?' হাত ওল্টালো রবিন।
'চমৎকার!' পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিলো মুসা। সামান্য যেটুকু আশা হয়েছিলো তা-ও উবে গেল। 'একেই বলে কপাল! বন্ধ ঘরে আটকে থেকে শুধু বাতাসের অভাবে মরাই নয়, একেবারে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলার ব্যবস্থা! প্রকৃতিও আমাদের সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করলো নাকি!'
আবার গড়িয়ে চললো যেন সময়ের শামুক। সেকেণ্ড গেল, মিনিট, তারপর ঘন্টা।
'কল্পনা করছি, নাকি সত্যি?' রবিন বলে উঠলো। 'বাতাস খারাপ হয়ে আসছে?'
'কি জানি!' কিশোর বললো। 'তবে…' থেমে গেল সে। মুহূর্তের জন্যে দম বন্ধ করে ফেললো। 'কি ব্যাপার?' ফিসফিসিয়ে বললো সে।
অন্য দু'জনও কান পেতে শুনলো।
'দরজায় থাবা মারছে না তো?' মুসার প্রশ্ন। উঠে দরজার দিকে এগোলো সে। 'অ্যাইই!' চিৎকার করে বললো, 'আমরা এখানে আছি! আটকা পড়েছি!' পাল্লায় কিল মারতে শুরু করলো।
জুতো খুলে ফেললো কিশোর। সে-ও এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। জুতো দিয়ে দমাদম বাড়ি মারতে শুরু করলো পাল্লায়।
রবিনও উঠে এলো। একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করলো তিনজনে।
অবশেষে, ঝট্কা দিয়ে খুলে গেল কোল্ড রুমের বিরাট দরজা। লম্বা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া শাদা চুল। অনবরত রোদে থেকে থেকে স্যুটকেসের চামড়ার মতো ট্যান হয়ে গেছে যেন হাত আর মুখের চামড়া। নাকের দু'পাশ থেকে অনেকগুলো গভীর রেখা গিয়ে মিশেছে ঠোঁটের কোণে। তার হাত আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিজা ওয়াগনার।
'গঅড!' লোকটা বললো। 'আমার মনে হচ্ছিলো তোমরা এখানেই কোথাও আছো। ঢুকতে দেখেছিলাম, কিন্তু বেরোতে দেখিনি।'
ক্লান্ত হাসি হাসলো কিশোর। বেরিয়ে এলো করিডরে। 'ভালোই হয়েছে। রহস্যময় লোকেরা যখন বাড়ির ওপর চোখ রাখে, তখনও উপকার হয় মাঝেমধ্যে।'
'রহস্যময় লোক?' নাক কুঁচকালো এলিজা। 'ও রহস্যময় নয়। আমাদের পুল মেরামত করে। জন ডিলন। যা-ই হোক, ব্যাপারটা কি বলবে? ঘটছে কি এখানে? ব্রড আর নরিটাও নেই। ঘুম থেকে উঠে দেখি পুরো বাড়িটা খালি!'
'ও, চলে গেছে তাহলে। তারমানে ওদের কাজ শেষ,' ইশারায় সুড়ঙ্গমুখটা দেখালো কিশোর।
তাকালো ডিলন। 'তাহলে ওখানেই গেছে! সুড়ঙ্গ!'
'মসবি হাউসে,' বলে টর্চ জ্বাললো কিশোর। এগোলো সুড়ঙ্গের দিকে। পিছু

নিলো রবিন, মুসা আর ডিলন।

একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলো এলিজা। দ্বিধা করলো। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'না না, আমাকে ফেলে যেও না! আমিও যাবো!'

'তাহলে জলদি এসো!' হাত নেড়ে ডাকলো ডিলন।

চারজনের মধ্যে রবিন ঢুকলো সবার পেছনে। তার পেছনে রইলো এলিজা।

সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছার আগে কেউ কথা বললো না। বিরাট একটা ফোকর দেখা গেল কংক্রীটের দেয়ালে। বাতাসে বারুদের কড়া গন্ধ।

'ডিনামাইট,' বাতাস শুঁকে বললো ডিলন। 'ডিনামাইট দিয়ে ভেঙেছে,' শক্ত হয়ে গেছে তার বাদামী, লম্বাটে মুখটা।

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে বললো কিশোর। 'কাঁপুনিটা টের পেয়েছি। তখন ভূমিকম্প মনে করেছিলাম। নিশ্চয় বিকেল পাঁচটার পর ফাটিয়েছে, গার্ডেরা বাড়ি চলে যাওয়ার পর।'

ফোকরটা দিয়ে মসবি হাউসের পাতালঘরে ঢোকা যায়। ঢুকলো ওরা। টর্চের আলো ফেলে সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করলো কিশোর। সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। নানারকম বাক্স স্তূপ করে রাখা হয়েছে। বেসমেন্টে একটা ফারনেস রুম আছে। আরেকটা ঘরে রয়েছে মেশিনপত্র, যেসব ঘরে ছবিটবি রয়েছে, সেসব ঘরের তাপমাত্রা একই রকম রাখার ব্যবস্থা। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো ডিলন আর তিন গোয়েন্দা, তারপর ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোলো। সঙ্গে চললো এলিজা। ওদের গা ঘেঁষে থাকতে চাইছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

একটা হলঘরে ঢুকে চিৎকার করে ডাকলো কিশোর, 'মিস্টার কলিগ?'

সাড়া এলো না।

'নেই হয়তো,' মুসা বললো। 'ডিনামাইট ফাটানোর আগেই বেরিয়ে গেছেন।'

নিচতলায় একঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকতে লাগলো ওরা। যেখানে যা যেমন ছিলো তেমনি রয়েছে। বার বার কলিগের নাম ধরে ডাকা হলো। জবাব মিললো না। পুরো বাড়িটা নীরব। কেউই যেন নেই।

স্টেবিন কলিগ কোথায় গেলেন? বাইরে বেরিয়েছেন? নাকি মিউজিয়মেই আছেন? নাকি তাঁকেও কোথাও আটকে রাখা হয়েছে, তিন গোয়েন্দার মতো? গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের। লোকগুলো নিষ্ঠুর! 'মিস্টার কলিগ?' আরেকবার ডাক দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো সে।

দ্বিতীয় ঘরটাকে যেন ছিলে নগ্ন করে ফেলা হয়েছে। ভারমিয়ারের আঁকা ছবি নেই। পাশের ঘরের র‍্যামব্র্যাণ্ডৎ, ভ্যান ডাইক আর রুবেনগুলোও গায়েব। উজ্জ্বল রঙে জ্বলজ্বল করতো যেসব পুরনো ফ্লেমিশ ছবি, সেগুলোও নেই। যে ঘরেই ঢুকছে ওরা, সব খালি।

'অনেক টাকা!' কিশোর বললো। 'অনেক টাকার ছবি চুরি করে নিয়েছে!'

শাদা শূন্য দেয়ালগুলোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রয়েছে এলিজা। 'সমস্ত মসবি কালেকশন!' ফিসফিস করে বললো সে। 'ব্রড আর নরিটা! সব, সঅব একদলে! সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে ওরাই! ...তাহলে...তাহলে নিউম্যানই কাকতাড়ুয়া...'

থ্যাপ থ্যাপ শব্দ হলো মাথার ওপরে।
'ওই তো!' চিৎকার করে দৌড় দিলো কিশোর।
একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলো সে। যেখানে রয়েছে মিস্টার কলিগের ওয়ার্কশপ আর ব্যক্তিগত ঘর। জোরালো হয়েছে আওয়াজ। কিশোরের পেছনেই রয়েছে রবিন আর মুসা। সিঁড়ির বাঁয়ের ছোট বেডরুমের ভেতরে ঢুকে একটা আলমারির দরজা খুললো।
পাজামার নেয়ার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে মিস্টার কলিগকে। মুখ বেঁধেছে তোয়ালে দিয়ে।
'শান্ত হোন, মিস্টার কলিগ,' বাঁধন খোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'আর ভয় নেই।'

আঠারো

'হচ্ছেটা কি এখানে! কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' হুইল চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন মিসেস রোজারিও। খামচে ধরলেন পায়ের ওপর ফেলে রাখা কম্বলটা। দু'চোখে তীক্ষ্ণ কৌতূহল।
'আপনার জন্যেই ভয় পাচ্ছিলাম, মিসেস রোজারিও,' ডিলন বললো। একটা আর্মচেয়ারে বসেছে লম্বা মানুষটা। আরও চারটে চেয়ারে বসেছে এলিজা আর তিন গোয়েন্দা। পাতালঘরে অনেক মানুষের নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেই। পুলিশের লোক। ছবি তুলছে, সূত্র জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। রাস্তার ওপাশে মসবি হাউসে ব্যস্ত আরেকদল পুলিশ।
'নিউম্যানদের কি হলো?' জানতে চাইলেন মিসেস রোজারিও। 'এলিজা, খাবার সময় যে হয়ে গেল। চা-ও দিয়ে গেল না কেউ।'
'কেটলি চাপিয়ে দিয়ে আসি,' এলিজা বললো। কিন্তু উঠলো না। আরও আরাম করে গা এলিয়ে দিলো আর্মচেয়ারে। ডিলনের পাশে বসেছে। কৌতূহলী হয়ে বার বার তাকাচ্ছে পুল মেরামতকারীর দিকে। শেষে বলেই ফেললো, 'এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলেন? আপনি খুব চালাক!'
লাল হয়ে গেল ডিলনের মুখ। 'আরে না না, কি যে বলেন! আসলে মিসেস রোজারিওর জন্যে ভাবনা হচ্ছিলো আমার।'
'আমাকে নিয়ে অনেক ভাবো তুমি, জন,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু কেন ভাবো?'
'ওই ব্রড নিউম্যান লোকটাকে ভালো মনে হয়নি আমার শুরু থেকেই,' ডিলন বললো। 'সে-কারণেই এই বাড়ির ওপর চোখ রাখতাম। লোকটা আসার পর থেকেই কেমন যেন সব কিছু বদলে যেতে লাগলো।'
'তা বদলেছে,' মেনে নিলেন মিসেস রোজারিও। 'তবে বদলে ভালো হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো আবার কিছু সত্যিকারের কাজের লোক ঢুকেছে এবাড়িতে। ভালো চাকর থাকার অনেক সুবিধে। কল্পনা করতে পারবে না তুমি, এলিজা, কি কষ্টটাই না হয়েছে। তোমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে ছ'সাত

জোড়া কাজের লোক বদলেছি আমি, সন্তুষ্ট হতে পারিনি। নিউম্যানরা আসার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।'

'আপনার ওই এতো ভালো চাকরগুলো মোটেও ভালো লোক নয়,' কলিগ বললেন। 'চোর!' সুড়ঙ্গের কথা জানালেন তিনি।

'কি বলছেন!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মিসেস রোজারিও। 'আপনি বলতে চাইছেন ওরা ওই সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে! অসম্ভব! কখন করলো একাজ! সময়টা পেলো কোথায়?'

'হয়তো রাতের বেলা, মিসেস রোজারিও,' কিশোর বললো। 'যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকতেন।'

'আর বোলো না! শুনতে ভাল্লাগছে না এসব ফালতু কথা! রাতের বেলা যদি খালি সুড়ঙ্গই খুঁড়বে, ঘুমাতো কখন ওরা? না ঘুমিয়ে কি মানুষ থাকতে পারে? কতোদিন পারে?'

'রোজ রাতে তো আর খুঁড়তে যেতো না,' ডিলন বললো। 'মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও খুঁড়তো। সেজন্যেই আমাকে বিদেয় করা হয়েছিলো। যাতে সুযোগ পায়।'

'বুঝলাম না। ব্রড তো বললো, তুমি আর কাজ করতে পারবে না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছো। তখন অন্য লোকটাকে বহাল করলো। অল্পবয়েসী লোকটাকে।'

'ব্রড আমাকে বের করে দিয়েছে,' ডিলন বললো। 'অনেক ক্ষমতাই তো দেয়া হয়েছিলো তাকে। অকাজে লাগিয়েছে সেসব। একদিন সকালে দেখলাম বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে, পরনে কাজের পোশাক। একটা ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মাটি নিয়ে বেরোচ্ছে। একজন খানসামা কিংবা হাউসম্যানকে কে কবে শুনেছে পাতালঘর থেকে ঠেলাগাড়িতে করে মাটি নিয়ে বেরোতে? কৌতূহল হলো। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মাটি আনলো কোত্থেকে। সে বললো, পাতালঘরের একটা দেয়াল নাকি ধসে পড়েছে। মাটি পড়ে স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝেতে। পরিষ্কার করে ফেলছে।

'বিশ্বাস করলাম না। এবাড়ির বেসমেন্টে বহুবার ঢুকেছি আমি। দেয়াল এতো নরম নয় যে খামোকাই ধসে পড়বে।
বললাম সেকথা। রেগে গিয়ে আমাকে বের করে দিলো সে।'

'ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছিলো বটে, তবে সেটা বোধহয় আপনিই দিয়েছিলেন মিসেস রোজারিও। কারণ সব কিছু দেখাশোনার ভার তো আপনারই ওপর। ভাবলাম, আপনার অনুমতি নিয়েই চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সে। এতো বছর ধরে আছি, এভাবে এককথায় বের করে দেবেন, বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। বেল বাজাতে খুললো নরিটা। বললো, আপনি ঘুমোচ্ছেন। বিরক্ত করা চলবে না। তারপর যতোবার দেখা করতে চেয়েছি, বাদ সেধেছে সে। টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছি। ফোন ধরেছে ব্রড কিংবা নরিটা। আপনার সঙ্গে লাইন দেয়নি। দু'বার চিঠিও লিখেছি। মনে হয় আপনার হাতে পড়েনি ওগুলো।'

মাথা নাড়লেন মিসেস রোজারিও। 'বলো কি! আমাকে গৃহবন্দী করে

রেখেছিলো দুটো চোর! মেরেও ফেলতে পারতো!'

'না, তা করতে সাহস করতো না। তবে আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার। কাজেই নজর রাখতে শুরু করলাম। রক রিম ড্রাইভের ওই পুরনো বাড়িটা থেকে। রোজ এসে ওখানে উঠতাম। যতোক্ষণ বারান্দায় থাকতেন আপনি, আমিও থাকতাম। আমার মনে হয়েছিলো, আপনি যতোক্ষণ ঠিক থাকবেন সব কিছুই ঠিকঠাক থাকবে।

'তারপর এলো সেই টেকো লোকটা। শস্যখেতে ফসল বুনলো। আর ওই সময়ই এবাড়ির পুরনো মালী, হ্যারি হোলসামকে বের করে দেয়া হলো বিনা নোটিশে, বিশ বছর ধরে যে চাকরি করেছে এখানে। অত্যন্ত বিশ্বাসী একজন লোক।'

'ওকে আমিই বের করেছি,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'বয়েস হয়ে গিয়েছিলো। কাজকর্ম আর ঠিকমতো করতে পারছিলো না। তাছাড়া তারও আর কাজ করার ইচ্ছে ছিলো না।'

'জানি। বহুদিনের পুরনো লোক, তাই মায়া কাটাতে কষ্ট হচ্ছিলো। কাজ করার খুবই ইচ্ছে ছিলো তার, কিন্তু নিউম্যানদের সে-ও সহ্য করতে পারেনি।' আগের কথায় খেই ধরলো ডিলন, 'হ্যা, যা বলছিলাম। বিদেশ থেকে বাড়ি এলেন মিস ওয়াগনার। রোজই তাঁকে দেখতাম বারান্দায় বসে আছেন। কেমন যেন একা হয়ে গেছিলেন আপনারা দু'জনে। কেউ দেখা করতে আসতো না। শুধু মিস্টার কলিগ, আর ফসল করেছে যে টেকো লোকটা সে বাদে।'

'আমার কথা বলা হচ্ছে নাকি?' দোড়গোড়া থেকে বলে উঠলেন কীটপতঙ্গ বিশারদ। 'পুলিশ আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে, সারাদিন কোথায় ছিলাম। জানিয়ে দিয়েছি। তারপর বললো, এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে বসে অপেক্ষা করতে। মনে হচ্ছে আর থাকা চলবে না আমার। এবার বের করে ছাড়বে।'

জন ডিলনের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নোয়ালেন রেন। 'আপনার কথায় বাধা দিলাম বোধহয়?'

লাল হয়ে গেছে ডিলনের গাল। ডক্টরকে টেকো বলে ফেলেছে, এবং সেটা তিনি শুনে ফেলেছেন বলে। আরেকদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কথা শেষ।'

'এতোই যদি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকো তুমি,' এলিজা জানতে চাইলো। 'এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেই পারতে! কথা বলতে পারতে!'

'আসার ইচ্ছে তো ছিলোই,' ডিলন বললো। 'কিন্তু বললে যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন? তা-ও সাহস করে একদিন রওনা হয়ে পড়লাম। পড়ে গেলাম ছেলেগুলোর সামনে,' মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে তিন গোয়েন্দাকে দেখালো সে। 'তাড়া করলো। ভয়ে পালালাম।'

'কিন্তু কাকতাড়ুয়ার ব্যাপারটা কি? ওটাকে তো দেখেছেন। কি ভেবেছেন?'

'একমাত্র কাকতাড়ুয়া আমি যেটা দেখেছি, সেটা শস্যখেতের বেড়ার ওপরে দাঁড় করানো। আর কিছু দেখিনি,' হাত নাড়লো ডিলন। 'তবে একটা কথা জোর গলায় বলতে পারি। ছেলেগুলো যখন এখানে এসে ঘোরাঘুরি শুরু করলো, খুশি

হলাম। ওরা এসে আপনার সঙ্গে কথা বললো। তারপর আসতেই থাকলো। বাইরের লোকের সঙ্গে তো যোগাযোগ ছিলো না আপনার, ওরাই শুধু আসে।' ছেলেদের দিকে ফিরে বললো, 'আজ যখন এসে ফিরে গেলে না, অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ব্রড তোমাদের সাইকেলগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলো গ্যারেজে। অনেকক্ষণ ধরে মিস ওয়াগনারকে বারান্দায় দেখলাম না, মিসেস রোজারিওকে দেখলাম না। খুঁতখুঁত করতে লাগলো মনটা। তাকিয়েই রইলাম। ব্রড চলে গেল। ফিরে এলো ভাড়া করা একটা ট্রেলার নিয়ে।

'কৌতূহল আরও বাড়লো। একজন খানসামা ট্রেলার দিয়ে কি করবে? তাকিয়ে রইলাম। ঘণ্টা দুই পর ব্যাগ স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে তাতে গিয়ে উঠলো ব্রড আর নরিটা। আরও অনেক মালপত্র নিলো, চিনতে পারলাম না। আসলে অতো দূর থেকে দেখে বোঝা যায়ও না।'

'ওগুলো?' কলিগ বললেন। 'ওগুলো কয়েক কোটি ডলার দামের সুন্দর সুন্দর ছবি!'

'যা-ই হোক, আমার কাছে অদ্ভুত লাগলো জিনিসগুলো। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে চলে এলাম ওয়াগনার ম্যানশনের কাছে। সামনে দিয়ে ঢুকতে গেলে যদি আবার আটকে দেয়, ঢুকতে না দেয়, এই ভয়ে বারান্দা দিয়ে উঠে একটা জানালা গলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।'

'এবং আমাকে জাগালে,' এলিজা বললো। 'আমরা দু'জনে গিয়ে জাগালাম মিসেস রোজারিওকে। ছেলেগুলোকে দেখলাম না কোথাও। খুঁজতে লাগলাম। শেষে তোমার মনে পড়লো পাতালঘরের কথা, সেখানকার রেফ্রিজারেটর রুমের কথা।'

'ভাগ্যিস মনে পড়েছিলো,' বললো কিশোর। উঠে চলে গেল ফায়ারপ্লেসের কাছে। ম্যানটেলের ওপরে দেয়ালের দিকে চোখ। ভারমিয়ারের যে কপিটা রয়েছে, ফ্রেমে বাঁধানো, তার চারপাশের দেয়ালে কাগজের রঙ উজ্জ্বল, বাকি অংশের মতো নয়। 'ব্রড আর নরিটাকে বাধ্য করেছি আমরাই, আজকেই কাজ সেরে ফেলতে। নইলে এতো তাড়াহুড়া করতো না ওরা। আমরা সুড়ঙ্গটা দেখে ফেলার পর আর কিছু করার ছিলো না ওদের। আমাদেরকে সেলারে আটকে রেখে দ্রুত কাজটা সেরে ফেললো।'

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। 'শীঘ্রি সেলারের কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের। রিপোর্টাররা এসে পড়লো বলে। ওদের সঙ্গে দেখা করতে না চাইলে, বলুন, ঠেকানোর ব্যবস্থা করে ফেলি।'

'প্লীজ! তাহলে খুবই ভালো হয়,' অনুরোধের সুরে বললেন মিসেস রোজারিও। 'এলিজা, চায়ের পানি বসানো কিন্তু হলো না। এক কাপ চা পেলে খুবই ভালো হতো এখন।'

'ঠিক আছে, আমিই বানিয়ে আনছি,' বলে একটা মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেল কিশোর।

চট্ করে পরস্পরের দিকে তাকালো মুসা আর রবিন। ওরা লক্ষ্য করেছে, বেরোনোর আগে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো গোয়েন্দাপ্রধান। নিশ্চয় কোনো

সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। নতুন কি এমন ব্যাপার ঘটলো, যা নিয়ে এতো গভীরভাবে ভাবতে হচ্ছে?

কিছুই বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিলো মুসা। রবিন জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। কিশোর কি ভাবছে, সেটা বোঝা তো দূরের কথা, অনুমান করারও সাধ্যি ওদের নেই।

উনিশ

রান্নাঘরের টেবিলে বসে পানি ফোটার অপেক্ষায় রইলো কিশোর। একটা টেলিফোন রয়েছে টেবিলে। তারটা চলে গেছে ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে, জ্যাকটা ওখানে। ফোনের পাশে একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে, উল্টে ভাঁজ করা, ক্রসওয়ার্ড পাজলের পৃষ্ঠাটা বের করে রেখেছে। সেটা দেখেই কৌতূহলী হয়ে কাগজটা তুলে নিলো কিশোর। নিচে একটা প্যাড পড়ে রয়েছে।

কেউ আঁকাআঁকি করেছে প্যাডটায়। একটা হরতন এঁকে তীর দিয়ে সেটাকে বিদ্ধ করা হয়েছে। ডলারের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। আর কয়েকবার করে লেখা রয়েছে 'ভারমিয়ার' শব্দটা এবং একটা টেলিফোন নম্বর।

'বাহ্! নম্বরও আছে তাহলে!' আনমনে বিড়বিড় করতে করতেই তুলে নিলো রিসিভার। ডায়াল করলো। ওপাশে দু'বার রিঙ হতেই রিসিভার তোলার শব্দ হলো। একটা ভারি কণ্ঠ বললো, 'রবিনসন ট্রেলার কোম্পানি। কি সাহায্য করতে পারি?'

'করে ফেলেছেন,' বলেই রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। প্যাডের কোণে লেখা কয়েকটা শব্দের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো।

'মেরি কুইন,' পেন্সিল দিয়ে লিখেছে কেউ। 'পানামানিয়ান রেগ।'

গরম হয়ে শিস দিতে আরম্ভ করেছে কেটলির পানি। ফিরেও তাকালো না কিশোর। সন্তুষ্ট মনে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগলো।

'এই, কি করছো?' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। 'পানি তো ফুটছে! কালা নাকি?'

জবাব দিলো না কিশোর।

এগিয়ে গিয়ে স্টোভের নবে মোচড় দিয়ে আগুন কমিয়ে দিলো রবিন।

'কিশোর?' মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে রান্নাঘরের দরজায়। 'কি করছো তুমি? কি হয়েছে?'

'পেয়েছি!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো গোয়েন্দাপ্রধান। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগিয়ে বসেছিলো পুলিশ চীফের গায়ে। তাঁকে বলতেই যাচ্ছিলো।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন ফ্লেচার।

'দেখুন!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে প্যাডটা বাড়িয়ে ধরলো কিশোর। হাত কাঁপছে। 'মেরি কুইন! দেখছেন? আর এই দেখুন পত্রিকায় রয়েছে জাহাজের খবর। মেরি কুইন, পানামায় রেজিস্ট্রি করা। আজ সন্ধ্যা সোয়া ছটায় স্যান পেড্রো থেকে

ছাড়বে। চীফ, আর এক ঘণ্টাও নেই।'

একটানে কিশোরের হাত থেকে প্যাডটা নিয়ে চীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে?'

'রান্নাঘরের টেবিলে। টেলিফোনের কাছে। একটা ফোন নম্বর রয়েছে, দেখছেন, রবিনসন ট্রেলার কোম্পানির। চীফ, ট্রেলারটা যে ভাড়া করেছে, সে ওই টেলিফোন দিয়েই ফোন করেছে। জেনে নিয়েছে মেরি কুইন কোথেকে কখন ছাড়বে, অবশ্যই পত্রিকা ঘেঁটে। অনেক জাহাজ কোম্পানিই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, জানা আছে তার। ব্রড আর নরিটা তাড়াহুড়ো করে এই প্ল্যান করেছে, ছবিগুলো দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবার। মেরি কুইন যেখানে যাবে সেখানেই যাবে ওরা। তারপর প্রয়োজন মনে করলে অন্য কোথাও।'

'হুঁ!'

'দেরি করবেন না, স্যার! ওদের ঠেকান!'

রান্নাঘরে ঢুকলেন চীফ। রিসিভার তুলে অপারেটরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন জলদি স্যান পেদ্রোর হারবার মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। লাইন পাওয়া গেল। জরুরী কণ্ঠে হারবার মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সব শেষে বললেন, 'আধ ঘন্টার মধ্যেই আসছি। আমি আসার আগে কিছুতেই জাহাজটাকে বেরোতে দেবেন না!'

রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

রান্নাঘরে এলেন স্টেবিনস কলিগ। 'মিসেস রোজারিও পাঠালেন, কি করছেন আপনারা দেখার জন্যে। চায়ের জন্যে এতো পাগল হয়ে যেতে আর কোনো মহিলাকে দেখিনি!'

'এখুনি বানিয়ে ফেলবে কিশোর,' চীফ বললেন। 'কলিগ, আপনাকে আমার দরকার।'

'কি বললেন?'

'আমার সঙ্গে স্যান পেদ্রোতে যেতে হবে। কিশোর ভাবছে, মেরি কুইন জাহাজে করে পালানোর চেষ্টা করছে চোরেরা। ফোন করে বলে দিয়েছি জাহাজটাকে যাতে আটকায়। আমি যাচ্ছি। আপনাকে যেতে হবে ছবিগুলো সনাক্ত করার জন্যে।'

'তাই নাকি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন কলিগ।

'আমরা যাবো না?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'অন্তত কিশোরকে তো নেয়া উচিত। সে-ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।'

'ছবিগুলো পাওয়া গেলে তাকেই প্রথম ফোন করবো,' চীফ বললেন। 'এখন যাওয়ার দরকার নেই। আসুন, মিস্টার কলিগ।' কিউরেটরের হাত ধরে প্রায় টেনে বের করে নিয়ে গেলেন তিনি।

'খুব অন্যায় করলেন!' দরজার দিকে তাকিয়ে বললো মুসা।

কিশোর কিছুই বললো না। স্টোভের নব ঘুরিয়ে আবার আগুন বাড়িয়ে দিলো। পানি ফুটলে কেটলি নামিয়ে এনে চা বানাতে আরম্ভ করলো। কাপ আর পিরিচ ধুয়ে আনলো রবিন। রেফ্রিজারেটর থেকে কেক আর স্যাণ্ডউইচ বের করলো মুসা।

ট্রেতে চা নাস্তা সাজিয়ে নিয়ে চললো মিসেস রোজারিওর ঘরে।

'এনেছো! আহ্, বাঁচলাম!' হাঁপ ছাড়লেন মিসেস রোজারিও। 'চায়ের জন্যে জানটা বেরিয়ে যাচ্ছিলো! এলিজা, তুমিও খাও। সারাদিন তো আজ প্রায় কিছুই পেটে পড়েনি।'

'আমার খিদে নেই।'

'আমার আছে। বাহ্, চমৎকার কেক! মিস্টার রেন, আপনিও নিন। জন, নাও। তোমরা নেবে না?' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রোজারিও। 'কলিগ কোথায়? চা খাবে না?'

'তাঁকে নিয়ে চীফ চলে গেছেন,' জবাব দিলো কিশোর। 'স্যান পেদ্রোতে যাবেন। মেরি কুইন জাহাজে করে ব্রড আর নরিটা পালাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে।'

হাত কেঁপে গেল মিসেস রোজারিওর। খানিকটা চা ছলকে পড়লো কোলের কাছে ধরা পিরিচে।

'চীফ নেই, তাতে কি?' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'আমরা তো কথা বলতে পারি, কি বলেন, মিসেস রোজারিও? দয়া করে এখন বলে ফেলুন তো, কিভাবে রাজি করিয়েছেন নিউম্যানদের? টাকাটা কিভাবে ভাগাভাগি হবে?'

বিশ

মিসেস রোজারিওর পাশের একটা সোফায় আধশোয়া হয়ে ছিলো এলিজা, ঝট্ করে সোজা হয়ে বসলো। 'কি বললে?'

'না, এই, মিসেস রোজারিওর সঙ্গে আলাপ করছি আরকি। ডাকাতির টাকা কিভাবে ভাগ হবে জানতে চাইছি,' নির্বিকার রয়েছে কিশোরের মুখ।

জানালার পাশে বসেছে মুসা আর রবিন। গাঢ় হচ্ছে গরমের গোধূলি, ঘরের জিনিসপত্র অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু কেউ উঠে গেল না আলো জ্বেলে দেয়ার জন্যে।

'আপনার জন্যেই সম্ভব হয়েছে ডাকাতিটা,' আবার বললো কিশোর। 'আপনি সাহায্য করাতেই। আপনাকে না জানিয়ে একাজ কিছুতেই করতে পারতো না ওরা।'

'বড় বেশি বাজে কথা বলছো তুমি, ইয়াং ম্যান,' মিসেস রোজারিও বললেন। 'চীফ আসুক, তারপর দেখছি। আর যাতে কোনোদিন এবাড়ির ত্রিসীমানায় পা রাখতে না পারো সেই ব্যবস্থা করবো।'

'হয়তো করবেন,' কিশোর বললো। 'তবে সেটা বুমেরাং হয়ে আপনাকেই আঘাত করতে পারে। হয়তো আপনার বিরুদ্ধে চলে গেল নিউম্যানদের স্বীকারোক্তি। তখন?'

'আশ্চর্য!' উঠে মিসেস রোজারিওর সামনে চলে গেল এলিজা। 'কেন একাজ করতে যাবে? সবই তো আছে তার। কিছু চাইলেই পেয়ে যায়। আমার ভাইকে বললে এনে দেয়। আমাদের পরিবারেরই লোক। এটাই তার বাড়ি।'

'কিশোর, বুঝেশুনে কথা বোলো!' হুঁশিয়ার করলেন ডক্টর রেন। এককোণে

শান্ত হয়ে বসে আছেন কীটপতঙ্গবিদ। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা আলোটা জ্বেলে দিলেন। 'ভদ্রমহিলাকে অপমান করার জন্যে বিপদে পড়তে পার তুমি!'

'না, পড়বো না। কারণ জেনেশুনেই বলছি আমি।'

হুইলচেয়ারে বসা মহিলার দিকে ঘুরে বসলো কিশোর। 'ছয় মাস দু'জন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করছেন আপনি। ওরা যে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে এটা না জানার কথা নয় আপনার। মাটি খোঁড়ার শব্দ আপনার কানে আসবেই। কারণ সুড়ঙ্গটা গেছে ঠিক আপনার ঘরের নিচ দিয়ে।'

'আমার ঘুম খুব গভীর।'

'সব সময় না। কাল রাতেও মিস্ ওয়াগনারকে আপনার কাছে রেখেছেন, ঘুম হচ্ছে না বলে। কিংবা ইচ্ছে করেই ঘুম না আসার ভান করেছেন। তাকে আটকে রেখেছেন আপনার ঘরে।

'আজ সকালে রবিনকে বলেছেন ঝাড়বাতিদানটার কথা, মসবি মিউজিয়মের ভারমিয়ার রুমের বাইরে যেটা ঝোলানো রয়েছে। দাদা ঘড়িটা বাজলে যে ঝাড়বাতিদানের প্রিজমগুলো কেঁপে ওঠে, সেকথা বলেছেন। মিস্টার কলিগের কাছে শুনেছি, ওটা তাঁর নতুন আবিষ্কার। আপনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন না। কি করে দেখলেন এবং জানলেন সেটা?'

চমকে গেছেন মিসেস রোজারিও। 'আ-আমি···আমি···মনে হয় স্টেবিনসই বলেছে আমাকে!'

'বিশ্বাস করতাম, যদি ছবিগুলো না থাকতো।'

'ছবি?'

'কাল রাতে এবাড়ির চারপাশে টহল দিচ্ছিলাম। কাকতাড়ুয়াটাকে দেখার জন্যে। জানালার পর্দা খুলে রেখেছিলেন আপনি। মিস্টার কলিগের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আপনি শোবার ঘরে চলে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'হয়তো গিয়েছিলাম। তাতে কি?'

'আপনার আলমারি খুলেছিলেন। আলমারির তাকে বাক্সগুলো দেখতে পেয়েছি আমি।'

'তাতেই বা কি?'

'তারপর আবার পর্দা টেনে দিয়েছিলেন আপনি। এরপর কি করেছেন আর দেখতে পারিনি। একটু পরেই বড় এক বাক্স ছবি নিয়ে সিটিংরুমে চলে এসেছেন আপনি।

'কাল রাতে ছবিগুলো নিয়ে ভাবার সময় পাইনি আমি। কারণ আপনি আসার পর পরই কাকতাড়ুয়াটাকে দেখতে পেলাম। আজ যখন আমাদেরকে কোল্ড রুমে আটকে রাখা হলো, তখন ভাবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। মিসেস রোজারিও, ওই বাক্সটা তাক থেকে কি করে নামিয়ে আনলেন আপনি?'

নাকমুখ কুঁচকে ফেলে যেন মনে করার চেষ্টা করলেন মিসেস রোজারিও। 'মনে হয় লাঠিটা দিয়ে নামিয়েছি। আলমারির কাছে সব সময় একটা লাঠি রেখে দিই। ওপরের তাক থেকে কিছু নামানোর দরকার হলে লাঠি দিয়ে গুঁতো

মেরে ফেলে দিই। তারপর লুফে নিই সেটা। বার বার কোনো জিনিসের জন্যে লোক ডাকাডাকি করতে ভালো লাগে না আমার।'

'না, তা করা সম্ভব নয়,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'অন্তত আপনার ওই ছবির বাক্সটার ক্ষেত্রে। ভারি বাক্স। গায়ে পড়লে ব্যথা লাগবে। তাছাড়া খুলে গিয়ে ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার কথা। না, মিসেস রোজারিও, লাঠি দিয়ে নয়, উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সটা পেরেছেন আপনি।'

'পাগল হয়ে গেছ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন মিসেস রোজারিও। 'আমি দাঁড়াতে পারি না। সবাই জানে একথা। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই আমি পঙ্গু।'

'আপনি জানতেন, কাকতাড়ুয়াকে কি রকম ভয় করে মিস ওয়াগনার,' মহিলার কথা যেন কানেই যায়নি কিশোরের। 'পোকমাকড়কে যে ভয় করে, তা-ও জানেন। মিসেস রোজারিও, ওই কাকতাড়ুয়া বানানোর পরিকল্পনা আপনার মাথা থেকেই বেরিয়েছে।'

'না!' চিৎকার করে উঠলো এলিজা। 'অসম্ভব! এ হতেই পারে না!'

'কিন্তু হয়েছে, মিস ওয়াগনার। খুবই সম্ভব। শুধু পরিকল্পনাই নয়, আমার জানা মতে একবার কাকতাড়ুয়াও সেজেছেন, তাই না, মিসেস রোজারিও?'

'তুমি একটা অসভ্য ছেলে!' কঠিন গলায় বললেন মিসেস রোজারিও। 'আর একটা কথাও শুনতে চাই না আমি। ঘুমোতে যাবো।'

'দাঁড়ান! আমার কথা এখনও…'

'হয়েছে কিশোর, যথেষ্ট হয়েছে,' বাধা দিলেন ডক্টর রেন। 'এতোক্ষণ যা যা বললে, সবই তোমার অনুমান। কোনো প্রমাণ নেই। এমন কিছুই দেখাতে পারোনি, যাতে বোঝা যায় তোমার কথা সত্য।'

'নিশ্চয় পারবো,' জোর গলায় বললো কিশোর। 'আসল কথাটাই বলিনি এখনও। শুনতে চান, মিসেস রোজারিও?'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস রোজারিও। এক ঝট্‌কায় হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে শোবার ঘরের দরজার দিকে রওনা হলেন।

'দাঁড়ান!' বলে উঠলো এলিজা।

ফিরে তাকালেন মিসেস রোজারিও। এলিজার চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলেন। 'আমাকে ঠেলে নিতে চাইছো তো? লাগবে না। একাই পারবো।' বলেই আবার চলতে শুরু করলেন। কেউ কিছু করার আগেই বেরিয়ে গেলেন। পেছনে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

'না না, সে করেনি!' আনমনে মাথা নেড়ে যেন নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করলো এলিজা। 'তার মতো পঙ্গু একজন অসহায় মহিলা একাজ করতেই পারে না! সম্ভব না…'

জোরে একটা চিৎকার শোনা গেল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। দৌড় দিলো মিসেস রোজারিওর শোবার ঘরের দিকে। কিশোর ছুটলো তার পেছনে। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছার আগেই ঝট্‌কা দিয়ে খুলে গেল আবার পাল্লা।

'শয়তান! জানোয়ার!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন

মিসেস রোজারিও। দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। হাঁপাচ্ছেন। হাতে একটা বালিশ। 'ইচ্ছে করে করেছিস একাজ!'

বালিশটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে ফেললো কিশোর। স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘরের প্রতিটি মানুষ। যেন পা নাড়ানোর ক্ষমতা নেই। আর এই সুযোগটাই নিলেন মিসেস রোজারিও। একছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল বাড়ির সামনের দরজা।

'হাঁটতে পারে! দৌড়াতে পারে!' নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না জন ডিলন।

'পঙ্গু নয়!'

একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ কানে এলো।

'এহ্হে!' এলিজা বললো, 'আমার গাড়ি! চাবি ফেলে এসেছিলাম! এজন্যে বকাও শুনতে হয়েছে মিসেস রোজারিওর। বললো···বললো এভাবে চলতে থাকলে একদিন না একদিন গাড়িটা চুরি হবেই।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন ডক্টর রেন।

কি দেখে এরকম করলেন মিসেস রোজারিও, দেখার জন্যে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো মুসা। পরক্ষণেই বিকট এক চিৎকার দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো। 'খাইছে! ডক্টর রেন, দেখে আসুন!'

তাড়াহুড়ো করে দরজার কাছে চলে গেলেন রেন। অন্যেরা তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে এসে উঁকি দিলো দেখার জন্যে।

ঘরের মেঝেতে পিলপিল করছে হাজার হাজার পিঁপড়ে। একটা খোলা জানালা দিয়ে এসেছে। খাটের পা বেয়ে বিছানার ওপর উঠে যাচ্ছে কতগুলো।

'আরেকটা কলোনি!' ডক্টরের কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'এজন্যেই পালিয়েছে। কে চায় পিঁপড়ের কামড় খেতে?'

একুশ

মাঝরাতে ফিরে এলেন ইয়ান ফ্লেচার আর স্টেবিনস কলিগ। ব্রড আর নরিটাকে হাজতে রেখে এসেছেন।

'ছবিগুলো পাওয়া গেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' কলিগ জানালেন। 'স্যান পেদ্রোতেই রেখে এসেছি। হারবার মাস্টারের দায়িত্বে। রাতটা থাকবে ওখানেই। কড়া পাহারা আছে। অসুবিধে হবে না। কাল গিয়ে নিয়ে আসবো।'

হাই তুললেন কিউরেটর। 'মিসেস রোজারিও কোথায়? শুয়ে পড়েছেন?'

কি ঘটেছে, তাঁকে জানালো এলিজা আর ডক্টর রেন। কিশোর তাঁকে কিভাবে রাগিয়ে দিয়ে বেডরুমে পাঠিয়েছে, তারপর পিঁপড়ে দেখে তিনি কিভাবে পালিয়েছেন, সব। পোকা মারার ওষুধ দিয়ে পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলেছেন রেন।

'গাড়ির নম্বর আছে। এখুনি সতর্ক করে দিচ্ছি হাইওয়ে পেট্রোলকে,' চীফ

বললেন। 'বেশি দূর যেতে পারবেন না মিসেস রোজারিও।'

'তিনি পঙ্গু নন?' অন্যদের মতোই বিশ্বাস করতে পারছেন না কলিগ।

'দৌড়ালো তো খরগোশের মতো,' হেসে বললো মুসা।

'কিন্তু ওরকম একটা অভিনয় কেন করলেন?' কলিগের প্রশ্ন। 'এতোগুলো বছর হুইলচেয়ারে কাটানো কি কম কষ্ট!' এলিজার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকার কি খুব দরকার ছিলো তাঁর?'

'একটুও না,' জবাব দিলো এলিজা। 'আমার আম্মা খুব বিবেচক ছিলো। উইল লেখার সময় সবার কথা মনে রেখেছে। বিশেষ করে মিসেস রোজারিওর কথা। তার পরেও কাকতাড়ুয়া বানাতে গেল মহিলা। দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস করবেন? তার আলমারিতে কাকতাড়ুয়ার পোশাক পেয়েছি।' চোখে আর পানি নেই এখন এলিজার, রাগে জ্বলছে। 'শয়তান মেয়েমানুষ! নিষ্ঠুর! আমাকে কি কষ্টটাই না দিয়েছে! অথচ আমি তাকে মায়ের মতো দেখতাম!'

'মনে হয় কোনোরকম ফাঁদে আটকে গিয়েছিলেন মহিলা,' কিশোর বললো। 'তাঁকে ধরে সব না শোনা পর্যন্ত শিওর হওয়া যাবে না। তবে অনুমানে অনেক কিছু বলতে পারি আমি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো কিশোর। ধীরে ধীরে বলে চললো সব কথা। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ না দিয়ে।

'মিসেস রোজারিও নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন মিসেস ওয়াগনার মারা যাওয়ার পর,' বললো সে। 'এই বাড়িটা খোলা রাখার আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না তখন। কিন্তু এটাই তখন মিসেস রোজারিওর বাড়ি। হয়তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এখানকার আরাম-আয়েস ছেড়ে গিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনো ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে উঠতে হবে। একলা মানুষ তিনি। বন্ধুবান্ধব তেমন নেই। কাজেই ওখানকার জীবন তাঁর জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এই ভয় করছিলেন।

'এই সময় ঘটলো অ্যাক্সিডেন্ট। কোমর ভাঙলেন তিনি। আর হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই সমস্ত কথা ভাবতেন। অনেকেই কোমর ভাঙে, পঙ্গু হয়। পঙ্গু হলো কি হলো না, সেটা প্রমাণ করতে পারে না ডাক্তাররা। মিসেস রোজারিও ভাবলেন, তিনি যদি দাঁড়াতে না পারেন, না পারার ভান করেন, কে প্রমাণ করতে যাচ্ছে? ডাক্তাররা কিছুই বুঝবে না। তিনি বলবেন তিনি দাঁড়াতে পারছেন না, কারো কিছু বলার নেই।'

'এবং তাতে মানুষের করুণা নিতে সুবিধে হয়!' তিক্ত কণ্ঠে বললো এলিজা। 'আমার ভাইকে বলে আবার বাড়িটা খুলিয়েছে। ওয়াগনারদের কেউ নেই তখন। কাজেই এবাড়ির সর্দার হয়ে বসলো মিসেস রোজারিও। চাকর-বাকরেরা সব তার কথায় ওঠবস করতে লাগলো। আমি এলেই তার ক্ষমতা নষ্ট হয়। সে কারণে যখন তখন আমার আসাটাও পছন্দ করতো না।'

'ছবি চুরির ব্যাপারটা, আমার যা মনে হয়,' কিশোর বললো, 'নিউম্যানরা আসার আগে ভাবেননি মিসেস রোজারিও। সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করলো ব্রড। আপনি এলেন। ওদের মুশকিলে ফেলে দিলেন। কাজেই কাকতাড়ুয়া আর পোকামাকড়ের ভয় দেখিয়ে আপনাকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো ওরা।

'মজার ব্যাপার হলো, একটা চমৎকার কোইনসিডেন্স, তিনজনেরই উচ্চতা প্রায় একই রকম। শরীর-স্বাস্থ্য প্রায় এক। কাজেই একই কাকতাড়ুয়ার পোশাক তিনজনেরই গায়ে লেগে গেল। পরস্পরের অ্যালিবাই হতে কোনো অসুবিধে হলো না ওদের।

'যে রাতে কাস্তে হাতে আমরা কাকতাড়ুয়া দেখেছি, সে রাতে মিসেস রোজারিও আর ব্রড নিউম্যান বাড়ির সামনে আপনার সঙ্গে ছিলো। সেদিন কাকতাড়ুয়া সেজেছিলো নরিটা। অন্ধকারে দৌড়ে আমাদের কাছ থেকে সরে চলে গিয়েছিলো বাড়ির পেছন দিকে। সেলারের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো। তারপর পোশাক খুলে রেখে গিয়ে তাড়াতাড়ি পুলিশকে ফোন করলো। চলে গেল লিভিং রুমে। বললো, জানালার বাইরে সে-ও কাকতাড়ুয়াটাকে দেখেছে। আমরা ভাবলাম, সারাক্ষণ ঘরেই বসে ছিলো সে।'

'কিন্তু যেদিন ডক্টর রেনের ল্যাবরেটরিতে আবার ঢুকেছিলো, সেদিন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'তুমি দেখলে কাকতাড়ুয়াটাকে। নরিটা ছিলো রান্নাঘরে, ব্রড সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে বসে টিভি দেখছিলো, আর মিসেস রোজারিও ছিলেন লিভিং রুমে মিস ওয়াগনারের সাথে।'

'হয়তো আদৌ টিভি দেখছিলো না ব্রড,' জবাব দিলো কিশোর। 'একটা ডামি বানিয়ে ফেলে গিয়েছিলো। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছে, টিভি দেখছে একজন মানুষ। সে জানতো, লিভিং রুমে থেকে পুলের ওপাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার দেখা যায়। তবে দূর থেকে ডামি আর মানুষ আলাদা করে চেনার জো নেই আবছা আলোতে। তাই ডামি বানিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলো ডক্টরের ল্যাবরেটরিতে, আর কিছু পিঁপড়ে চুরি করে আনতে।

'আর আজকে আমাদেরকে কোল্ড রুমে আটকেছিলেন মিসেস রোজারিও, কাকতাড়ুয়া সেজে গিয়ে। নিশ্চয় আমাদের সেলারে নামার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। কিংবা নরিটাও হতে পারে। তিনজন একই দলের লোক। কাজেই যাকে দিয়ে যা সুবিধে হয় তা-ই করানো হয়েছে।'

'কিন্তু মিসেস রোজারিওর তো কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিলো না,' প্রশ্ন তুললো এলিজা। 'কেন দুটো চোরকে ডেকে আনবে মসবি মিউজিয়ম লুট করার জন্যে?'

'আগেই বলেছি, প্রথমে একথাটা তিনি ভাবেননি,' কিশোর বললো। 'ফন্দিটা ব্রড আর নরিটার। ওরা চাকরিই নিয়েছে মিউজিয়মটার কাছে, ডাকাতি করার জন্যে। পঙ্গু মিসেস রোজারিওকে দেখে খুশি হয়েছে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে ভেবে। কারণ ওই অবস্থায় হুইল চেয়ার নিয়ে তিনি নিচে নামতে পারবেন না।

'তারপর একটা সময় জেনে ফেলেছে যে তিনি হাঁটতে পারেন। আর মিসেস রোজারিওও জেনে গেছেন ওদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কথা। দুই দলেরই দুর্বলতা রয়েছে। ফলে সমঝোতায় আসতে পেরেছে সহজেই। ওরা ব্ল্যাকমেল করেছে মিসেস রোজারিওকে, আর তিনি করেছেন ওদেরকে। ওরা কি করছে সেটা না জানার ভান করে থেকেছেন তিনি। বিনিময়ে ওরা ফাঁস করে দেয়নি যে তিনি হাঁটতে পারেন। আপনি যখন বাড়ি এলেন মিসেস ওয়াগনার, তখন একজোট হয়ে

গেছে ওরা। ওদের কাছে হুমকি হয়ে গেলেন আপনি। একটা কিছু বুদ্ধি করে আপনাকে তাড়ানোর চিন্তা করতে লাগলো। এই সময় টেলিভিশনে দেখালো "দ্য উইজার্ড অভ ওজ" ছবিটি। তা থেকেই কাকতাড়ুয়া বানানোর বুদ্ধিটা মাথায় ঢুকলো ওদের।'

'তাজ্জব ব্যাপার!' কলিগ বললেন।

'হ্যাঁ, মিস্টার কলিগ। তবে ওদের চেয়ে অনেক চালাক আপনি।'

'কী?'

'হ্যাঁ। আপনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে মিসেস রোজারিও ভারমিয়ারের একটা কপি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। বুঝতে পারেননি আসল জিনিসটাই তিনি চান।'

চট করে ম্যানটেলের ওপরের ছবিটার দিকে চোখ চলে গেল কলিগের।

'নিউম্যানদের সঙ্গে আরও কিছু চুক্তি হয়েছিলো মিসেস রোজারিওর,' কিশোর বললো। 'তিনিও একটা ভাগ নেবেন। শুধু একটা ছবি হলেই চলবে। একটা ভারমিয়ার।'

'ঈশ্বর!' চিৎকার করে বলতে গিয়েও কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেললেন কলিগ। উঠলেন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ছবিটার কাছে। ভালো করে দেখে বললেন, 'এটাই! মিউজিয়ম থেকে চুরি করে আনা! দেখেই চেনা উচিত ছিলো। কপিটার কি হলো?'

'পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ফায়ারপ্লেসে কয়েক টুকরো পোড়া ক্যানভাস পেয়েছি আমি। তুলে এনে রেখে দিয়েছি। যেটা দেখছেন এখন, সেটা সত্যিই মিউজিয়ম থেকে চুরি করে আনা হয়েছে, আজ। বন্দরে সব ছবি দেখলেন, অথচ ভারমিয়ারটা যে নেই, এটা আপনার নজর এড়িয়ে গেল। যে ভাববে তাকেই অবাক করবে ব্যাপারটা। তাই না?'

'আমি…আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম!'

'না, তা ছিলেন না। আসলে আজ বিকেলেই ছবিটা আপনি এখানে দেখেছেন। আপনার মতো মানুষের চোখে ছবি না পড়ার কথা নয়। ছবিটার চারপাশের দেয়ালের কাগজ যে কারো চোখে পড়তে বাধ্য, ভালো করে তাকালে। এটা দেখেই বুঝে গেলাম মিসেস রোজারিওও চোরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আগের ছবিটা আরেকটু বড় ছিলো। এটা কিছুটা ছোট। ফলে ফ্রেমের চারপাশে কাগজ বেরিয়ে আছে। ফ্রেমের নিচে চাপা পড়েছিলো বলে রঙ নষ্ট হয়নি, বাইরের অংশে যেমন মলিন হয়ে গেছে। আমি জানতাম নকল ছবিটার চেয়ে আসল ছবিটা ছোট। তাই অনুমান করতে কষ্ট হলো না, মিউজিয়মের আসল ছবি এখন মিসেস রোজারিওর ঘরে ঝোলানো। আর একটা উপায়েই সেটা তিনি পেতে পারেন। নিউম্যানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

'নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে ছবিটা, মিস্টার কলিগ। ছোট, তা-ও দেখেছেন। বুঝে গেছেন এটা মিউজিয়মেরই ছবি। তবু কাউকে কিচ্ছু বলেননি।'

'বললামই তো,' গাল চুলকালেন মিস্টার কলিগ। 'মিউজিয়মে ডাকাতি হয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। উত্তেজিত।'

'না, তা নয়। উত্তেজিত আপনি মোটেও হননি। বরং খুব শান্ত ছিলেন, যেটা অস্বাভাবিক লেগেছে আমার কাছে। তাছাড়া হাত-পা বেঁধে, মুখে তোয়ালে গুঁজে আলমারির ভেতরে পড়ে থাকা মানুষ এতোটা শান্ত থাকলে সন্দেহ হবেই। তখন থেকেই আপনার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। ছবিটার কথাও।'

'আমি···আমি আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম!'

শুনলোই না যেন কিশোর। 'মিসেস রোজারিও পালানোর পর ছবিটা দেখেছি আরও ভালোমতো। ক্যানভাসের রঙ আঠা আঠা। পুরনো ছবির যেমন শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়, তেমন নয়। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি মিসেস রোজারিও। হয়তো আসল ছবিটা তিনি কখনও ছুঁয়ে দেখেননি। আর নিউম্যানদের তো লক্ষ্য করার সময়ই ছিলো না।

'আসল ছবির জন্যে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন মিসেস রোজারিও। তাঁর মান সম্মান সব কিছু। হয়তো অন্যের বাড়িতে অন্যের দয়ায় থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই তিনি চাইছিলেন এমন কিছু, যা থেকে মোটা টাকা আসবে। বাকি জীবনটা আরামে কাটাতে পারবেন। এতো ঝুঁকি নিয়ে কি তিনি পেলেন? একটা জাল ছবি।

'মিস্টার কলিগ, মিসেস রোজারিও যখন একটা জাল ছবি পেয়েছেন, ব্রড আর নরিটাও একই জিনিস পেলে, খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? এমন একজন মানুষের আঁকা ছবি, যিনি হুবহু আসলের মতো করেই এঁকে ফেলেন?'

থেমে দম নিলো কিশোর। তারপর আবার বলতে লাগলো, 'শুক্রবারে আপনার বেড়াতে যাওয়ার কথা। সবগুলো জাল ছবি ঝুলিয়ে দিয়ে আসলগুলো নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলেন আপনি। আজকের চুরির পর আর আপনার ঘাড়ে কোনো দোষ পড়তো না, ছবিগুলো পাওয়া না গেলে। আর সে-জন্যেই মিসেস রোজারিওর ঘরের ছবিটার প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাননি। তাহলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো আপনার।

'আর এই কারণেই নিউম্যানদের কাছ থেকে ছবিগুলো উদ্ধারের পরেও ভারমিয়ারটা যে নেই একথা বলেননি কাউকে। ভেবেছিলেন, পরে খুঁজে বের করবেন। আর যেহেতু ডাকাতি হয়েছে, একআধটা ছবি পাওয়া না গেলেও আপনার ঘাড়ে দোষ চাপাতে যেতো না কেউ। তেমন মনে করলে আসল ভারমিয়ারটা মিউজিয়মের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন আবার। আছে তো আপনার কাছেই। কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে আপনি এই কাজ করেছেন।

'কিন্তু আপনার কপাল খারাপ। সমস্ত ছবি এখন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে। বাঁচতে আর পারবেন না। আসল ছবিগুলো কোথায়, মিস্টার কলিগ? আপনার সান্তা মনিকার অ্যাপার্টমেন্টে?'

ম্যানটেলের ওপরে ঝোলানো ছবিটার কাছে এসে দাঁড়ালেন ইয়ান ফ্লেচার। ছবির এক জায়গায় আঙুল ছুঁইয়ে জোরে চাপ দিলেন। চোখের সামনে নিয়ে এলেন আঙুলটা। একবার তাকিয়েই বলে উঠলেন, 'একটা সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন কলিগ। পারলে চোখের আগুনেই ভস্ম করে ফেলেন। 'বি-বিচ্ছু ছেলে! ইবলিস!'

গায়েই মাখলো না কিশোর। 'নিউম্যান আর মিসেস রোজারিওর জন্যে দুঃখই হয় আমার। বেচারারা এতো ঝুঁকি নিয়েও কিছুই পেলো না। একগাদা জাল ছবির জন্যে এখন জেল খাটতে হবে। কল্পনাও করতে পারেনি একজন মাস্টার জালিয়াতের কবলে পড়ে এমন একটা ছ্যাঁক খাবে।'

বাইশ

'অপরাধ ঢেকে রাখা খুব মুশকিল,' মন্তব্য করলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

তাঁর অফিসে বসে আছেন। বিশাল ডেস্কের ওপর খোলা পড়ে আছে রবিনের দেয়া ফাইলটা। সবটাই মন দিয়ে পড়েছেন। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আরেকবার কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি তোমাদেরকে। একই সঙ্গে দুই দল চোর অপারেশন চালাচ্ছে যে একথা আন্দাজ করা সহজ কাজ নয়। একের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হতে হলো অন্য দলটাকে। নিউম্যানরা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে, অত্যন্ত সাদামাঠা ব্যাপার। ওদের তুলনায় কলিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধি অনেক বেশি।'

'আসল আর নকল বোঝা খুবই কঠিন,' রবিন বললো। 'এখন বুঝতে পারছি, আসল ছবির আকারে কেন ছবি আঁকার অনুমতি দেন না মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ। কিছুটা বড় কিংবা ছোট করে আঁকতে বলেন।'

'জালিয়াতির ভয়ে,' পরিচালক বললেন। 'যাই হোক, ফাইলটা মন দিয়ে পড়লাম। চমৎকার একটা কেস। আজব কাকতাড়ুয়া! তবে তোমরা যে গিয়ে এই কেসে জড়িয়েছো, তা জেনে মোটেও অবাক হইনি আমি। রকি বীচের এতো কাছে এরকম একটা রহস্যময় কাণ্ড ঘটতে থাকবে, আর তিন গোয়েন্দার নেক নজরে পড়বে না, এ-কি হয়?'

হাসলো রবিন।

ফাইলটা বন্ধ করে রবিনের দিকে ঠেলে দিলেন পরিচালক। 'কাহিনীটা ভালো লেগেছে আমার। ছবি করা যায় কিনা ভাববো। তবে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানা দরকার। যেমন ধরো, ব্রড আর নরিটা কি করে একজন ইংরেজ লর্ডের মতো সম্মানিত লোকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র আনতে পারলো?'

'ওদের আসল নাম নিউম্যান নয়, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর। 'আসল নাম ক্লাইভ।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। রবার্ট ক্লাইভ। তার স্ত্রীর নাম ডলিনা ক্লাইভ। জন্ম ইভিলিন বেলরিজে। অনেক ছদ্মনাম রয়েছে ওদের। চুরি করার লম্বা আন্তর্জাতিক রেকর্ড রয়েছে।

'ইংল্যাণ্ড থেকে প্লেনে করে আসছিলো দু'জনে। পরিচয় হয় আরেক দম্পতির সঙ্গে। আসল নিউম্যান দম্পতি। ইংরেজ লর্ডের বাবুর্চি আর খানসামা। অনেক দিন কাজ করে অবসর নিয়ে চলেছিলো ফ্লোরিডায়, বাকি জীবন কাটাতে। নিউ ইয়র্কে প্লেন বদল করে ওরা। ওদের সঙ্গে কথা বলে এটা বুঝে ফেলেছে ক্লাইভ, যে আমেরিকায় কোনো বাড়িতে কাজ করার জন্যে রেফারেন্সের দরকার হলে

নিউম্যানদেরকে সেটা অবশ্যই দেবেন লর্ড কপারফিল্ড। পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে লর্ডের নাম ঠিকানা লিখে রেখে দিয়েছিলো সে। চলে এসেছিলো লস অ্যাঞ্জেলেসে।

'তখন, কিংবা তার আগে থেকেই হয়তো মসবি মিউজিয়ম লুট করার প্ল্যান করে ফেলেছে ওরা। সময় নষ্ট করেনি। ইংল্যাণ্ড থেকে আসার হপ্তাখানেক পরেই চলে গেল বেভারলি হিলের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে। পুলিশ চেক করে দেখেছে, ওয়াগনার হাউসে আসার আগে কয়েকটা চাকরির অফার ফিরিয়ে দিয়েছে ক্লাইভ দম্পতি, অবশ্যই নিউম্যানদের ছদ্মবেশে। ওগুলোর বেতনও ছিলো ওয়াগনার হাউসের চেয়ে অনেক বেশি।'

'তারমানে,' পরিচালক বললেন। 'ওরা অপেক্ষাই করছিলো ওয়াগনার হাউসে ঢোকার জন্যে। ভাগ্য ভালো, তাড়াতাড়িই পেয়ে গেছে। বছরখানেকও অপেক্ষা করতে হতে পারতো ওদের। মিসেস রোজারিও চাকর-বাকর বেশি তাড়াতো বলেই এতো জলদি পেয়ে গেছে।'

'শুধু মসবি হাউসে লুট করার আশায় বসে থাকেনি ক্লাইভেরা,' কিশোর বললো। 'লস অ্যাঞ্জেলেসের অনেক বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করেছে, যেগুলোতে লোক দরকার হয়। আর ওসব জায়গায় চুরি করারও অনেক জিনিস আছে। এই যেমন অলংকার, ছবির মতো দামী দামী জিনিস।'

মাথা দোলালেন পরিচালক। 'হুঁম! এরকম লিস্ট রেখে আরেকটা ভুল করেছে। তবে অপরাধীরা ভুল করে বলেই ধরাও পড়ে। লিস্ট করার আগেই অবশ্য আরেকটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলো ওরা। লর্ড কপারফিল্ডকে ফোন করেছে, রেফারেন্স জোগাড়ের জন্যে। যদি আসল নিউম্যানরা ফোন করতো কোনো কারণে? তাহলে এজেন্সি যে ফোন করেছিলো তাঁকে, সেটার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারতেন তিনি।'

'উঠেছেন। ওরকম ব্যাপার ঘটে গেছে। মিউজিয়মে যেদিন চুরি হয়েছে, তার আগের দিন এজেন্সিকে ফোন করেছিলেন লর্ড। এজেন্সি সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রোজারিওকে ফোন করে সাবধান করে দিয়েছে যে নিউম্যানদের ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ওরা আসল লোক না-ও হতে পারে। তিনি বলে দিয়েছেন, না হলে নেই, তাতে কিছু এসে যায় না। এরকম কাজের লোক আর জীবনে পাননি। লোক যে-ই হোক, কাজ পেলেই তিনি খুশি।'

'দুর্ভাগ্য মহিলার,' পরিচালক বললেন। 'একেবারে কুক্ষিগত করে ফেলেছিলো তাকে শয়তান লোকগুলো।'

'নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই টেনে এনেছেন, বেশি লোভ করতে গিয়ে। নইলে পঙ্গু সাজার কি দরকার ছিলো? মহিলার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়। সান্তা বারবারায় পুলিশ তাঁকে ধরেছে। পেট্রোল ফুরিয়ে গিয়েছিলো। টাকাপয়সা সঙ্গে নিতে পারেননি। পেট্রোল কেনার জন্যে পাম্পে একটা আংটি দিতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ হলো ওদের। মহিলার আচরণে। পুলিশকে ফোন করলো ওরা।'

'কি শাস্তি হবে, কিছু বলেছে পুলিশ?'

'জেলে যাবেন না। বয়েসটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আগের নো

ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। তাঁর জন্যে একজন উকিলও ঠিক করেছে এলিজা ওয়াগনার। বদমেজাজী, কোনো সন্দেহ নেই, তবে মনটা খুবই ভালো মেয়েটার। প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, মিসেস রোজারিওর জন্যে মনই খারাপ হয়ে গেছে তার।'

'হ্যাঁ, ভালো মেয়ে, বোঝাই যাচ্ছে।'

'কাকতাড়ুয়ার এই ব্যাপারটা অনেক বদলে দিয়েছে এলিজাকে। ঠিক করেছে, আর ইউরোপে ফিরে যাবে না। চ্যাপারাল ক্যানিয়নেই বাস করবে। নতুন করে চাকর-বাকর জোগাড় করে নেবে। বাড়ির দেখাশোনার ভার নিজেই নেবে। সময় কাটাবে নানা রকম সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে। ইতিমধ্যেই কথা বলে ফেলেছে ইউ সি এল এল-এর মেডিক্যাল সেন্টারের সঙ্গে। ভলানটিয়ারের কাজ করতে চায়।'

'হুঁ, পাগলামি সেরে যাচ্ছে আরকি।'

'তবে একটা ব্যাপার এখনও একই রকম রয়েছে, বদলায়নি,' মুসা বললো। 'পোকামাকড়। এখনও দেখলে ঘাবড়ে যায়। মৌমাছি দেখেই সেদিন যা চিৎকার শুরু করেছিলো। পোকামাকড়ের ভয়টা কোনোদিনই যাবে না ওর।'

'ভালো কথা মনে করেছো,' হাত তুললেন পরিচালক। 'ডক্টর রেন? তাঁর কি অবস্থা? এখনও ওখানেই আছেন?'

'আছেন,' কিশোর বললো। 'পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরেন। আর জন ডিলনকে আবার পুল ম্যান হিসেবে চাকরিতে বহাল করেছে এলিজা।'

'ভেরি গুড,' খুশি হলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'চমৎকার একটা উপন্যাসের হ্যাপি এনডিং-এর মতো। তবে রহস্য কাহিনী তো, একটু অন্যরকম। যা-ই হোক, বেশ মজার। গল্পটায় নূতনত্ব আছে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার,' মুসা বললো। 'ওরকম পাজি কাকতাড়ুয়ার পাল্লায় জীবনে পড়িনি। কোনোদিন আর পড়তেও চাই না। ভাগ্যিস ওটা মানুষের কাজ, ভূতপ্রেত নয়!'

'ভূতের ভয়টা তোমার এখনও গেল না। এতো কারাত আর জুডো শিখেও।'

'ওগুলো স্যার মানুষের ওপর খাটানো যায়, ভূতের গায়ে লাগে না। বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে ঘাড়টা ধরে মটকে দেবে। ওরকম করে মরার চেয়ে ভয় পেয়ে বেঁচে থাকাও অনেক ভালো।'

'তা যা বলেছো,' মুসার দর্শন শুনে না হেসে পারলেন না মিস্টার ক্রিস্টোফারের মতো গম্ভীর মানুষও।

রবিন আর কিশোরের মুখেও হাসি।
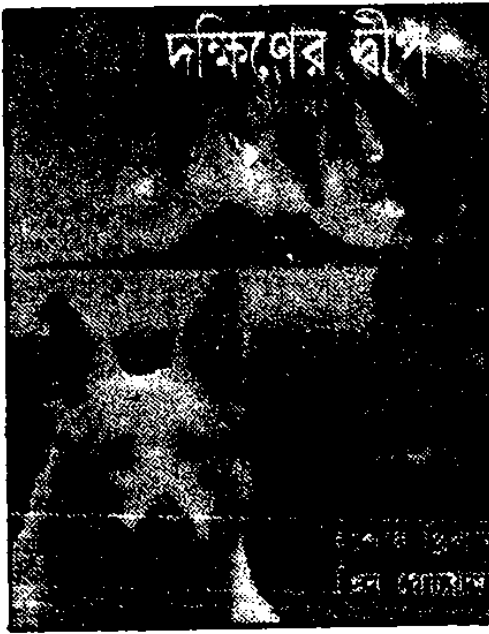
-ঃ শেষ ঃ-

দক্ষিণের দ্বীপ

প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৯২

বসন্তের এক চমৎকার সকাল। ওমর শরীফ—তিন গোয়েন্দার ওমর-ভাইয়ের সঙ্গে হেঁটে চলেছে কিশোর আর মুসা, রকি বীচ এয়ার ক্লাবের দিকে। বিমানে উড়বে, তারপর ওখানেই দুপুরের খাবার সারার ইচ্ছে ওদের। বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে রানওয়ে আর অন্যান্য বাড়িগুলো। পাশে একটা পার্ক। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। পার্কের ভেতর দিয়েও যাওয়া যায়। সেদিক দিয়েই চললো ওরা, সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে মাখতে মাখতে। টুইই টুইই করে একটা নাম না জানা পাখি ডাকছে ফুলের ঝাড়ে, দেখা যায় না।

এতো ভালো লাগছে, পার্ক থেকেই বেরোতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। তবে বিমানে ওড়াটাও কম মজার নয়। সুযোগ পেলেই আসে এখানে, ওড়া চর্চা করে।

ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে। খাটো, একহারা শরীর, ক্লিন শেভ, ইটের মতো লাল চুল ছোট করে ছাঁটা, রোদে পোড়া চামড়া। মুখ দেখলে মনে হয় কোনো কথা বললেই বুঝি মারমুখো হয়ে উঠবে। তোবড়ানো একটা ব্রায়ার পাইপ দাঁতে কামড়ে রেখেছে। তাকিয়ে আছে সবুজ মাঠের দিকে, যার বুক চিরে চলে গেছে রানওয়ে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে নজর ফিরিয়ে নিয়েছিলো ওমর, কি মনে হতে আবার তাকালো। থমকে দাঁড়ালো সে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'আরে, ডজ না! হ্যাঁ, ডজ ম্যাকমবার! তুমি এখানে কি করছো? এতোদিন পর! কেমন আছো?'

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিলো ছোটখাটো মানুষটা। তার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে। 'ওমর না! আমাদের সেই দুর্ধর্ষ ওমর শরীফ, মরুর বুনো ঘোড়া!'

'মনে আছে তাহলে?'

'থাকবে না আবার। তোমার মতো বেদুইন ডাকাতকে ভোলা যায় নাকি?' হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ।

হাতটা ধরলো ওমর। তারপর একটানে নিয়ে এসে বুকে ফেললো। জড়িয়ে ধরলো একে অন্যকে, বেদুইনের কায়দায় কোলাকুলি করে স্বাগত জানালো।

'তার পর? কেমন আছো, ভাই?'

'ভালো।'

আরও কিছু কুশল বিনিময়ের পর দুই কিশোরের দিকে তাকালো ডজ।

ওমরকে জিজ্ঞেস করলো, 'ছাত্র বুঝি?'

'ছাত্র এবং বন্ধু।' পরিচয় করিয়ে দিলো ওমর, 'ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান। নামকরা গোয়েন্দা ওরা।'

'তা-ই নাকি?' হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ।

এক এক করে হ্যাণ্ডশেক করলো কিশোর আর মুসা।

ডজের পরিচয় দিলো ওমর, 'ক্যাপ্টেন ডজারন ম্যাকমবার। আমরা ডাকি ডজ। ইরাকী বাহিনীতে একই স্কোয়াড্রনে ছিলাম আমরা। ইরাক-ইরানের যুদ্ধের সময় যা খেল দেখিয়েছে না ও। হুট হুট করে যখন তখন প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়তো শত্রু এলাকায়। একদিন খুব নিচু দিয়ে উড়ে শত্রুর বাংকার আবিষ্কার করতে গিয়ে বাড়ি লাগালো টেলিগ্রাফের খুঁটির সঙ্গে। তারপর গায়েব। আমরা তো ভেবেছি মরেই গিয়েছে। প্লেনটা পাওয়া গেছে বিধ্বস্ত অবস্থায়। কিন্তু ডজের খোঁজ নেই। বহুদিন আর কোনো খবর পাইনি।' থামলো ওমর। ডজের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'তারপর একদিন খবর পেলাম, দক্ষিণ সাগরের এক দ্বীপে বিলাসী জীবন যাপন করছেন
আমাদের ডজারন ম্যাকমবার।'

'যে বলেছে, সে একটা আস্ত মিথ্যুক,' কড়া গলায় প্রতিবাদ করলো ডজ। 'কারণ ওখানে বিলাসেও গা ভাসিয়ে ছিলাম না আমি, কোনো একটা বিশেষ দ্বীপে বাসও করছিলাম না। আমি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

'তা বেশ করেছিলে,' ওমর বললো। 'যার যা স্বভাব তা-ই তো করবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন আমরা? এতোদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। একটু খাতির-টাতির করা দরকার। খেয়েছো?'

'না। এখানেই খেয়ে নেবো ভাবছিলাম। আমি এসেছিলাম ক্লাবটা দেখতে। হলিউড-ফলিউড দেখে দেখে আর সময় কাটছিলো না। রকি বীচ ক্লাবের নাম শুনেছি। অনেক পুরনো আমলের বিমানও নাকি আছে এখানে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাই করিনি।'

'আমিও না। এখানকার মেম্বার আমি। এরা দু'জনও,' কিশোর আর মুসাকে দেখালো ওমর। 'এসো। আগে গিয়ে বসি। খাওয়া-দাওয়া হোক। দক্ষিণের দ্বীপে নারকেল আর কলা কেমন ফলালে সেই গল্প শোনাও আমাদেরকে। তারপর ক্লাবটা দেখানো যাবে'খন। এসো।'

'নারকেল ফলাবো! ফুহ্! জঘন্য লাগে আমার! দেখলেই বমি আসে এখন। তোমারও আসতো, যদি আমার মতো এতো নারকেল খেতে হতো,' মুখ বাঁকালো ডজ। সুইং ডোর ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকলো ওমরের পিছু পিছু।

জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে এসে বসলো চারজনে।

'তো, আমেরিকায় কি করছো?' জানতে চাইলো ওমর। মেনু কার্ড টেনে নিলো সে। 'ছুটিতে বেড়াতে এসেছো? বাড়ি গিয়েছিলে?'

ডজের বাড়ি বৃটেনে। মাথা নাড়লো সে, 'না, যাইনি। বেড়ানোর কথা বলছো? এখানেও জঘন্য লাগছে আমার। দুনিয়ার কোথায় গেলে যে ভালো লাগবে বুঝতে পারছি না। আসলে দক্ষিণ সাগর মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে

আমার।' আরেকটা মেনু কার্ড টেনে নিলো সে। 'এই, শিক কাবাব হলে কেমন হয়? ভেড়ার মাংসের?'

'চমৎকার হয়!'

'দারুণ!' বলে উঠলো মুসা।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালো ডজ। জোরে হেসে উঠলো, 'ভোজন রসিক মনে হচ্ছে?'

'ধরে ফেলেছেন তাহলে,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর।

'দ্বীপের কথা আর বলবেন না, ডজ ভাই...'

বাধা দিয়ে ডজ বললো, 'শুধু ডজ। ওসব ভাইটাই শুনতে ভালো লাগে না। শুধু ডজ।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, শুধু ডজ।' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'দ্বীপের খাবারের কথা বলছেন তো? সেকথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, ডজ ভাই...'

'...আবার ভাই!'

'থুককু। মনে থাকে না। নিজের চেয়ে বয়েসে বড় কাউকে দেখলেই... যাকগে, ডজ। হ্যাঁ, দক্ষিণের কিছু দ্বীপে আমরাও বেরিয়ে এসেছি, ডজ। শুঁয়াপোকার বাচ্চা পর্যন্ত খেয়ে এসেছি আমরা তিনজনে...'

'তিনজন? আরেকজন কোথায়?'

'গানের অফিস চালাতে গেছে। রবিন মিলফোর্ড,' বললো ওমর। 'আমাদের আরেক বন্ধু। ওরা তিনজনে মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছে। নাম রেখেছে তিন গোয়েন্দা।' সংক্ষেপে তিন গোয়েন্দার কথা ডজকে জানালো সে।

'ভালো, খুব ভালো,' মাথা দুলিয়ে বললো ডজ। 'ওমর শরীফের সঙ্গে যখন এতো মাখামাখি, তখনই বুঝেছি স্বভাবও একই হবে। বেপরোয়া, অ্যাডভেঞ্চারাস, দুঃসাহসী...'

'কাকে কি বলছো? তুমি কি আর কম নাকি?'

'সেজন্যেই তো তোমার সঙ্গে দোস্তী হয়েছে।' হা হা করে হাসলো ডজ। অন্য তিনজনের মাঝেও সংক্রমিত হলো হাসিটা।

খাবারের অর্ডার দিয়ে আবার ডজের দিকে তাকালো ওমর, 'হ্যাঁ, এবার বলো। কি জন্যে আমেরিকায় এসেছো? বেড়াতে আসোনি। তোমার আচরণই বলে দিচ্ছে।'

'সত্যি কথা বলবো? টাকার জন্যে এসেছি। শুনেছি, এখানে নাকি বাতাসে টাকা ওড়ে।'

'ঠিকই শুনেছো। তবে তার পেছনে ছোটার লোকেরও অভাব নেই। প্রতিদিন ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটছে কোটি কোটি লোক। বেশির ভাগই ধরতে পারছে না, মুখ চুন করে বাড়ি ফিরছে। এই আমার কথাই ধরো না। অনেক তো ছুটলাম, বড় লোক আর হতে পারলাম না। কিছুদিন থেকে ভাবছি, পুলিশের চাকরিতে যোগ দেবো। ভালো অফার এসেছে।'

'চেহারা কিন্তু চকচক করছে তোমার,' ডজ বললো। 'পকেটে পয়সা না থাকলে অমন হয় না। টাকার জন্যে নয়, পুলিশে যোগ দেয়ার যদি ইচ্ছে হয়ে

থাকে তোমার, তাহলে ওই বেদুইনগিরি করার লোভে। অ্যাডভেঞ্চার। তা কতো জমিয়েছো?'

'ব্যাপারটা কি, বলো তো? এতোই টানাটানিতে পড়ে গেলে? ঠিক আছে, লাগলে অল্পস্বল্প ধার দিতে পারি।'

'অল্পতে হবে না, বেদুইন,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো ডজ, 'গাদা গাদা দরকার আমার। আর ধারটারের মধ্যেও যাচ্ছিনে। আমি চাইছি পার্টনার।'

'গাদা গাদা বলতে কতো বোঝাচ্ছো?'

'ধরো, শুরুতে হাজার পঞ্চাশেক।'

শিস দিয়ে উঠলো ওমর। 'কেন? দ্বীপ কিনবে নাকি?'

'দ্বীপফীপের দরকার নেই আমার।' নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো ডজ। 'বিনে পয়সাতেই হাজারটা দ্বীপ দখল করে নিতে পারি, ইচ্ছে করলে। পয়সা লাগে না। সাগরের ওই দক্ষিণ অঞ্চলটায় খালি পড়ে আছে হাজারে হাজারে। থাকার লোকও নেই। তোমার ইচ্ছে হলে তুমিও গিয়ে থাকতে পারো। না ভাই, ওসব নয়। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরেকটু বেশি।'

'বলে ফেলো। দেখি সাহায্য করা যায় কিনা।'

উজ্জ্বল হলো ডজের মুখ। 'সত্যি সাহায্য করবে আমাকে? টাকার ব্যবস্থা করে দেবে?'

'সেই টাকা দিয়ে তুমি কি করতে চাও, তার ওপর নির্ভর করে দেয়া না দেয়া। তোমাকে তো আমি চিনি। আর স্মৃতিশক্তিও অতোটা খারাপ না আমার। আগেও বহুবার নানারকম উর্বর বুদ্ধি এসেছিলো তোমার মাথায়। কোটিপতি হবার অনেক পরিকল্পনা করেছিলে। কয়েকবার ফতুর করেছো আমাকে। আর ফতুর হতে রাজি না আমি।'

ছুরি কাঁটা তুলে নিয়েছিলো ডজ। নামিয়ে রেখে হেলান দিলো চেয়ারে। স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওমরের দিকে। 'এক ঝুড়ি মুক্তো যদি দিয়ে দেয়া হয় তোমাকে, নিজেকে আর ফতুর ভাববে?'

হাসলো ওমর। 'বাড়িয়ে বলার স্বভাবও গেল না তোমার। একমুঠো বললেও নাহয় বিশ্বাস করতাম।'

'এক ঝুড়িই বলছি! বড় এক ঝুড়ি!' জোর দিয়ে বললো ডজ। 'আর এখানকার গহনার দোকানে যেসব মটরের দানার মতো দেখলাম, সেরকম নয়। আরও অনেক বড়। পায়রার ডিমের সমান।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' স্বীকার করলো ওমর। তারপর মাথা নাড়লো অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে, 'কিন্তু তা তো তুমি দিতে পারবে না। কারণ সেই মুক্তো আনতে হলে ডালাস কিংবা হলিউডের বড়বড় বাড়িতে যেতে হবে তোমাকে। দুর্গম দুর্গ একেকটা। সেসব বাড়িতে ঢোকার সাধ্য বড় বড় ডাকাতেরও নেই। তবে সঙ্গে যদি নিয়ে এসে থাকো, আলাদা কথা।'

'সঙ্গে আনতে পারলে কি আর তোমার কাছে টাকা চাইতাম নাকি?' গুঙিয়ে উঠলো ডজ। 'তবে আমি দেখেছি।'

'নাকি অন্য কেউ দেখে তোমাকে বলেছে? সেকথাই শোনাচ্ছো।'

গ্লাস তুলে নিয়েছিলো, দড়াম করে নামিয়ে রাখলো ডজ। আরেকটু জোরে আছাড় দিলেই ভেঙে যেতো। চেহারার মারমুখো ভাবটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। 'দেখ, বেদুইন, আমি বলছি আমি দেখেছি। নিজের চোখে। বিশ্বাস করো দয়া করে!'

মাথা ঝাঁকালো ওমর। 'বেশ, এতোই যখন জোর দিয়ে বলছো, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু দেখলেই যখন, পকেটে ভরে কয়েকটা নিয়ে এলে না কেন?'

'পারলে কি আর আনতাম না নাকি? আরেকটা হুইস্কি আনতে বলো। গল্পটা শোনাচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে।'

হুইস্কি আনার অর্ডার দিলো ওমর। সিগারেট কেস বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। ডালা তুলে বেছে নিয়ে ঠোঁটে লাগালো একটা। লাইটার দিয়ে ধরালো। মুখ তুলে তাকালো ডজের দিকে। 'শুরু করো। অনেক দিন ভালো গল্প শুনিনি।'

'বিশ্বাসই যদি না করো, অহেতুক বকবক করে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।' গম্ভীর হয়ে গেল ডজ।

'না শুনলে বুঝবো কি করে? সত্যিই বলবে তো, নাকি বানিয়ে বানিয়ে? তোমার তো আবার কল্পনার দৌড় একটু বেশি।'

'একটা শব্দও বাড়িয়ে বলবো না। যা সত্যি, শুধু তা-ই।'

নীরব একটা মহূর্ত ডজের দিকে তাকিয়ে রইলো ওমর। 'বেশ, বলো। বিশ্বাস করবো।'

'হ্যাঁ, শুরু করুন,' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কিশোর।

'একটা কথা বাড়িয়ে বলবো না আমি,' আবার বললো ডজ। গেলাসে লম্বা একটা চুমুক দিলো। 'যে লোকের কাছে শুনেছো, আমি দক্ষিণের দ্বীপে আছি, সে ঠিকই বলেছে। তবে আরামে ছিলাম, একথা ঠিক নয়। ওরকম জায়গায় আরামে থাকা যায় না। সভ্যতার ছিটেফোঁটা আছে কিনা ওখানে সন্দেহ। যা-ই হোক, গিয়ে তো উঠলাম। বসে থাকতে ভালো লাগে না। কিছু একটা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। মনের মতো কাজ পেলাম না। আমি হলাম গিয়ে বৈমানিক, প্লেন চালানো আর বোমা ফেলা ছাড়া আর কিছু বুঝি না। ওখানে ওরকম লোকের দরকার হয় না কারো। চিন্তায়ই পড়ে গেলাম। কি করি, কি করি! পকেটের টাকাও প্রায় শেষ। কোথাও যেতে হলে ভাড়ার টাকা লাগে। শেষে তাহিতির পাপিতি দ্বীপে যাওয়ার জন্যে জাহাজের একটা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটলাম। মোটামুটি বাস করার মতো একটা জায়গা ওটা।'

'গিয়েছি আমরা,' মুসা বললো।

তার দিকে তাকালো ডজ। 'গিয়েছো, না? তাহলে তো জানোই। সব রকমের লোক আছে ওখানে। সৎ লোক যেমন আছে, তেমনি আছে অসৎ লোক। ভদ্রলোক আছে, আছে অভদ্রলোক। ব্যবসায়ী, চোর-ডাকাত, শাদা, কালো, বাদামী, হলুদ, যতো রকমের মানুষ আছে দুনিয়ায়, সব রকমের পাওয়া যাবে ওখানে। সমস্ত দুনিয়ায় ঘুরেফিরে আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে গিয়ে যেন ওঠে ওই তাহিতির বন্দরে। একটা ব্যাপারে সবার মিল রয়েছে, সকলেই পোড় খাওয়া লোক। সাধারণ কেউ গিয়ে বাঁচতে পারবে না ওখানে। আমার যা মনে হয়েছে, বেশির ভাগই

ভালো। তবে যেগুলো শয়তান, মহা শয়তান। একেবারে খাটাশ।' থেমে দম নিলো ডজ। বার কয়েক চুমুক দিলো গেলাসে।

আবার বলতে লাগলো, 'সব কিছু মিলিয়ে, চমৎকার একটা জায়গা তাহিতি, আমার তা-ই মনে হয়েছে।'

'আমারও,' মুসা বললো।

'বাহ্, স্বভাব চরিত্রে মিলে যাচ্ছে দেখি!' হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ। 'হাত মেলাও।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোমরা যখন গিয়েছো, নিশ্চয় সব জানো...'

'আমি যাইনি,' ওমর বললো। 'যা বলার বলো।'

'এককালে সোসাইটি অ্যাইল্যাণ্ড বলা হতো দ্বীপটাকে। তখন ফ্রান্সের দখলে ছিলো ওটা। চীনারা থেকেছে বহুদিন। জাপানীরা দ্বীপটা নিয়ে বহু গুঁতোগুঁতি করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। চীনারা এখনও আছে। মায়া কাটাতে পারে না। দেখার মতো একটা বন্দর। জাহাজ আসছে যাচ্ছে। পোড় খাওয়া সব মানুষ, দ্বীপের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য নারকেলের ছোবড়ার মতো শুকনো, রোদে পোড়া। রপ্তানী দ্রব্য আরও আছে। নানা রকমের ঝিনুক এবং মুক্তো। আশপাশের দ্বীপে যতো মুক্তো তোলা হয়, সব নিয়ে আসা হয় পাপিতিতে, বিক্রির জন্যে। ব্যাপারিরা কিনে চালান করে দেয় প্যারিসে কিংবা অন্য কোনো বড় শহরে। সেখানে মুক্তার চাহিদা রয়েছে। যা-ই হোক, ভূগোলের জ্ঞান অনেকই দিলাম। এবার আসল কথায় আসি।

'জাহাজে তো উঠলাম। ভেসে চললাম এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। একদিন গিয়ে পৌঁছুলাম পাপিতিতে। গিয়েই কাজ পেয়ে গেলাম। আমার মনের মতোই বলতে হবে। অবশ্যই জাহাজের চাকরি। দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাই। কয়েক দিনের বেশি ভালো লাগলো না এই চাকরি। মালবাহী জাহাজ থেকে নেমে চাকরি নিলাম এক ব্যবসায়ীর দোকানে। দোকানদারি করলাম কিছুদিন। ভালো লাগলো না। বসে রইলাম কয়েক দিন। আরও খারাপ লাগলো। কথা বলার লোকের অভাব হয় না ওখানে। যদি কেউ মানিয়ে নিতে পারে, আরামেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে ওরকম একটা দ্বীপে। দুই বেলা রুটি জোগাড়ের জন্যে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না। দেখার জিনিসের অভাব নেই। তবু মাঝে মাঝে মনে হতো, ওই সবুজ দ্বীপ, রূপালী সৈকত, নীল লেগুন আর ঝলমলে মুক্তার চেয়ে অনেক ভালো আমাদের স্কটল্যাণ্ডের ধোঁয়াটে কুয়াশা ওঠা মেঘলা দিনগুলোও। পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করতো। আসতে পারতাম, কিন্তু আসিনি। চেষ্টা করতে লাগলাম কিছু একটা করার। ওখানে অনেকে বড়লোক হয়েছে, আমি পারবো না কেন? টাকা নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফিরতে পারলে বাকি জীবনটা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবো। অনেক উপায় আছে টাকা রোজগারের, কিন্তু আমার হাতে ধরা দিতে চাইলো না। হাতে আসি আসি করেও আসে না, কেবলই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।'

'কিভাবে?' কৌতূহল বাড়ছে কিশোরের।

'কিভাবে? সেসব গল্প বলতে গেলে কয়েক ঘণ্টায় কুলোবে না। অনেক সময় দরকার। তবে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। পমোটাস দ্বীপে একদিন এক দোকানে একটা ডাইভিং স্যুট নজরে পড়লো। জিনিসটা দোকানের মালিকের শখের জিনিস। বিক্রি

করতে রাজি হলো না। তবে আমার চাপাচাপিতে ধার দিতে রাজি হলো এক শর্তে। যদি মুক্তো খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হবে তাকে। ওটা নিয়ে চলে গেলাম আরেক পরিচিত লোকের কাছে। ঝরঝরে একটা বোট আছে তার। আরও একটা ভাগ দিতে হবে, এই কথা আদায় করে নিয়ে বোটটা নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো সে। স্যুট পেলাম, বোট পেলাম, আর ভাবনা কি? বেরিয়ে পড়লাম মুক্তো শিকারে। নিগ্রোরা ওখানে ভীষণ পরিশ্রম করে। গাধার মতো খাটতে পারে। আমিও ওদেরই মতো গাধা হয়ে থাকলাম পুরো একটা বছর। ডুবলাম ভাসলাম, ডুবলাম ভাসলাম, কতো হাজার বার যে ডুব দিয়েছি সাগরে, হিসেবই করতে পারবো না। বেশ কিছু মুক্তোও জোগাড় করলাম। ছোটখাটো একটা ব্যাগ ভর্তি। তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়েও আমার যা থাকবে, যথেষ্ট। আর দরকার নেই। নিয়ে রওনা হলাম পাপিতিতে। পরের দিনই আঘাত হানলো সাইক্লোন। ওখানে ঝড়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যখন তখন চলে আসে। ভাঙা একটা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছলাম মেরিয়েটা দ্বীপে, জান নিয়ে কোনোমতে ধুকতে ধুকতে। রোদে পুড়ে উঠে গেছে পিঠের চামড়া। নতুন চামড়া গজানোর জন্যে পড়ে থাকতে হলো হাসপাতালে। আর মুক্তোগুলো? যেখান থেকে তুলেছিলাম সেই সাগরের তলায়ই আবার ফিরে গেছে বোটটা সহ। আরেকবার একটা মালবাহী জাহাজে চাকরি নিয়ে চলেছি। একটা ক্যানুতে দেখলাম দু'জন লোক, মারকুইস দ্বীপের লোক। মুক্তোর জন্যে ডুব দিচ্ছে। বড় বড় তিরিশটা ঝিনুক তুলে ফেলেছে, একটাও খোলা হয়নি। হাতে কাজকর্ম কিছুই নেই। ভাবলাম কিছু তো একটা করি। ঝিনুকগুলোর জন্যে দুটো পুরনো পাইপ আর এক কৌটো তামাক দিতে চাইলাম। লাফিয়ে উঠলো ওরা। লুফে নিলো প্রস্তাবটা। কারণ তিরিশটা কেন, তিরিশ হাজার ঝিনুক খুলেও অনেক সময় একটা মুক্তো পাওয়া যায় না। তবে ঝিনুকেরও দাম আছে, সেটা অন্য ভাবে। বীজ হিসেবে। টন টন ঝিনুক কিনে নিয়ে গিয়ে সাগরের বিশেষ জায়গায় ফেলে, যারা মুক্তোর চাষ করে। ওস ঝিনুকের অনেক দাম। তবে এমনিতে তিরিশটা ঝিনুকের কোনো দামই নেই৷ ব্যাপারটা আমার পাগলামি হিসেবেই ধরে নিলো ওরা। কিন্তু আমি তখন কাজ খুঁজছি, হাত চালানোর মতো যে কোনো কাজ। ডেকে বসে খুলতে শুরু করলাম ঝিনুকগুলো। একটা কথা বলে নিই।' কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে বললো, 'তোমাদেরকে বলছি না। তোমরা নিশ্চয় জানো।' ওমরকে বললো, 'এমনিতে সাধারণত যেসব ঝিনুক দেখা যায়, দক্ষিণ সাগরের ওসব মুক্তোওয়ালা ঝিনুক সেরকম নয়। অনেক বড়। কয়েক পাউণ্ড ওজন। অনেক সময় নিয়ে খুললাম প্রথমটা। কিছু নেই। দ্বিতীয়টা খুললাম। ওটাতেও কিছু পেলাম না। এক এক করে উনত্রিশটা ঝিনুক খুলে ছড়িয়ে ফেললাম ডেকের ওপরে। আমার ভাগ্যে কিছুই মিললো না। আর একটা মাত্র ঝিনুক বাকি। ওতে কিছু পাওয়ার আশা করলাম না। সবগুলোর চেয়ে ছোট ওটা। খাবার সময় লোকে কি করে? প্রথমে বড়টা বেছে নেয়, সে যা-ই হোক। মিষ্টি হোক, মাছ হোক, যেটাই হোক, প্লেটের বড়টার দিকেই ঝোঁক মানুষের। আমিও তা-ই করেছিলাম। প্রথমে বড়টা বেছে নিয়ে খুলেছিলাম, তারপর ওটার চেয়ে ছোটটা।

এভাবে খুলতে খুলতে বাকি রয়ে গিয়েছিলো সব চেয়ে ছোটটা। বেশ অবহেলা নিয়েই ফাঁক করলাম ওটা। ভেতরে আঙুল ঢোকালাম। নরম মাংসের মধ্যে শক্ত কি যেন লাগলো। বের করে আনলাম। মুক্তোই। থ্রাশ পাখির ডিমের সমান বড়। এমন মুক্তো জীবনে দেখিনি। ডেকের ওপর পড়ে রইলো। ঝিনুক থেকে বের করার পর ভেজা মুক্তোর রঙই অন্যরকম লাগে। আগুনের মতো জ্বলে। প্যারিসে নিয়ে গেলে ওই একটার দামই বিশ হাজার ডলারের কম হবে না। বেশিও হতে পারে। এর আগে আমিও এতো বড় আর সুন্দর মুক্তো দেখিনি। বোকা হয়ে গেলাম যেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ঠিক ওই সময় জোরে বাতাস লাগলো, ঢেউয়ে কাত হয়ে গেল জাহাজ। ডেকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল মুক্তোটা। চিৎকার করে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, থাবা দিয়ে তুলে নিতে চাইলাম ওটাকে। ধরতে পারলাম না। চোখের সামনে গড়িয়ে গিয়ে সাগরে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো ঝিলিক দিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল নীল সাগরে। আরেকবার চিৎকার করে উঠেছিলাম, যেন ওটাকে ফেরানোর জন্যেই। কিন্তু কথা শুনলো না মুক্তোটা। চলে গেল। মুক্তো সম্পর্কে অনেক গুজব রয়েছে। অনেক কিংবদন্তী। দ্বীপের লোকেরা বলে, অনেকের ভাগ্যে মুক্তো সয় না। তাকে দেখা দিয়ে আবার ফিরে যায় সাগরে অনেকের আবার দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে। আমার ভাগ্যে যে কোনটা ঘটলো, বুঝতে পারলাম না। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কতো মুক্তোই হাতে এসেছে, একটাও বিক্রি করতে পারিনি। যা-ই হোক, আসল গল্পটা এবার বলি।

'বছর দেড়েক আগে, টাকাপয়সা নেই আমার হাতে। শেষে এক জাহাজে চাকরি নিলাম। মালিক করসিকার লোক, ভীষণ পাজি। নাম গুডু কারনেস। অনেক বদনাম আছে লোকটার। তার শয়তানী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। চিনতে দেরি হয়নি। ওসব দ্বীপে লোক চিনতে সময় লাগে না। সবাই খোলামেলা। বুঝেও কিছু করতে পারলাম না। চাকরিটা না নিয়ে উপায় ছিলো না আমার। আর কোনো কাজ পাচ্ছিলাম না। মারকুইসাস হয়ে পমোটাস ঘুরে এসেছে সবে তার জাহাজ। জাহাজটারও অদ্ভুত নাম রেখেছে। দুনিয়ার ভয়ংকরতম হাঙরের নামে নাম, হোয়াইট শার্ক। যতোটা নোংরা করা সম্ভব করে রেখেছে। তেলাপোকা আর ছারপোকায় বোঝাই। নারকেলের ছোবড়ায় একরকম পোকা হয়, সাংঘাতিক যন্ত্রণা দেয়, সেই পোকারও অভাব নেই। আর তেলাপোকাও যা একেকখান। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ওসব তেলাপোকার কথা আরেকদিন বলবো তোমাকে। রাতে ঢেকেঢুকে না ঘুমালে ঘুমের মধ্যেই পায়ের তলার চামড়া খেয়ে সাফ করে দেবে, টেরও পাবে না। সকালে উঠে যখন আর দাঁড়াতে পারবে না তখন বুঝবে মজা। হারামীর একশেষ। ওই জাহাজে করেই রওনা হয়ে পড়লাম একদিন পাপিতি বন্দর থেকে। লম্বা একটা পাড়ি জমাবে গুডু কারনেস, ছয় মাস, এমনকি নয় মাসও লেগে যেতে পারে।

'যতোটা খারাপ ভেবেছিলাম তার চেয়েও খারাপ কারনেস। আস্ত শয়তান। ভীষণ মুখ খারাপ। আমি বাদে আরও আটজন নাবিক তার জাহাজে। স্থানীয় লোক। ওগুলোও মহা বদমাশ। বোধহয় এ কারণেই ওদেরকে বাছাই করেছে সে। সাধারণত স্থানীয় মানুষেরা ভালো হয়, তাহিতি, মারকুইস, পমোটোর লোকেরা। কিন্তু কারনেসের লোকগুলোর বাড়ি ওসব অঞ্চলে হলেও বেজায় খারাপ। পরে

শুনেছি, মানুষের মাংস
খাওয়ার অপরাধে অস্ট্রেলিয়ায় জেল খাটতে হয়েছে ওদের। তাতে আর অবাক হইনি তখন। ততোদিনে জেনে গেছি, কপালে দুঃখ আছে আমার। তবে কতোটা দুঃখ আছে তা যদি জানতাম, দ্বীপ থেকে নড়তামই না; যতোই না খেয়ে মরি। সাগরে বেরোনোর পর জানতে পারলাম কারনেসের জাহাজে কি আছে। স্থানীয়দের কাছে স্পিরিট বিক্রি করা ওখানে বেআইনী। ওসব খেলে কতোটা ক্ষতি হয়, ভালো করেই জানে স্থানীয়রা। তার পরেও খায়। আর সাপ্লাই দেয়ার লোকেরও অভাব নেই। নানারকম কায়দা করে চালান দেয়া হয় ওগুলোকে। এই যেমন সেন্টের শিশিতে ভরে, কিংবা তেলের বোতলে ভরে। ব্যাপারটা ভালো লাগলো না আমার। কারনেসের সঙ্গে কথা বললাম। স্বীকার করলো সে, আছে। নিজেও প্রচুর গিলে সে। অন্য ব্যবসায়ীদের মতো সেন্টের কিংবা তেলের বোতলেও ভরেনি সে, এতোই বেপরোয়া। সরাসরি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়, কেয়ারই করে না আইনের। ওর ওসব ব্যবসায় আমি জড়াতে চাই না, সাফ বলে দিলাম। তর্কাতর্কি হলো, ঝগড়া হলো। শেষমেষ বোকার মতো হুমকি দিয়ে বসলাম আমি ওকে। পুলিশকে বলে দেবো। বলার সময়ও বুঝিনি, আমাকে পুলিশের কাছে পৌছতেই দেবে না সে।

'যাই হোক, আমি আমার মতো আছি। আর কারনেস তার সলোমন আইল্যাণ্ডের গলাকাটা ডাকাতগুলোকে নিয়ে সারাদিনই মদে চুর হয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করতে পারো, ওই অবস্থায় জাহাজ চলছিলো কি করে? চলছিলো। তার কারণ কারনেসের লোকগুলো সব পাকা নাবিক। ওসব অঞ্চলের সব লোকই ভালো নাবিক। সমুদ্র সম্পর্কে অসীম জ্ঞান। ছোট একটা ক্যানুতে করেও বিশাল সাগর পারি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে মা। কম্পাস-টম্পাস বাদেই দু'হাজার মাইল দূরের অন্য কোনো দ্বীপে চলে যেতে পারে, একটুও ভুল করে না। বিশ্বাস করো, এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। প্রথমে আমরা গেলাম পমোটোসে। ঠিক দ্বীপ বলা যায় না ওটাকে, একসারি প্রবালের দেয়াল বলাই ভালো। পানি থেকে বেশি উঁচু নয়। তাই অনেকে এর নাম দিয়েছে লো আরচিপেলাজো। স্থানীয়রা নাম দিয়েছে "বিপদের দ্বীপ", এটাই মানিয়েছে ভালো। ওখানকার সাগরে জাহাজ চালানো যতোটা কঠিন, পৃথিবীর আর কোনো সাগরেই ততোটা নয়। মারকুইসাসের দিকে চললাম আমরা। ওটা হলো পমোটোস থেকে একেবারে ভিন্ন জাতের। আগ্নেয় শিলায় বোঝাই, আর রয়েছে ঘন জঙ্গল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মস্ত কোনো মহাদেশ ছিলো একসময় ওই জায়গাটায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাগরের নিচে চলে গেছে। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলগুলো ডোবেনি, বেরিয়ে রয়েছে এখনও পানির ওপরে। দেখে অবশ্য সেরকমই মনে হয়। হাজার হাজার ফুট উঁচু বড় বড় পাহাড় যেন তালগোল পাকিয়ে রয়েছে। পাহাড়ের এরকম চেহারা আর কোথাও দেখা যায় না। কোনো কোনোটা তো বিশাল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম।

'দুটো দ্বীপপুঞ্জকেই ম্যাপে দেখে মনে হবে খুব বুঝি কাছে। আসলেই কাছে, অবশ্যই দক্ষিণ সাগরের বেলায়। ওখানে পাঁচশো মাইল কিছুই না। এখানে

আমেরিকায় এই দূরত্ব অনেক বেশি। ওখানে শত মাইলের হিসেবটাকে কিছুই মনে করা হয় না। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ নিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়লে, চলছো তো চলছোই, ছ'হাজার সাত হাজার মাইল পেরিয়ে গেলে, এতো মাইলের মধ্যে ছোট একটা প্রবাল প্রাচীর দেখা না গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওখানে ওরকমই। মারকুইসাসের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। ভালো বাতাস পাওয়ার জন্যে সামান্য একটু বাঁয়ে কেটে চালাচ্ছে নাবিকেরা। বোধহয় তাতেই, কিংবা বাতাসের কারণে সরে গেল জাহাজ। একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। নাবিকেরা তো বটেই, কারনেসের কাছেও দ্বীপটা নতুন। আগে কখনও দেখেনি। গ্যালাপাগো থেকে ল্যাডরোনি পর্যন্ত এলাকা যাদের নখদর্পণে, তাদের নজরে ওই দ্বীপ পড়েনি! অবাকই হলাম। ওরা হলো না। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের অভাব নেই, কখন কোন একটা দ্বীপ নজর এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ওদের। যেহেতু অচেনা দ্বীপ, নোঙর করার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না কারনেস। দ্বীপটা নির্জন। ওখানে থেমে তার কোন লাভ হবে না। এইখানে এসেই আমার আসল গল্প শুরু, এবং এখানেই আমার প্রাণ প্রায় যেতে বসেছিলো।

ক'দিন ধরে একনাগাড়ে মদ গিলে চলেছে কারনেস। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে জাহাজ চালানো আমি শিখে গেছি ভালোমতোই। চালাচ্ছি। আর কোনো উপায়ও ছিলো না। জাহাজে তখন একমাত্র আমিই সুস্থ রয়েছি। বাকি সবগুলোর অবস্থা কাহিল। কোনখান দিয়ে চলেছি আমরা কিছুই বুঝতে পারবে না কারনেস, বাইরে না বোরোলে। আর বেরোনোর মতো অবস্থাও তখন নেই তার। দ্বীপটার কাছ ঘেঁষে গেলাম, না পাঁচশো মাইল দূর দিয়ে গেলাম, কিচ্ছু জানবে না। না জানায় ভালোই হয়েছে আমার জন্যে, পরে বুঝতে পারবে। সাগর মোটামুটি শান্ত। তখন ঠিক দুপুর। প্রচণ্ড গরম। দ্বীপটাকে কাছে থেকে দেখলাম। প্রবালে তৈরি, অ্যাটল বলে ওগুলোকে। পাশ দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে জাহাজ। মনে হয় জাহাজটাই স্থির হয়ে আছে, দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে। চার্টে অবস্থান দেখে নিলাম। সেক্সট্যান্টটা রাখলাম হুইলের কাছে। কখন আবার উঠে এসে রীডিং দেখতে চায় কারনেস কে জানে। সব কিছু রেডি রাখলাম। কে বকা শুনতে যায় খামোকা। লংগি চিউড আর ল্যাটিচিউড দুটোই মনে রাখলাম। পরে লগবুকে লিখে নেবো। ওরকম বহুবার করেছি। কখনো ভুল হয়নি। ডেকেই ছায়ায় শুয়ে পড়লাম। বাতাসের অপেক্ষায় রয়েছি। ভালো বাতাস না হলে ঠিকমতো চলবে না জাহাজ। কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছো। হোয়াইট শার্ক স্কুনার জাতের জাহাজ। ইঞ্জিন থাকলেও পালের দরকার হয়। নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি। অলস ভাবনা। কারনেসের কথা, আমার কথা, আরও অনেক কথা। ডেকের কিনারে উপুড় হয়ে রয়েছি। হঠাৎ এমন একটা জিনিস চোখে পড়লো, ধক করে উঠলো বুক। আরেকটু হলেই বোধহয় কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে সাগরে পড়ে যেতো চোখ। সাগরের যেখানটায় সাংঘাতিক গভীর থাকার কথা, আচমকা যেন সেখানটা উঠে চলে এসেছে কোন জাদুমন্ত্রের বলে! জাহাজের খোলের নিচেই একেবারে, পঁচিশ-তিরিশ ফুট গভীর হবে। আরেকটু উঠলেই ঘষা লাগবে জাহাজের তলায়। উঠে গিয়ে যে হুইল ঘোরাবো, সে কথাও মনে রইলো না।

এতোই অবাক হয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যেমন হঠাৎ উঠলো তেমনি হঠাৎ করেই নেমে গেল সাগরের তল। বিশ্বাস করলাম না। ভাবলাম, গরম আর রোদ এমন কিছু করেছে, যাতে চোখে ভুল দেখেছি। কিন্তু ডেকের কিনারে বসে তাকিয়েই রইলাম। মনে হতে লাগলো আবার দেখতে পাবো। ঘটলোও তাই। অদ্ভুত কাণ্ড। মুহূর্তের জন্যে দেখা যায় তল, তারপরই মিলিয়ে যায়, আবার দেখা যায়, আবার গায়েব। গায়ে কাঁটা দিলো। ব্যাপারটা কি! হঠাৎই বুঝে ফেললাম। সাগরের তল উঠছে নামছে তা নয়। ঢেউ। অনেক চওড়া আর উঁচু ঢেউ। খুব ধীরে আসছে। সে-জন্যেই জাহাজটা যে একবার উঠছে ঢেউয়ের মাথায়, একবার নামছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। যখন ঢেউয়ের নিচে নামছে,তখন তল চোখে পড়ছে, ওপরে উঠলেই হারিয়ে যাচ্ছে আবার। আর উঁচু কতো জানো একেকটা ঢেউ? চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট। নিচে কিন্তু বালির চড়া নয়, প্রবাল। ঘাবড়ে গেলাম। ভীষণ ধারালো। কোনোমতে যদি একটা ঘষা লাগে জাহাজের তলায়, তরমুজের মতো চিরে ফেলবে। আর আছড়ে পড়লে গুঁড়িয়ে যাবে ডিমের খোসার মতো। এখানে জাহাজ সামলানো আমার কর্ম নয়। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম।

ছুটে এলো কারনেস আর তার দলবল। যতোটা মাতাল ভেবেছিলাম ওদেরকে ততোটা হয়নি। চেঁচিয়ে শুধু বলতে পারলাম, "জাহাজ সামলাও!" কি হয়েছে জানতে চাইলো কারনেস। ডেকের কিনারে এসে দেখতে বললাম। এলো ওরা। পাথর হয়ে গেল যেন আমারই মতো। ওদের মতো মানুষও অবাক হয়েছে বুঝতে পারলাম। আর আমার তো কথাই নেই। তাকিয়ে রয়েছি নিচের দিকে। কি দৃশ্য, বলে বোঝাতে পারবো না। লাল, নীল, সবুজ, আরও কতো রঙ প্রবালের না দেখলে বুঝবে না। যেন এক অপরূপ বাগান তৈরি হয়ে আছে সাগরের তলায়। প্রবাল দেখে অবাক হইনি, ওরকম অনেক দেখেছি দক্ষিণ সাগরে। অন্য জিনিস দেখে হয়েছি। ঝিনুক! হাজারে হাজারে, বাসনের সমান বড় একেকটা। একেকজোড়া করে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ভালো করে তাকাতে বুঝলাম ব্যাপারটা কি। খুলে রয়েছে ঝিনুকগুলো, খোসাগুলো ফাঁক করে চিত হয়ে আছে। খাওয়ার জন্যে ওরকম করে খুলে যায় ওরা। খুব ভালো করেই জানি ওরকম ঝিনুকের ভেতরেই মুক্তো থাকে। সাগরের তলায় তিল ধারণের জায়গা নেই, শুধু ঝিনুক আর ঝিনুক, খুলে রয়েছে। খোলা জায়গায়, প্রবালের খাঁজে, যেখানেই ঠাঁই পেয়েছে শুধু ঝিনুক আর ঝিনুক, সোয়ালো পাখির বাসার মতো আঁকড়ে রয়েছে যেন প্রবালের গা। কতো লক্ষ-কোটি ডলারের সম্পদ পড়ে রয়েছে ওখানে কল্পনা করে পা কাঁপতে লাগলো আমার, দুর্বল হয়ে এলো, যেন দেহের ভার রাখতে পারবে না। মনে হতে লাগলো এরকম দৃশ্য শুধু স্বপ্নেই দেখা সম্ভব। এতো কিছুর মধ্যেও কি এক অদ্ভুত উপায়ে যেন সজাগ হয়ে গেল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অকারণেই ঝট করে ফিরে তাকালাম কারনেসের দিকে। একেবারে সময় মতো। তাকিয়ে ভালো করেছিলাম। তার চোখে এক ধরনের বন্য দৃষ্টি, কলজে ঠাণ্ডা করে দেয়। ওরকম আর কখনো কোনো মানুষের চোখে দেখতে চাই না আমি। হাত চলে গেছে পকেটে। ওখানেই তার পিস্তলটা থাকে, জানি আমি। চেহারাটা

কুৎসিত হয়ে উঠেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'খুব বেশি নেই এখানে, কি বলো? আমাদের দু'জনের নেয়ার মতো হবে না।' লাফিয়ে সরে গেলাম। আর একটা মুহূর্ত দেরি হলেই গুলি খেতে হতো। অল্পের জন্যে মিস হয়ে গেল বুলেট।

'তখন আমার অবস্থা কল্পনা করতে পারছো? প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে রয়েছি। কারনেসের হাতে পিস্তল, খুনের নেশা চেপেছে তার মাথায়। আমার কাছে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। ছুরি বের করে ফেলেছে তার সাগরেদরা। পালানোর পথ নেই। লুকানোর জায়গা নেই। সারা জাহাজে এমন একটা জায়গা নেই যেখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পাবো। ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে আমার শরীর। বুঝতে পারলাম, আমার দিন শেষ। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়লো, মুক্তোর খেত দেখেছে বটে কারনেস, কিন্তু সেটার অবস্থান জানা নেই তার। আমরা কোথায় রয়েছি, জানে না। জানি শুধু একমাত্র আমি। লগবুকে লিখিনি। তবে সেক্সট্যান্টটা দেখলে জেনে যাবে কারনেস। পরে এসে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি যদি মরি, তাকেও পেতে দেবো না ওই মুক্তো। সেক্সট্যান্টের রীডিং ছাড়া কিছুতেই বের করতে পারবে না কারনেস, আমরা কোথায় রয়েছি। এমনিতেও মরেছি, ওমনিতেও। গুলির পরোয়া আর করলাম না। মরিয়া হয়ে দিলাম ছুট। গুলি করলো কারনেস। তাড়াহুড়োয় আবার মিস করলো। পৌঁছে গেলাম হুইলের কাছে। থাবা দিয়ে তুলে নিলাম সেক্সট্যান্টটা। সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। আবার গুলি করলো কারনেস। কিন্তু ওর গুলিতে আমার মরণ লেখা নেই। ঈশ্বরের দয়া। ঠিক ওই মুহূর্তে জোরে এক ঢেউ এসে বাড়ি মারলো জাহাজের গায়ে। ভীষণ দুলে উঠলো জাহাজ। পড়ে গেলাম আমি। কারনেসও পড়লো। কিন্তু তার সাগরেদরা বহাল তবিয়তেই রইলো। ছুরি নিয়ে তেড়ে এলো আমাকে খুন করার জন্যে। মোরব্বা হওয়ার চেয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু অনেক ভালো মনে হলো আমার। দ্বিধা করলাম না আর। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম পানিতে। প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগলাম। প্রাণের ভয়ে সাঁতরাচ্ছি। উঠতে উঠতে দেরি করে ফেললো কারনেস। ততোক্ষণে আমি দূরে চলে গেলাম। গুলির রেঞ্জের বাইরে যেতে পারিনি। কিন্তু অতো দূর থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে ঢেউয়ের মাঝে একটা মানুষের গায়ে লাগানো আর সম্ভব ছিলো না। তবু গুলির পর গুলি করতে লাগলো সে। আমার আশেপাশে এসে পড়লো কয়েকটা, গায়ে লাগলো না।

'কিছুতেই আমাকে পালাতে দিতে রাজি নয় কারনেস। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পাল ঠিক করছে সাগরেদরা। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ধাওয়া করলো। জানি, পালাতে পারবো না। ধরা আমাকে পড়তেই হবে। সাগরের মাঝে কোথায় যাবো? বাতাসও বইতে আরম্ভ করেছে। খানিক আগে যেরকম শান্ত ছিলো সেরকম নয়। দু'বার আমার পাশে চলে এলো জাহাজ। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডুব মারলাম। এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকলো কারনেস। লাগাতে পারলো না। বাতাসের বেগ বাড়লো। ভীষণ গড়াতে লাগলো জাহাজ। এই অবস্থায় রেলিঙের কিনারে দাঁড়িয়ে গুলি করা খুব কঠিন। বাতাস আরেকটু বাড়তে গুলি করা বাদ দিয়ে জাহাজ সামলাতেই ব্যস্ত হতে হলো ওকে। নইলে যাবে কাত হয়ে

ডুবে।কিংবা প্রবালে বাড়ি খেয়ে ছাতু হবে। ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে সরে যেতে লাগলো স্কুনারটা। আমি বাঁচবো না, জানি। তবে শান্তিতে মরতে পারবো, এই যা। সেটাও আর তেমন সুখকর কল্পনা মনে হলো না কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু মরা ছাড়া আর করবোটাই বা কি? কল্পনা করতে পারছো? প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে। ডাঙা নেই। হাঙরের ঝাঁক। তার ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। সাংঘাতিক না?'

'হ্যাঁ, মারাত্মক,' স্বীকার করলো ওমর।

'একেবারে ঠিক শব্দটা বলেছো। মারাত্মক।' অনেকক্ষণ বলে বলে গলা শুকিয়ে এসেছে ডজের। চুমুক দিতে লাগলো গেলাসে। দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো, 'একটা খড়ও নেই যে ধরে ভাসবো। জাহাজডুবি হলে অনেকেই অনেক কিছু পায়, ধরতে পারে, আমার নেই। তবে চিত হয়ে থাকলে অনেকক্ষণ ভেসে থাকা যায়। যদি হাঙরে না ধরে। পানি গরম। চিত হয়ে ভেসে রইলাম। খুব আস্তে পা দিয়ে লাথি মারছি পানিতে, ভেসে থাকার জন্যে। বেশি জোরে নাড়তে সাহস পাচ্ছি না, যদি হাঙরের নজরে পড়ে যায়। কাপড় খুলে ফেলে দিলাম, বোঝা কমানোর জন্যে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কখন ভেসে ওঠে হাঙরের পিঠের পাখনা। শাঁই শাঁই করে ছুটে আসে পানি কেটে। দু'একটা এলো কাছাকাছি, তবে কোনোটাই মানুষখেকো নয়, কামড়াতে এলো না আমাকে। দিগন্তে হারিয়ে গেল জাহাজটা। আমার চারপাশে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। আমি জানি, মরবো, তবু ইচ্ছে করে তো আর ডুবে যেতে পারি না। ভেসেই রইলাম। রাত হলো। বাতাস পড়ে গেল। শান্ত হতে লাগলো সাগর। ভেসেই রয়েছি তখনও। মনে হতে লাগলো, কেন ভেসে থাকছি? যন্ত্রণা আরও দীর্ঘ হচ্ছে! মরে গেলেই তো হয়! কিন্তু একেবারে নিরাশার মধ্যেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। টিকে থাকতে চায়। আমারও হয়েছিল সেই অবস্থা। মরা দরকার, মরলেই ভালো হয়, কিন্তু মরতে আর পারছি না। কেউ যে আমাকে তুলে নেবে, তারও কোনো-আশা নেই। কয়েক হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে তখন কোনো জাহাজ আছে কিনা, কারনেসের স্কুনারটা ছাড়া, সন্দেহ। আর থাকলেই বা কি? জানতে পারছে না আমি রয়েছি ওখানে। বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো জাহাজ এসে আমাকে উদ্ধার করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার কপাল ভালো, বাঁচবো, তাই এমন একটা স্রোতে পড়ে গেলাম, যেটা আমাকে টেনে নিয়ে চললো। কোথায় যাবো, জানতাম না। উত্তর মেরুর দিকে, না দক্ষিণ আমেরিকার দিকে। যেদিকেই যাই, বাঁচবো না এটা ঠিক, ধরেই নিয়েছিলাম। সকাল বেলা দেখতে পেলাম ওটাকে। কাছেই। খুব নিচু, পানির সমতল থেকে সামান্য উঁচুতে। দ্বীপটা দেখলাম না, চোখে পড়লো শুধু নারকেল গাছের মাথা। মনে হলো, পানি থেকে গজিয়ে উঠেছে। আশা হলো মনে। সাঁতরাতে শুরু করলাম সেদিকে। ভালো করেই জানি, শুধু পানিতে নারকেল গাছ জন্মাতে পারে না। ডাঙা আছেই। আজব একটা ব্যাপার ঘটলো আমার মধ্যে, বাঁচার সম্ভাবনা দেখা দিতেই। যতোক্ষণ জেনেছি, মৃত্যু নিশ্চিত, ভয়-ডর-আশঙ্কা কোনো কিছু ছিলো না। যেই বাঁচার আশা দেখলাম অমনি সেসব এসে চেপে ধরলো। সেই সঙ্গে উদ্বেগ আর উত্তেজনা। মনে হতে লাগলো গাছগুলোর কাছে

পৌঁছার আগেই হাঙরে ধরে খেয়ে ফেলবে, কিংবা ডুবে যাবো সাঁতরাতে না পেরে।

কাছে পৌঁছে গেলাম। এটা সেই দ্বীপ, জাহাজ থেকে যেটা দেখেছিলাম। আরেকটু হলেই তীরে গিয়ে তরী ডুবতে বসেছিলো আমার। ভীষণ ঢেউ আছড়ে পড়ছিলো তীরে। চুবিয়ে মারার জোগাড় করেছিলো। সেই দশটা মিনিট জীবনে ভুলতে পারবো না আমি। প্রতিটা অ্যাটল ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রবালের দেয়াল, তার ভেতরে লেগুনের শান্ত পানি। কিন্তু সেখানে যাওয়া সহজ নয়। কোন্ দিক দিয়ে মুখ বুঝতে পারলাম না। কিছু লেগুন আছে প্রশান্ত মহাসাগরে যেগুলোতে ঢোকার কোনো মুখই থাকে না সাগরের দিক থেকে। তার বাইরের দেয়ালগুলোতে যে কি ভয়ানক বেগে ঢেউ আছড়ে পড়ে না দেখলে বুঝবে না। প্রচণ্ড কোনো শক্তি পাহাড়ের মতো অনড় কোনো কিছুকে নড়াতে চাইলে যে কাণ্ডটা ঘটবে, অনেকটা সেরকম ব্যাপার, আর কোনো ভাবে বোঝাতে পারছি না। হাজার হাজার টন পানির বোঝা নিয়ে একেকটা ঢেউ গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। দেখে মনে হবে এমন শক্ত কোনো জিনিস নেই যা ঠেকাতে পারে ওই ঢেউকে। কিন্তু আটকে ফেলছে প্রবালের দেয়াল। ঢেউয়ের গোড়ায় ধরে টান মেরে যেন ছিনিয়ে নিচ্ছে ওটার ভিত। পুরো একটা মিনিট শূন্যে ঝুলে থাকছে পানির পর্বত, তারপর হাজারো বজ্রের মিলিত শব্দকে এক করে ধসে পড়ছে হুড়মুড় করে। টগবগ করে যেন ফুটছে ওখানে সাগর, শাদা ফেনা তৈরি করছে, লম্বা একটা শাদা রেখা সৃষ্টি করছে সেসব ফেনা, যেন ফেনার স্তূপকে টেনে লম্বা করে দিচ্ছে অদৃশ্য কোনো হাত। সরে যেতে চাইছে পরাজিত ঢেউয়ের সঙ্গে, কিন্তু দেয়ালের মায়া কাটাতে না পেরে রয়ে যাচ্ছে পরের ঢেউটা আসার অপেক্ষায়। চলছে এভাবেই। বছরের পর বছর, একটানা। থামাথামি নেই। মাঝে মাঝে যেন খেপে গিয়ে সমস্ত রাগ প্রবালের ওপর ঢেলে দেয় সাগর, ঝাল মেটাতে চায়। সেটা হারিকেনের সময়। ওই সময় কোনো নৌকা কিংবা মানুষ ঢেউ আর দেয়ালের মাঝখানে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি যখন পৌঁছলাম তখন হারিকেন ছিলো না। সাঁতরাতে থাকলাম দেয়ালের ধার দিয়ে। পেয়ে গেলাম একটা পথ। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। ঢেউ এসে ধরে ফেললো আমাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলো দেয়ালের ভেতরে, একেবারে সময়মতো, কারণ তখন কয়েকটা হাঙর আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলো আমার প্রতি। কয়েক মিনিট ধরেই আমার পিছে লেগেছিলো। ভেজা একটা কম্বলের দলার মতো গিয়ে নেতিয়ে পড়লাম সৈকতে।'

'লোক-টোক ছিলো দ্বীপে?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো মুসা। উত্তেজনায় কাঁপছে তার কণ্ঠ। সাংঘাতিক আগ্রহ নিয়ে শুনছে ডজের গল্প।

'না,' জবাব দিলো ডজ। 'আগেই তো বলেছি নির্জন। রবিনসন ক্রুসো হয়ে গেলাম। একা, শুধু একা আমি, আর কেউ নেই। সে অন্তত একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলো দ্বীপে, আমি তা-ও পেলাম না। সৈকতে পড়ে থাকতে দেখলাম শুধু নানারকম ঝিনুক আর নারকেল। প্রথম ভাবনাটা হলো পানির জন্যে। যদি মিষ্টি পানি না থাকে? কিন্তু ঈশ্বর কাউকে বাঁচাতে চাইলে সব ব্যবস্থা করেই দেন। আমাকেও দিলেন। পানি আছে দ্বীপে। ওই নোনা পানির মাঝে কোত্থেকে যে এলো ওই মিষ্টি পানি, বলতে পারবো না। এই প্রশ্নের জবাব আমি কিছুতেই বের করতে

পারিনি। পানি খেলাম। নারকেল খেলাম। বালিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করলাম শরীরে। তারপর উঠলাম দ্বীপটা ঘুরে দেখতে। কোন স্বর্গে উঠেছি জানার আগ্রহ হলো খুব। খুবই সুন্দর দ্বীপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেগুনের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, এতোই সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য দেখার অবস্থা তখন নেই আমার। একটা কথা এখন জোর গলায় বলতে পারি, রবিনসন ক্রুসোর গল্প পড়তে যতো ভালো লাগে, বাস্তবে তার মতো অবস্থায় পড়লে লাগে ঠিক উল্টোটা। যেমন খারাপ লাগে, তেমনি অসহায়। যতোই ভাবতে লাগলাম বাকি জীবনটা এখানেই একা কাটাতে হবে, ততোই চুপসে যেতে লাগলাম ভেতরে ভেতরে। ভাবো একবার, এতো টাকার মুক্তো পেলাম, জানি কোথায় আছে, তুলে নিতে পারলেই রাজার হালে কাটাতে পারি জীবনটা। তা না, হয়ে গেলাম রবিনসন ক্রুসো। আর কোনো জাহাজ না আসুক, মুক্তোর খোঁজে কারনেসের জাহাজ আসতে পারে, হয়তো বাড়ি ফেরার একটা ব্যবস্থা হলেও হতে পারে, এই আশায় তাকিয়ে রইলাম সাগরের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললাম, জাহাজ আর এলো না। আর দেখলাম না তার স্কুনারটাকে।'

'ওই দ্বীপে কতোদিন ছিলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'মাত্র তিন মাস। আরেকবার আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রাটুনা থেকে দু'জন মারকুইজান এসে ক্যানুতে করে নিয়ে যায় আমাকে। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে। মেয়েটার মারকুইজান নামের ইংরেজি অর্থ করলে হয় 'সাগরের হাসি', আর ছেলেটার ঝিনুক। ওরকম নামই পছন্দ ওখানকার লোকের। কঠিন নাম নয়। সহজ। বেশির ভাগই সাগর কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। মনে রাখা বোধহয় সহজ, সে-জন্যেই। মাছ ধরতে বেরিয়েছিলো দু'জনে, অ্যালবিকোর মাছ। ছোট একটা ঝড়ে পড়ে, স্রোতের মুখে পড়ে যায়। ভেসে যায় দূর সাগরে। তাতে মোটেও উদ্বিগ্ন হয়নি ওরা। ওরকম হরহামেশাই ঘটে। সাগরে ভেসে যায়, আবার বাড়ি ফেরে। সাগরও ওদের কাছে ডাঙার মতোই। ডাঙায় যেরকম সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে পারে, পানিতেও তেমনি সাঁতরাতে পারে। পানিকে একটুও ভয় করে না। ভাসতে ভাসতে এসে আমার দ্বীপটা চোখে পড়েছিলো ওদের। পানি আর নারকেলের জন্যে চলে এসেছিলো। পেয়ে গেল আমাকে। কি হাসাটাই না হাসলো আমাকে ওখানে দেখে, যেন এক মস্ত রসিকতা। ওদের কাছে ওরকম দ্বীপে থাকাটা তো কিছু না, সেজন্যে কিছুই মনে করলো না। তবে আমি খুশি হয়েছিলাম ওদেরকে দেখে, সাংঘাতিক খুশি। সাথে করে আমাকে রাটুনায় নিয়ে গেল ওরা।

'তারপর ক্যানুতে করে এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপ, সে দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ করতে করতে দু'মাস পরে গিয়ে নুকা-হিভায় পৌঁছুলাম। ওই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় দ্বীপ ওটা। আরও তিন মাস অপেক্ষা করতে হলো আমাকে জাহাজের জন্যে জর্জি গ্রিম এলো তার স্কুনার নিয়ে, তুলে নিলো আমাকে। তাহিতিতে পৌঁছে দিলো। জানতে পারলাম, কারনেস ফিরে এসেছিলো, তারপর আবার চলে গেছে। এসেই তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ায় আমি ভাবলাম, নিশ্চয় মুক্তোর সন্ধানে গিয়েছে সে। যাবেই। তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এতো টাকার সম্পদ দেখে এসে কোন্ মানুষটা আনতে যাবে না? সে গেলেও আমি চিন্তা করলাম

না। আসল অবস্থান জানা নেই তার। কিছুতেই বের করতে পারবে না অতো বড় মহাসাগরের মাঝে। শুধু আমি জানি কোথায় আছে সেই ঝিনুকের খেত। আর গাধাটা আমাকে খুন করতে না চাইলে অবশ্যই জানিয়ে দিতাম ওকে।

মুক্তোগুলো তুলে আনার জন্যে ভাবনাচিন্তা শুরু করলাম। দ্বীপের এক জাহাজের মালিককে লোভ দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমার সঙ্গে গেলে তাকে আধাআধি বখরা দেয়ার কথাও বললাম। রাজি হলো না। বিশ্বাসই করলো না আমার কথা। ওসব অঞ্চলে এরকম গল্প প্রায়ই এসে বলে নাবিকেরা, বেশির ভাগই মিথ্যে। তাই কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। হেসেই উড়িয়ে দেয়। আর ওদেরই বা দোষ দেব কি। আমি নিজের চোখে না দেখলে কেউ এসে যদি ওই গল্প আমার কাছে বলতো, আমিও বিশ্বাস করতাম না। আমিও মুখের ওপর হাসতাম। যদিও এরকম খেত অনেক পাওয়া গেছে। মুক্তোও তুলে নিয়ে এসেছে কেউ না কেউ।

'রাটুনায় থাকার সময় স্থানীয়রা আমাকে কয়েকটা ছোট মুক্তো উপহার দিয়েছিলো। অন্যান্য দ্বীপেও পেয়েছি কিছু। বিক্রি করে টাকাও পেয়েছি। কিন্তু এতোই সামান্য, তা দিয়ে বড় ধরনের একটা অভিযান চালানো সম্ভব নয়। অনেক খরচ। জাহাজ ভাড়া করতে হবে, ডুবুরির পোশাক লাগবে, আরও অনেক জিনিস। তাহিতিতে বেশিদিন থাকতে সাহস হলো না। কোন্ দিন ফিরে চলে আসে কারনেস, ঠিক নেই। মুখোমুখি হলে আমাদের একজনকে মরতেই হতো, খুনের দায়ে অ্যারেস্ট হতো আরেকজন। টাকা জোগাড়ের জন্যে চলে গেলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানেও একই অবস্থা। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। দু'একজন যা-ও বা করলো, এতো বেশি খবর জানতে চাইলো, বলাটা উচিত মনে করলাম না। ওরা একেবারে জায়গার ঠিকানাই চায়। বলে দিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিজেরাই যদি চলে যায় কিছুই করতে পারবো না। শেষে ভাবলাম, পৃথিবীতে এখন টাকার জায়গা বলতে আমেরিকা আর জাপান। জাপানীরা বেশি চালাক, ওদেরকে রাজি করাতে পারবো না। বাকি থাকলো আমেরিকা। চলে এলাম। মনে করলাম যদি কেউ ইনটারেস্টেড হয়...'

'তেমন কাউকে পেয়েছো?' জানতে চাইলো ওমর।

'না।'

'পাবে বলেও মনে হয় না। আসলে, কাউকে বিশ্বাসই করাতে পারবে না। আর কেউ যদি করেও, এতোবড় জুয়া খেলতে রাজি হবে না।'

'জুয়া!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো ডজ, 'জুয়া বলছো কেন? সোজা আমি জায়গাটায় নিয়ে চলে যেতে পারি।'

নোটবুক আর পেন্সিল বের করলো ওমর। 'তাহিতি থেকে তোমার দ্বীপটার দূরত্ব কতো? নাম কি?'

'কোনো নাম নেই। ম্যাপে বের করতে পারিনি। ওদিকের অনেক দ্বীপের নামই ম্যাপে নেই। নেভির চার্টে হয়তো থাকতে পারে।'

'হুঁ। বেশ, তাহলে একটা নাম ঠিক করে ফেলা যাক। যাও, ওটার নাম রেখে দিলাম ডজ আইল্যাণ্ড। তাহিতি থেকে কদ্দূর?'

'আটশো মাইল মতো হবে।'

'লেগুনে জাহাজ ঢোকানো যাবে? নিরাপদ?'

'তা যাবে।'

'প্লেন তো নেয়া যাবে না। এক কাজ করা যেতে পারে। ফ্লাইং বোট। ল্যাণ্ড করা যাবে?'

'উড়ে যাওয়ার কথা ভাবছো নাকি?'

'কেন নয়?'

গাল চুলকালো ডজ। 'না, তেমন অসুবিধে নেই। তবে একবারও কথাটা মনে আসেনি আমার। পকেটে টাকা না থাকলে বুদ্ধিও খোলে না। স্কুনারে করে যাওয়ার চেয়ে তাতে খরচ বেশি পড়বে।'

'কিন্তু যাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি।'

'তা যাবে।'

'ফ্লাইং বোট থেকে পানিতে নামা যাবে? ডুব দিয়ে ঝিনুক তোলার জন্যে?'

'যাবে। আবহাওয়া ভালো থাকলে। ওখানকার সাগর শান্তই থাকে দেখেছি।'

'ডাইভিঙের অভ্যাস তো নিশ্চয় করে ফেলেছো। এতোদিন ওখানে থেকে যখন মুক্তো তোলার কাজ করেছো।'

'ভালোমতো।'

'কি কি জিনিস লাগবে, জান তো? ভুলচুক করবে না?'

'নিশ্চয় জানি। করবো না।'

'তাহলে, ফ্লাইং বোটের ব্যবস্থা যদি করে দিই, আর সমস্ত খরচ-খরচা জোগাড় করে দিই, মুক্তোর বখরা দিতে রাজি আছো?'

'দেবো না মানে! নিশ্চয়ই দেবো!' চেঁচিয়ে উঠলো ডজ। 'তুমি সব খরচ দেবে, আমি তুলে আনার ব্যবস্থা করবো। আধাআধি ভাগ হবে।'

'আধাআধিতে চলবে না। এতো টাকা আমি একলা দিতে পারবো না। কিশোরের সাহায্য লাগবে। কি কিশোর, তোমার চাচার কাছ থেকে কিছু জোগাড় করতে পারবে?'

'পারবো,' বলতে একটুও দ্বিধা করলো না কিশোর। চাচাকে চেনে সে। এরকম ঝুঁকি নেয়ার অভ্যাস আছে তাঁর। অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন জীবনে। মেরিচাচীর বাধা না থাকলে এই অভিযানে শুধু টাকা দেয়াই নয়, তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়তেন, জানে সে। 'তবে, তিন ভাগ করলে চলবে না। আমার সঙ্গে মুসা আর রবিনও যাচ্ছে। পাঁচ ভাগ করতে হবে। কি বলো, মুসা?'

'আমি অবশ্যই যাবো,' মুসা জবাব দিলো। 'তবে মুফতে বখরা নিতে চাই না। বাবাকে বলে আমিও কিছু টাকার বন্দোবস্ত করতে পারবো আশা করি, যদি মাকে না শোনাই।'

'ভেরি গুড,' ওমর বললো। 'আর রবিন?'

'তার বাবাও যে কিছু দেবেন না, তা নয়,' কিশোর বললো। 'তবে রবিন যেতে পারবে কিনা সেটাই কথা। আজকাল ও ভীষণ ব্যস্ত, গানের ব্যবসায়। মিস্টার বার্টলেট লজ ইদানীং তাকে বেতনের টাকা তো দেনই, কমিশনও দিতে

আরম্ভ করেছেন। ফলে ইস্কুলের পড়ালেখা আর মিউজিক ছাড়া এখন আর কিছু বোঝে না রবিন।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'রবিনটা যে এভাবে বদলে যাবে, কল্পনাই করিনি কোনোদিন।' তার কণ্ঠে দুঃখের সুরটা অপ্রকাশিত থাকলো না।

'দেখা যাক, বলে। যেতে রাজি হলে ভালো। না হলে আমরা দু'জনেই যাবো। এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার মিস করা যায় না। কি বলো?'

'তা তো বটেই। দক্ষিণ সাগরে গিয়ে আরেকবার শুঁয়াপোকা খেতে হলেও আপত্তি নেই আমার, তবু যাবো।'

তার কথায় হাসলো ডজ। 'না, শুঁয়াপোকা আর খেতে হবে না, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে প্রচুর নারকেল খেতে হতে পারে।'

'নারকেল তো ভালো জিনিস। আমার মজাই লাগে।'

'তাহলে,' কাজের কথায় এলো ডজ। 'কবে রওনা হচ্ছি আমরা?'

'জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলেই। এখনই একটা চেক নিয়ে যেতে পারো। যা যা লাগবে লিস্ট করে নিয়ে কিনতে শুরু করে দাও। তবে খরচ যতোটা কম করা যায় সেই চেষ্টা করবে। ফ্লাইং বোটের ব্যবস্থা আমি করবো।'

দুই ঢোকে গেলাসের বাকি পানীয়টুকু শেষ করে ফেললো ডজ। হাত বাড়ালো, 'দাও, চেক। এখুনি বেরিয়ে যাই। আর ভাবনা নেই। ওই মুক্তো এখন আমাদের!'

'একটা ঝুড়ি কিনতে ভুলো না যেন,' হেসে মনে করিয়ে দিলো ওমর। 'তুমি বলেছিলে ঝুড়ি বোঝাই করে মুক্তো আনতে পারবে। তার কম হলে চলবে না আমাদের।'

দুই

যদিও একটা দিনও নষ্ট করেনি ওরা, তারপরেও দক্ষিণ সাগরে ওদের প্রথম সাময়িক ঘাঁটিটাতে পৌছতেই এক মাস পার হয়ে গেল। অনেক কাজ করতে হয়েছে। বসে বসে প্ল্যান করেছে ওমর, এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে কিশোর। কারণ এই বুদ্ধিটুদ্ধিগুলো তার মাথায়ই ভালো খেলে। জিনিসপত্র কিনতে ডজকে সাহায্য করেছে মুসা। ডাইভিঙের ব্যাপারটা কিশোরের চেয়ে ভালো বোঝে সে। রবিন সত্যিই আসতে পারেনি, পারলো না বলে অনেক দুঃখ করেছে। তবে রকি বীচে থাকতে অনেক সাহায্য করেছে সে, জিনিসপত্র জোগাড়ের কাজে। আরও নানারকম সাহায্য করেছে। হঠাৎ করে জরুরী কাজে বার্টলেট লজ ইউরোপে চলে না গেলে সে অবশ্যই বসে থাকতো না মিউজিকের ব্যবসা নিয়ে, আসতোই সঙ্গে।

ওমর আর কিশোরকে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। যেমন প্রথমেই ভাবতে হয়েছে, দ্বীপে বিমান নামানোর ব্যাপারটা। কি করে নিয়ে যাবে? অনেক জটিলতা আছে। নিয়ে যাওয়ার জন্যে সরকারী অফিস থেকে অনুমতি জোগাড় করতে হয়। তবে সেটা সহজ কাজ। কঠিন কাজটা হলো বিমানটাকে

জায়গামতো নিয়ে যাওয়া। আর কোন ধরনের বিমান নিয়ে গেলে সুবিধে হবে সেটাও বুঝতে হবে।

যেরকম জায়গা, বিমান নিয়ে যাওয়ার দুটো উপায় আছে। এক, জাহাজে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া। দুই, উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সহজে যাওয়া আর খরচ কমাতে চাইলে জাহাজে তুলে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। আরেকটা বড় সমস্যা হলো, এসব কাজের জন্যে বিমান ভাড়া দিতে চায় না কেউ। কিনতে হবে। আধুনিক বিমানের অনেক দাম। কম দামে পুরনো আমলের জিনিস পাওয়া যায়। তবে কাজ চলার মতো মজবুত আর ভালো জিনিস পাওয়াটা সহজ নয়। তবু খুঁজতে শুরু করলো ওমর।

পেয়েও গেল বিমান বাহিনীর পুরনো বিমান ফেলে রাখার গুদামে। অনেক পুরনো আমলের একটা ফ্লাইং বোট, টুইন ইঞ্জিন। বেশি চলেনি। তবে পড়ে থেকে থেকে অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। তা নিয়ে ভাবে না ওমর। নিজেই সারিয়ে নিতে পারবে। একটু বেশি খাটতে হবে আরকি। লম্বা ডানাওয়ালা মনোপ্লেন ওটা। বড় ট্যাঙ্ক। একবার তেল ভরে নিলে অনেক দূর যাওয়া যায়।

দরাদরি করে বেশ শস্তায়ই জিনিসটা কিনে নিয়ে এলো ওমর। মেরামতের কাজ শুরু করে দিলো। তাকে এ-ব্যাপারেও সাহায্য করতে লাগলো কিশোর আর মুসা, খুশি হয়েই। বিমান সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে তাতে। কাজও চলতে লাগলো, সেই সঙ্গে আলোচনাও, কোথায় কিভাবে নিয়ে যাবে বিমানটাকে। ডজ পরামর্শ দিলো, জিনিসপত্র সব নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যাবে সে। গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রাখবে। এতো পুরনো একটা ফ্লাইং বোট নিয়ে তাহিতিতে গেলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবেই। একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। সেটা এড়ানো গেলেই ভালো। গোপন একটা মিশনে চলেছে ওরা, এতো মানুষের নজরে পড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোনো এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি রারাটোঙ্গা দ্বীপে পেট্রোল আর তেল পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে খুব ভালো হয়। দ্বীপটা যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার প্রধান জাহাজ-পথটাতেই পড়ে, তেল পাঠানোর অসুবিধে হবে না। তাই সরাসরি রারাটোঙ্গায় চলে যেতে চায় সে। সেখানে বিমানটার জন্যে খানিকটা তেল রেখে দেবে। বাকিটা জলপথে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে ভেইটিতে। কুক দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে ছোট দ্বীপগুলোর একটা হলো ভেইটি। দ্বীপ ছোট হলে হবে কি, অনেক বড় একটা লেগুন আছে ওখানে। ফ্লাইং বোট নোঙর করিয়ে রাখার চমৎকার ব্যবস্থা হতে পারে ওই লেগুনে। বার বার তেল ভরা যাবে ওখানে রেখে। রারাটোঙ্গা থেকে বিমানটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওখানে। ভেইটি থেকে ডজকে তুলে নিয়ে সোজা রওনা হয়ে যাবে বিমানটা ডজ আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধে। অকারণ অনেক ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

আরও কিছু পরিকল্পনা করা হলো। তবে সবগুলোর মধ্যে ডজের পরামর্শটাই উপযুক্ত মনে হলো। ওমরের মন খুঁতখুঁত করতে লাগলো যদিও। এর চেয়ে ভালো আর কোনো বুদ্ধি বের করতে না পেরে অবশেষে সেটাই মেনে নিলো সে। বিমানটাকে তুলে দেয়া হলো একটা স্টীমারে। রারাটোঙ্গায় নামিয়ে দেবে। ওটার

সঙ্গেই যাবে ওমর, কিশোর আর মুসা।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ডজ। মাসখানেক পরে রারাটোঙ্গায় পৌঁছে কিশোররা দেখলো প্ল্যানমাফিক তেল রেখে ভেইটিতে চলে গেছে সে।

তেল-টেল ভরে, বিমানটাকে একবার পরীক্ষামূলক ভাবে উড়িয়ে দেখলো ওমর। ঠিকই আছে। তিন অভিযাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওটা ভেইটির উদ্দেশে। ওখানে পৌঁছে দেখলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে ডজ, এতে ওদের পরিকল্পনায় একটা বড় রকম পরিবর্তন হয়ে গেল। সে ঠিকমতোই পৌঁছেছে ওখানে, তেল আর জিনিসপত্রও বহাল তবিয়তেই আছে, কিন্তু তার নিজের হাতটা রয়েছে স্লিঙে ঝোলানো। বেশ লজ্জিত হয়েই সে তার এই দুর্ঘটনার কাহিনী শোনালো।

ভেইটিতে সময়মতোই পৌঁছেছিলো সে। দ্বীপটায় মানুষের বসবাস নেই। পালতোলা ছোট যে জাহাজটায় করে সে ওখানে পৌঁছেছে তার ক্যাপ্টেন স্থানীয় লোক, পলিনেশিয়ান, নাম হাইপো—বললো, একটা কাজে তাহিতিতে ফিরে যাচ্ছে। ফেরার পথে খাবার পানি নেয়ার জন্যে আবার থামবে ভেইটিতে। শুনে ডজের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। অযথা দ্বীপে বসে থেকে একা একা কি করবে? জিনিসপত্র রেখে চলে যেতে পারে হাইপোর সঙ্গে। জাহাজটা তো ফিরবেই, তখন আবার না হয় ফিরে আসা যাবে। তাহিতিতে গিয়ে বরং গুডু কারনেসের খোঁজখবর নেয়া ভালো। লোকটা কোথায় আছে এখন, কি করছে, জানা থাকলে সুবিধে। ডজ মুক্তোর খেতটা আবিষ্কারের পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। হয়তো ইতিমধ্যে ওটা বের করে ফেলেছে কারনেস। ফেলে থাকলে খবরটা চেপে রাখতে পারবে না। সেটাই জানার জন্যে তাহিতিতে চললো আবার ডজ।

বন্দরে পা দিয়েই প্রথম যে লোকটার ওপর চোখ পড়লো তার, সে হলো স্বয়ং কারনেস। তাড়াতাড়ি আবার জাহাজে উঠে পড়তে চেয়েছিলো ডজ, পারলো না, দেখে ফেললো তাকে কারনেসের এক সাগরেদ। একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে হামলা করে বসলো। হাতে ছুরির খোঁচা খেলো ডজ।

দ্বীপের গভর্নরকে ব্যাপারটা জানাতে পারতো সে। তাতে হয়তো কারনেসকে পাকড়াও করতো পুলিশ। কিন্তু কেন এই শত্রুতা তা জানার চেষ্টা করতেনই গভর্নর। মুক্তোর খেতের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় ছিলো তাতে। কাজেই বাড়াবাড়ি না করে সোজা এসে আবার জাহাজে উঠলো ডজ। হাইপোকে অনুরোধ করলো তখনি তাকে ভেইটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নিয়ে এসেছে হাইপো। কিশোররা আসার একটু আগে ভেইটিতে পৌঁছেছে ডজ। তখনও নোঙর করা রয়েছে হাইপোর জাহাজ। যায়নি।

জখমটা এক পলক দেখেই বুঝতে পারলো ওমর, ডাইভিঙের ক্ষমতা নেই এখন ডজের। মুক্তো তোলার জন্যে সাগরে ডুব দিতে পারবে বলেও মনে হলো না। অনেকখানি মাংস কেটেছে, চিরে একেবারে হাঁ হয়ে আছে। পচবে কিনা কে জানে! জ্বর এসে গেছে ইতিমধ্যেই। এই অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এমনিতেই ওসব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ঘা শুকাতে দেরি হয়। তা-ও ঠিকমতো ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা গেলে। অভিযানে যাওয়া বাদ, ভাবলো ওমর। বরং

এখানে থেকে এখন ভালোমতো ওষুধ দিয়ে ডজের জখমের চিকিৎসা করা দরকার।

অযথা বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে বরং তাহিতিতে চলে যাওয়া ভালো, ভাবলো সে, হাইপোর জাহাজটা যখন রয়েছে। লোকটার যেতে কোনো আপত্তি নেই, সে ভাড়া পেলেই খুশি। তাহিতিতে বিমান নামাতে চায়নি ডজ, লোকের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। সেটা এড়ানো গেছে। জাহাজে করে এখন ওমর আর আরেকজন যদি যায়—মুসা কিংবা কিশোর, যে কোনো একজন হতে পারে, তাহলে কারো চোখে পড়বে না। কতো নতুন লোকই তো তাহিতিতে যায়, আসে। আরেকটা ভয় ছিলো ডজের, কারনেসের চোখে পড়ার ভয়। সে ভয় করেও আর লাভ নেই। যা ঘটার ঘটে গেছে, চোখে পড়েই গেছে লোকটার। হাইপোর জাহাজে করে গিয়ে এখন আবার ওমররা তাহিতিতে নামলে কারনেস দেখে ফেলবে, আর অনেক কিছু অনুমান করে ফেলবে। করুক। তাতে আর কিছু যায় আসে না। ডজকে দেখেই হয়তো যা করার করে বসে আছে সে। বরং গিয়ে এখন খোঁজ নেয়া দরকার কতোটা বুঝেছে কারনেস, আর কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

কাজেই সেই রাতেই হাইপোর জাহাজে করে তাহিতিতে ফিরে চললো কিশোর আর ওমর। মুসাকে রেখে এসেছে ডজের কাছে। জখম বেশি খারাপ হয়ে গেলে যাতে বিমানে করে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে তাহিতিতে।

এরকম ছোট জাহাজে বিশাল মহাসাগরে বেরোনো কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয় কিশোরের কাছে। আগেও এসেছে এখানে। শুধু নারকেল গাছের কাণ্ড সম্বল করে ভেসে পড়েছিলো বিপজ্জনক সাগরে। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো জাহাজ ঘিরে হাঙরের ঘোরাফেরা। খাবারের গন্ধ পেয়ে গেছে যেন প্রাণীগুলো, কাছছাড়া হতে চাইছে না আর।

বাতাস চমৎকার। আবহাওয়াও ভালো। নিরাপদেই তিনদিন পরে তাহিতিতে এসে পৌঁছলো জাহাজ। বেশি সময় ওখানে থাকার ইচ্ছে নেই ওমরের। কারনেসের খোঁজ নেয়া হয়ে গেলেই ফিরে যাবে ভেইটিতে।

ডজের পরামর্শ মতো প্রথমেই দু'জনে চলে এলো রেস্টুরেন্ট ডু পোর্টে। প্রায় ভরে গেছে জায়গাটা। মানুষ আর তাদের বিচিত্র আচরণ দেখতে ভালো লাগে কিশোরের। কৌতূহল নিয়ে তাকালো। মানুষ দেখার জন্যে এরকম জায়গা খুব কমই আছে। ভালো পোশাক পরা কয়েকজন টুরিস্ট দেখা গেল। তাদের বেশির ভাগই আমেরিকান। জাহাজের ক্যাপ্টেন রয়েছে কয়েকজন, ওরা সব স্থানীয় লোক। শ্বেতাঙ্গ রয়েছে বেশ কিছু, দাড়িওয়ালা, নানা দেশ থেকে এসেছে জীবিকা আর রোমাঞ্চের সন্ধানে। পৃথিবীতে যতো রঙের চামড়ার মানুষ আছে, কালো থেকে হলুদ, সব আছে এখানে। রয়েছে চীনা ব্যবসায়ী। পলিনেশিয়ান আছে কয়েকজন, কানের পেছনে আর চুলে রঙিন ফুল গোঁজা। ঢুকতেই ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, চীনা আর আরও অসংখ্য ভাষার মিলিত কণ্ঠ এসে কানে ধাক্কা মারলো যেন কিশোরের।

.এক কোণে দুটো চেয়ার দেখে এগিয়ে গেল ওমর। কিশোরকে নিয়ে বসে খাবারের অর্ডার দিলো। গলা নামিয়ে কিশোরকে বললো, 'কোত্থেকে তদন্ত শুরু

করবো বুঝতে পারছি না। হাইপো তো বললো কাজ সেরে আসবে। তাকে দিয়ে যদি কোনো সুবিধে হয়। কি বলো?'

'কারনেসের কথা তাকে বলেছেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'জাহাজে তো দেখলাম আপনাদের দু'জনের খুব ভাব।'

'না। তবে ও আন্দাজ করে ফেলেছে, কারনেসের সঙ্গে মন কষাকষি চলছে আমাদের কোনো কারণে। ডজকে মারতে দেখেছে ও। শত্রুতা যে আছে বুঝে গেছে। মুক্তোর কথা জেনেছে কিনা কে জানে। ভেইটিতে আমরা অনেক কথা বলছি। আড়ি পেতে কিছু শুনে থাকতে পারে।'

'যদি আড়ি পাতে।' বিশালদেহী, স্বাস্থ্যবান পলিনেশিয়ান লোকটাকে খারাপ মনে হয় না কিশোরের। 'আমার মনে হয় ওকে বিশ্বাস করতে পারি আমরা। তার সাহায্য পাবো। এখানকার লোক সে। তার ওপর নাবিক। এখানকার অনেক গুজবই তার কানে যাবে। তার কাছে···ওই তো, এসে গেছে।'

কিশোর লক্ষ্য করলো, শুধু ওরা দু'জনেই নয়, হাইপো ঢোকার পর অনেক জোড়া চোখই তার দিকে ঘুরে গেছে। সে চোখগুলোতে কৌতূহল। সোজা কিশোরদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো সে। একটা চেয়ার টেনে বসলো। 'আপনারা ক্যাপ্টেন কারনেসের খোঁজ করছেন তো?' ইংরেজি আর ফরাসী ভাষার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে কথা বলে সে। ফিসফিস করে বললো।

চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলো ওমর। মাথা ঝাঁকালো। 'হ্যাঁ, খুঁজছি।'

'খারাপ লোক।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'সাবধানে থাকবেন।'

'কেন? আমাদের সঙ্গে কেন লাগতে আসবে সে? চিনিই তো না।'

'ওই লোক সবার সঙ্গেই ঝগড়া বাধায়। কালও গণ্ডগোল করেছিলো।'

'তার মানে এখানেই আছে?'

'হ্যাঁ। তার স্কুনার হোয়াইট শার্ক পাপিতি বন্দরে নোঙর করা রয়েছে। রাটুনা থেকে এসেছে আজ সকালে। কাল ভোরেই আবার জাহাজ নিয়ে বেরোবে। মালপত্র বোঝাই করছে জাহাজে, অনেক জিনিস।'

'গণ্ডগোলটা কি করেছে?'

'রাটুনা থেকে জোর করে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে কাজ করানোর জন্যে। কাল বন্দরে নেমেই পালানোর চেষ্টা করেছিলো ছেলেটা। ধরে ফেলে তাকে প্রচণ্ড মার মেরেছে কারনেস। সে বলছে, জাহাজে কাজ করার জন্য চুক্তি করেছে ছেলেটা, আগাম টাকাও নিয়েছে, এখন পালাবে কেন? জোর করে ধরে আবার জাহাজে তুলেছে।'

'কাল ভোরে চলে যাচ্ছে, না?'

'হ্যাঁ। গভর্নর তাকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'বলেনি। কারনেস আর তার সাগরেদরা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না।

কেউ জিজ্ঞেস করতে গেলে শুধু চোখ টেপে ওরা, আর মিটমিট করে হাসে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার লোকেরা শুনে এসেছে। বন্দরে নেমেছিলো, সেখান থেকে।'

'ছেলেটার কি অবস্থা? রাটুনা থেকে যাকে ধরে এনেছে?'

'কি জানি!' হাত ওল্টালো হাইপো। 'তবে খারাপই হবে। কারনেসের হাতে কেউ পড়লে তার আর ভালো হওয়ার উপায় নেই। সবাই ভয় পায় লোকটাকে।'

'গভর্নরও?'

'মনে তো হয়। নইলে ধরে কিছু করেন না কেন? শুধু বেরিয়ে যেতে বলেছেন।'

'এতোই খারাপ,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'তো, ছেলেটা পালিয়েছিলো কিভাবে? ওরকম একজন লোকের হাত ফসকে?'

'জাহাজের রেলিঙ টপকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। পানিকে ওরা ভয় পায় না।'

কি যেন ভাবছে কিশোর। আনমনেই বিড়বিড় করলো, 'রাটুনা থেকে ধরে আনলো...পানিকে ভয় পায় না...হাইপোর চোখের দিকে তাকালো। ছেলেটার নাম বলতে পারেন?'

'পারবো না কেন? সবাই জানে। ঝিনুক।'

ঝট করে কিশোরের দিকে তাকালো একবার ওমর। হাইপোর দিকে ফিরলো। 'কি বললেন!'

'ঝিনুক।'

'হুঁ, যা ভেবেছিলাম!' নিচু গলায় বললো কিশোর।

'কি ভেবেছিলে?' জানতে চাইলো হাইপো। অবাক হয়েছে।

'না, কিছু না,' আরেক দিকে মুখ ফেরালো কিশোর। সে কি ভাবছে বুঝতে পারলো ওমর। হাইপোকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাটুনা থেকেই এনেছে তো?'

'নিশ্চয়।'

আর কোনো সন্দেহ রইলো না কিশোর কিংবা ওমরের। রাটুনাতে গিয়েছিলো কারনেস। কোনো ভাবে জেনেছে, ঝিনুকই উদ্ধার করে এনেছে ডজকে। তার মানে যে দ্বীপ থেকে এনেছে সেটার অবস্থান বলতে পারবে। এবং তার অর্থ ওই দ্বীপের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে মুক্তোর খেত। ছেলেটাকে ধরে এনেছে সেই জায়গা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে।

'এখানে এসে ভালোই করেছি, বুঝলে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো ওমর। 'একটা জরুরী খবর জানা গেল। এখুনি ভেইটিতে ফেরা দরকার। দেরি করা...' দরজার কাছে একটা হৈ চৈ শুনে ফিরে তাকালো সে। হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল সবাই। সব ক'টা চোখ ঘুরে গেছে সেদিকে। মোটা, গাট্টাগোট্টা একজন ইটালিয়ান লোক ঢুকেছে। ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো। মুখের মসৃণ চামড়া কালো দেখাচ্ছে রক্ত জমায়। আধবোজা চোখ। আস্তে করে মোচড় দিচ্ছে গোঁফে। তাকে দেখে সবাই যে এমন চমকে গেছে, এটা যেন উপভোগ করছে খুব।

চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে পড়েছিলো হাইপো, বসে পড়লো আবার। হাত

রাখলো ওমরের বাহুতে। 'কারনেস!' তার কণ্ঠে অস্বস্তি।

'তাতে কি হয়েছে? আপনি তো আর কিছু করেননি। এতো ভয় পাওয়ার কি হলো?'

'বুঝতে পারছেন না আপনি। আমার ওপর ওর কুনজর পড়লে বিপদে পড়ে যাবো। আমি কিছুই করতে পারবো না।'

'কেন পারবেন না?'

'কারনেস শাদা মানুষ। শাদা মানুষের গায়ে হাত তুললে মুশকিল হবে।'

অবাক হয়ে গেল ওমর। ঔপনিবেশিক শাসনের ছোঁয়া এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি এই অঞ্চল থেকে। এখনও এখানকার মানুষের মনে রয়ে গেছে শাদা মানুষের ভয়। নিশ্চয় এখনও ওদেরকে অত্যাচার করে শ্বেতাঙ্গরা। মাথা ঝাঁকালো সে, 'বুঝেছি।' পকেট থেকে টাকা বের করলো বিল দেয়ার জন্যে। চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকালো। ওদের টেবিলের কাছাকাছি এসে থেমেছে করসিকান লোকটা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে হাইপোর দিকে।

'এই কুত্তা!' খেঁকিয়ে উঠলো কারনেস, 'আমার জাহাজের কাছে ঘুরঘুর করছিলি কেন?'

'আপনার জাহাজের কাছেও যাইনি আমি, ক্যাপ্টেন কারনেস,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলো হাইপো।

বাঁকা হয়ে গেল কারনেসের ঠোঁটের এক কোণ। আরও কুৎসিত করে তুললো মুখটাকে। মুঠো হয়ে গেল আঙুল। 'ব্যাটা মিথ্যুক...' বলতে গিয়েই থেমে গেল। তাকালো ওমরের দিকে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'দেখুন,' কঠিন কণ্ঠে বললো ওমর। 'এটা আমার টেবিল। আপনাকে ডেকেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

চুপ হয়ে গেছে সবাই। থমথমে পরিবেশ।

জ্বলন্ত চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কারনেস। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে? বসো!'

তার ধমকের পরোয়াই করলো না ওমর। 'ভদ্রভাবে কথা বলো। তোমার সাগরেদ পেয়েছো নাকি আমাকে?'

'বসো!' চেঁচিয়ে উঠলো কারনেস। 'আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

'কি করবে?'

'এই কুত্তাটাকে ভর্তা বানাবো।'

মাথা নাড়লো ওমর। 'না, তা তোমাকে করতে দেয়া হবে না। কিছু করতে গেলে আমাকে নাক গলাতেই হবে।'

অবাক হলো যেন কারনেস। 'আমি কে জানো?'

'জানি। তুমি কে, কী, ভালো করেই জানি। তোমার নাম কারনেস। একটা সাধারণ গুণ্ডা। যে মনে করে এই দ্বীপটা তার সম্পত্তি। সরো, আমার টেবিলের সামনে থেকে!'

চোখের পলকে পকেটে হাত চলে গেল লোকটার। বেরিয়ে এলো একটা ছুরি। ঝিক করে উঠলো আলোয়।

বিদ্যুৎ খেলে গেল ওমরের শরীরে। এসব ছুরি-টুরির থোড়াই পরোয়া করে সে। থাবা দিয়ে পানির একটা গেলাস তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারলো কারনেসের মুখে। একলাফে এগিয়ে এলো। ধাঁ করে গিয়ে বাঁ হাতটা আঘাত হানলো লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। প্রচণ্ড আঘাতে ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে এলো করসিকানের মাথা। ওমরের ডান হাতের ঘুসি লাগলো তার চোয়ালে। মাঠ পার করে দেয়ার জন্যে ক্রিকেট বলকে ব্যাট দিয়ে বাড়ি মারলে যেমন হয় শব্দ হলো সেরকম।

গুঙিয়ে উঠলো কারনেস। টলে উঠলো। ধারালো দা দিয়ে এক কোপে কলাগাছের গোড়া কেটে দেয়া হলো যেন, ধীরে ধীরে কাত হয়ে তেমনি ভঙ্গিতে উল্টে পড়লো লোকটা, চেয়ার টেবিল নিয়ে। সেই টেবিলের সামনে বসেছিলো একজন তরুণ আমেরিকান, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'দারুণ! দারুণ মার মেরেছেন! দেখালেন বটে!'

ঘরের কেউ নড়লো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত ডলছে রেস্টুরেন্টের মালিক, কিন্তু কিছুই করতে এগোলো না। যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো ওমর। তাকিয়ে রয়েছে কারনেসের দিকে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আবার করসিকান। মাথা নেড়ে যেন ভেতরটা পরিষ্কার করতে চাইছে। শুয়োরের চোখের মতো খুদে কুৎকুতে চোখ জোড়ায় তীব্র ঘৃণা। দ্রুত একবার দৃষ্টি ঘুরে এলো সারা ঘরে, তার এই হাস্যকর পরিণতিতে কে কতোটা খুশি হলো যেন দেখলো। ঘুরে এসে চোখজোড়া আবার স্থির হলো ওমরের ওপর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। দ্বিধা করলো একটা মুহূর্ত। তারপর দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বললো, 'আবার দেখা হবে আমাদের!'

'আলোয় আর দেখা করতে এসো না,' শান্তকণ্ঠে বললো ওমর। 'অন্ধকার রাতে আমার পেছন দিক থেকে এসো, যদি আমাকে মারতে চাও। আরেকবার সামনে পড়লে দাঁত কটা খসিয়ে দেবো, মনে থাকে যেন। যাও, ভাগো! চুরি করে মদ বিক্রি করো গিয়ে। যেটা ভালো পারো।'

আরেকবার সারা ঘরে চোখ বোলালো কারনেস। কয়েকজন হাসছিলো, তার চোখে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল ওদের। ছুরিটা আবার পকেটে ভরলো করসিকান। তারপর শান্ত পায়ে এগোলো দরজার দিকে। বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

একসাথে কথা বলে উঠলো অনেকগুলো কণ্ঠ। কিশোরের মনে হলো, ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো যেন শব্দগুলো।

'ভালো হয়েছে! আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে!' বললো একটা কণ্ঠ। 'শয়তানটাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার ছিলো!'

'তাহলে কেন এতোদিন দিলেন না?' জিজ্ঞেস করলো ওমর। 'ভালোমতো একবার দিয়ে দিলেই তো ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।' ঘরের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'নিন। খাওয়া শুরু করুন। আপদ বিদেয় হয়েছে।'

উঠে দাঁড়ালো একজন লম্বা, সুন্দর চুলওয়ালা স্ক্যানডিনেভিয়ান লোক। পরনে নাবিকের পোশাক, পুরনো, মলিন হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো।

'আমার নাম স্ট্রাডস স্যানটোজ। একটা কাজের কাজ করেছেন। আমার একটা জাহাজ আছে। সাহায্যের দরকার পড়লে জানাবেন, খুশি হয়েই করবো।'

'থ্যাংকস, স্যানটোজ,' ওমর বললো। 'মনে থাকবে আপনার কথা।' আর বসলো না। কিশোর আর হাইপোর দিকে ফিরে বললো, 'চলো।'

দরজার দিকে এগোলো সে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ঘরের সব কটা চোখ। বাইরে বেরিয়েই হাইপোকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কাজ শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে, বস। শেষ।'

'জাহাজ ছাড়া যাবে?'

'যক্ষুণি বলবেন।'

'গুড। আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করবো। ঝিনুক ছেলেটার ব্যাপারটা তদন্ত করতে অনুরোধ করবো। কারনেসের হাত থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনা দরকার।'

জ্যোৎস্নায় আলোকিত বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললো হাইপো, 'দেরি হয়ে গেছে, বস।'

'মানে? কি বলতে চান?'

'কারনেসের জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।' হাত তুলে দেখালো হাইপো, 'ওই যে তার স্কুনার, চলে যাচ্ছে।'

ওমর আর কিশোরও দেখলো। ধীরে ধীরে বন্দরের মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা জাহাজ। নোঙর থেকে পানি ঝরছে এখনও।

'এইমাত্র ছাড়লো,' তিক্ত কণ্ঠে বললো ওমর। 'আর কিছুই করার নেই। তবে আমার বিশ্বাস, কারনেসের সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের। চলুন, ভেইটিতে ফিরে যাই।'

হাইপোর জাহাজটা যেখানে নোঙর করা রয়েছে, সেদিকে হেঁটে চললো তিনজনে।

তিন

ভেইটিতে ফিরে দেখা গেল, ডজের জখমের অনেক উন্নতি হয়েছে। ঝিনুক কারনেসের হাতে পড়েছে শুনে চমকে গেল সে। ঘাবড়ে গেল রীতিমতো।

ফুঁসে উঠলো ডজ, 'সোজা মুক্তো খেতের দিকে যাচ্ছিলো ব্যাটা। পথে রাটুনায় থেমেছে খাবার পানি নেয়ার জন্যে। থামতেই হবে। কয়েকটা কারণ। মিষ্টি পানি আছে। ওখানকার যে ক'টা দ্বীপ আছে, তার মধ্যে ওটাই সব চেয়ে বড় লোকেরা নিশ্চয় বলেছে আমি কয়েক দিনের জন্যে উঠেছিলাম ওখানে এজন্যে ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। এমনিতেই ঘটনা ওসব জায়গায় খুব কম ঘটে। আর আমার মতো একজন বিদেশীর ওখানে থাকাটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ওদের মাঝে, সহজে ভুলবে না। এটা একটা খবরের মতো খবর ওদের কাছে। কারনেস নেমে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমার কথা। আর তা-ই সে করেছে। জেনেছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক নামের দুটো ছেলেমেয়ে সাগরের

মাঝের এক দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে এনেছে আমাকে। মেয়েটার গায়ে হাত দেয়ার সাহস করবে না কারনেস। কারণ মেয়েদের অপমান সহ্য করবে না দ্বীপের লোকে। এরকম অন্যায় করে অনেক বিদেশীকে মুণ্ডু খোয়াতে হয়েছে। তাই ছেলেটাকে ধরেছে সে। লোভ-টোভ দেখিয়েই হয়তো বের করে নিয়ে এসেছে দ্বীপ থেকে। রসদপত্র ফুরিয়ে গিয়েছিলো হয়তো, তাই ফিরে গিয়েছিলো তাহিতিতে। এখন যখন বেরিয়ে গেছে, নিশ্চয় আবার গেছে মুক্তো খেতের দিকে।'

মন দিয়ে শুনলো হাইপো। একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো, 'ঠিকই বলেছেন। অনেক মালপত্র কিনেছে সে। ডুবুরির পোশাক কিনেছে।'

'কি করে জানলেন?' তীক্ষ্ণ হলো ডজের কণ্ঠ।

'হু চি মিনের কাছে নারকেলের ছোবড়া বিক্রি করি আমি। ওর কাছে ডুবুরির পোশাক আছে। এবার গিয়ে শুনলাম সেটা নাকি বেচে দিয়েছে কারনেসের কাছে।'

'কেন নিয়েছে সে-তো বোঝাই যায়,' ওমর বললো। 'ওসব নিয়ে আলোচনা করে আর লাভ নেই। দেরি করা যাবে না এখন। কারনেসের আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের।'

'এই তাড়াহুড়োটা করতে হতো না,' বিড়বিড় করলো ডজ। 'ছেলেটাকে ধরেই সর্বনাশটা করলো।'

'ছেলেটা তাকে কতোটা বলবে, তার ওপর নির্ভর করবে অনেক কিছু। মুখ খুলবে?'

'কি জানি। মারকুইজানরা কখন যে কি করবে বলা কঠিন। ওদের দাদারা ছিলো মানুষখেকো, ভুলে যেও না। মানুষ খাওয়ার ব্যাপারে কানাঘুষা কিছু কিছু এখনও শোনা যায়। ভীষণ জেদী। যদি কোনো বিদেশীকে পছন্দ করে তো তার জন্যে জীবন দিয়ে দেবে। আর না করলে, তার কথাই শুনবে না। কেটে ফেললেও একটা কথা বের করবে না মুখ থেকে। কারনেসকে পছন্দ করার কোনো কারণই নেই ঝিনুকের। হয়তো ভুল জায়গায় নিয়ে চলে যাবে। ইচ্ছে করে।'

'পথে আবার রাটুনায় থামবে নাকি কারনেস?' জানতে চাইলো ওমর। 'কি মনে হয়? দরকার আছে?'

'আছে। তাহিতি থেকে ডজ আইল্যাণ্ড অনেক দূরে। যেতে যেতে খাবার আর পানি ফুরোবেই। রাটুনায় থামতে বাধ্য হবে সে।'

'তাহলে এক কাজ করলেই পারি,' কিশোর পরামর্শ দিলো। 'আগেই গিয়ে রাটুনায় বসে থাকি আমরা। কারনেস গেলেই ধরবো। ঝিনুককে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো।'

'হুঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না,' ডজ বললো। 'কারনেসও ভাববে সে বেরিয়ে গেছে। জাহাজ নিয়ে তার পিছু নিলেও আগে দ্বীপে পৌঁছতে পারবো না আমরা। সে তো আর জানে না যে প্লেন আছে আমাদের। ওর আগে গিয়ে ওত পেতে থাকবো আমরা, এটা কল্পনাই করতে পারবে না।'

'পারি আর না পারি,' মুসা বললো। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

ওমরও ভেবে দেখলো কথাটা। পছন্দ হলো।

লেগুনের পানিতে ভাসছে ফ্লাইং বোট। ওড়ার জন্যে তৈরি। কিশোরকে

নিয়ে ওমর চলে যাওয়ার পর বসে থাকেনি মুসা। বিমানটাকে স্টার্ট দিয়ে পানিতেই চালিয়েছে কিছুক্ষণ। কোনো খুঁত আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করেছে। ট্যাঙ্কে ভরার পর পেট্রোল যা বাকি রয়ে গেছে, আর যেসব জিনিস তখুনি নেয়ার প্রয়োজন নেই, সেগুলো সুবিধে মতো জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছে। যাতে প্রয়োজনের সময় এসে বের করে নিতে পারে।

রওনা হতে কোনো অসুবিধে নেই। হাইপো আর তার হাসিখুশি তিনজন নাবিককে ধন্যবাদ জানালো ওরা। তারপর গিয়ে উঠলো বিমানে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ওমর। মিনিট কয়েক পরেই শাদা রেখা তৈরি করে নীল পানিতে ছুটতে শুরু করলো বিমান। জয়স্টিক চেপে ধরেছে সে। ইনস্ট্রুমেন্ট বোর্ডের ওপর সাঁটানো রয়েছে চার্ট।

কয়েক ঘণ্টা ধরে মাঝারি গতিতে সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চললো ওরা। মাঝে মাঝে নিচে দেখা গেল দ্বীপ, নীল মখমলের মাঝে সবুজ পান্নার মতো। একবার নিচে কালো একটা ফুটকির মতো দেখে ডজ জানালো ওটা আদিবাসীদের ক্যানু। শেষ বিকেলে দিগন্তের দিকে হাত তুলে দেখালো, 'স্কুনার! নিশ্চয় কারনেস!'

আরেকটু পরেই সামনে লম্বা একটা ঝিলিমিলি দেখা গেল। আবছা থেকে স্পষ্ট হতে লাগলো ওটা। ডজ ঘোষণা করলো, রাটুনা এসে গেছে। ঘন নীল আকাশে এখন সবুজ একটা প্রতিবিম্ব। এসব জায়গায় বিমান থেকে দ্বীপগুলোকে ওরকমই দেখায়, দূর থেকে। আরো কাছে এগোলে আকাশ থেকে যেন পানিতে নেমে পড়লো সবুজ রঙের ঝিলিমিলি। ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে পর্বতের উঁচু চূড়াগুলো।

'আগেও দেখেছি এসব,' কিশোর বললো। 'তার পরেও নতুন মনে হয়। যতোবারই দেখি, অবাক হই।'

'হওয়ারই জিনিস,' ডজ বললো। 'আমি তো কতোদিন ধরে আছি। বার বার দেখেছি। তার পরেও পুরনো হয় না। বেশির ভাগ দ্বীপই তৈরি করেছে প্রবালকীট। পানির সমতলের বেশি ওপরে উঠতে পারেনি সেজন্যেই। পমোটো ওই রকম দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু মারকুইস দ্বীপপুঞ্জ আলাদা। বড় বড় পাহাড় পর্বত যেন সাগরের ভেতর থেকে ঠেলে উঠেছে। প্রথমবার দেখে কেমন ভয়ই লাগতো। হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। প্রবালের তৈরি দ্বীপের চেয়ে অবশ্য ওই পাহাড়ওয়ালা দ্বীপগুলোর সৈকতই সুন্দর। ধবধবে শাদা বালি। পাহাড়ের গোড়ায় ঘন জঙ্গলও আছে।'

'সাপটাপ নেই তো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'অতো সুন্দর বনে সাপ থাকলে ভালো লাগবে না।'

'না, তা নেই। তবে বিষাক্ত পোকামাকড়ের অভাব নেই। দশ ইঞ্চি লম্বা শতপদী আছে। ওগুলো সাপের চেয়ে কম বিষাক্ত না। কামড়ে দিলে টের পাবে।'

কিছুটা নিচে নামলো ওমর। ডজ তাকে দেখালো, 'ওই যে, গ্রাম।' সৈকতের কিনারে কয়েকটা কুঁড়ে চোখে পড়ছে। নারকেল পাতার ছাউনি। 'দ্বীপের আরেক ধারে আরেকটা গ্রাম আছে। তবে সেটার চেয়ে এই গ্রামটা বড়। লোকজন এখানেই বেশি। সৈকতের ধারে যেখানে খুশি নামাতে পারো। টিলাটক্কর কিছু নেই। তবে ক্যানু থাকতে পারে।'

গাঁয়ের ওপরে ধীরে ধীরে চক্কর দিতে লাগলো ওমর। উচ্চতা কমিয়ে আনলো আরও। তারপর নাক নিচু করে উড়ে গেল নীল পানির দিকে। যেখানে পানির গা ঘেঁষে রয়েছে একফালি বাঁকা শাদা সৈকত।

চিলের মতো ডানা মেলে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে নামতে শুরু করলো ফ্লাইং বোট। সামনে ঝুঁকে এসে কোন জায়গায় নামতে হবে ওমরকে দেখিয়ে দিলো ডজ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কিশোর মন্তব্য করলো, 'পৃথিবীর দেশ বলে মনে হয় না! একেবারে স্বর্গ!'

'তা ঠিক,' কথাটা ডজও স্বীকার করলো। 'এতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে কমই আছে। তবে স্বর্গেও সাপ থাকে।'

'সাপ!' অবাক হয়ে বললো মুসা। 'এই না বললেন নেই!'

'আরে না না, ওই সাপের কথা বলছি না,' ডজ বললো। 'ব্যাখ্যা করে কিভাবে বোঝাই! বলতে চাইছি ভালোর পাশাপাশিই মন্দ জিনিস তৈরি করে রাখে প্রকৃতি। এই যেমন রুটিফল আর কলার কথাই ধরো। কতো ভালো খাবার। ওই প্যাহাড়ের গোড়ায় প্রচুর জন্মায়। তেমনি জন্মায় বিষ। বনের ভেতরে বিষাক্ত অর্কিড জন্মায়। এমন সব মাছি আছে কামড়ালে সাংঘাতিক জ্বালা করে। সাগরে যেমন মুক্তো আছে, তেমনি রয়েছে হাঙর আর অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস। জ্যান্ত প্রবাল তো পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিসগুলোর একটি। কিন্তু গিয়ে ঘষা লাগিয়ে দেখ না। কেটে রক্ত তো বেরোবেই, বিষও ঢুকে যেতে পারে। সবার ওপর রয়েছে,অসুখ, দক্ষিণ সাগরের এই স্বর্গগুলোতে। একশো বছর আগে এই দ্বীপটাতেই শুধু ছিলো দশ হাজার মানুষ। এখন আছে মোটে দু'শো। বাকি সব মরেছে শাদা মানুষের বয়ে নিয়ে আসা অসুখে। কেউ এনেছে যক্ষ্মা, কেউ কুষ্ঠ। আর কয়েক বছর পরে এখানে একজনও মানুষ থাকবে কিনা সন্দেহ! পঙ্গপালের মতো মরে সাফ হয়ে গেছে এখানে মানুষ···'

পানিতে নেমে পড়েছে ফ্লাইং বোট। ছুটলো গাঁয়ের দিকে। বিমানের শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে গাঁয়ের লোক। জটলা করছে সৈকতের ধারে। কেউ কেউ উত্তেজনায় নাচতে শুরু করেছে।

'এই প্রথম এখানে প্লেন নামছে।' জানালার বাইরে মাথা বের করে দিলো ডজ। চেঁচিয়ে বললো, 'কাওহা!'

আরও বেড়ে গেল সৈকতে উত্তেজনা। ডজকে চিনেছে। তাকে চেনা সহজ, লাল রঙের চুলের জন্যে। ঝপাঝপ কয়েকটা ক্যানু টেনে নামানো হলো পানিতে। ছুটে এলো বিমানের পেছনে। ঘিরে ফেললো এসে। কেউ কেউ সাঁতরে চলে এলো। নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে, সব রকমের মানুষ। চেঁচিয়ে ডজের নাম ধরে ডাকতে লাগলো ওরা, স্বাগত জানাচ্ছে, তবে ডজ নামটা বলছে না, বলছে 'লাল চুল'। কাওহা কাওহা বলে তার জবাব দিচ্ছে ডজ। শান্ত পানিতে বিমানের নোঙর ফেলে ক্যানুতে নামলো বৈমানিকেরা। নিয়ে আসা হলো ওদেরকে নারকেল গাছে ঘেরা সৈকতে।

উল্কি দিয়ে শরীরে অনেক বেশি আঁকিবুকি আঁকা বয়স্ক একজন লোককে হাত

ধরে টেনে নিয়ে এলো ডজ। পরিচয় করিয়ে দিলো, 'ওর নাম অশান্ত সাগর।' তারপর হো হো করে হেসে উঠলো যখন অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ওমরের নাকে নাক ঘষার আগে মোড়ল ভালোমতো তার মুখটা শুঁকে নিলো। 'মোড়ল ইংরেজি তেমন জানে না।' বললো সে, 'ফরাসী ভাষা জানে। তবে তার মাতৃভাষা মারকুইসাসে কেউ কথা বললেই বেশি খুশি হয়। আমি কিছু কিছু জানি। আলোচনা চালাতে পারবো।'

মোড়লের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন তরুণ। ওদেরকে দেখিয়ে ডজকে বললো ওমর, 'ওদের ভাবভঙ্গি তো সুবিধের লাগছে না। মনে হচ্ছে মাথায় মুগুরের বাড়ি মারার জন্যে হাত নিসপিস করছে ওদের।'

মোড়লের সঙ্গে কথা বললো ডজ। লোকগুলোর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার ডজের দিকে ফিরলো মোড়ল। মারকুইসাসে কিছু বললো। সঙ্গীদেরকে জানালো ডজ, 'ওরা ভয় পাচ্ছে। জোর করে আমরা ধরে নিয়ে যেতে পারি, এই ভয়। ভয়টা পাইয়েছে ওদের কারনেস, ঝিনুককে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে।'

'ওদের বলো,' ওমর বললো। 'ঝিনুককে ছাড়িয়ে আনতে যাবো আমরা।'

আবার মোড়লের সঙ্গে কথা বললো ডজ। মোড়ল কি বললো সেটা অনুবাদ করে শোনালো, 'খুশি হয়েছে ওরা। বলছে এই দ্বীপকে আমরা নিজেদের বাড়ির মতো মনে করতে পারি।' তারপর নিজে থেকে বললো, 'ওরা যা বলে, ঠিক তাই বোঝায়। ফাঁকি-ঝুঁকি নেই। যাকে পছন্দ করবে তাকে সব দিয়ে দিতে রাজি। এখুনি আমাদের জন্যে একটা ঘর বানাতে হুকুম দিয়ে দিয়েছে মোড়ল। রাতের বেলা ভোজ হবে।'

'ঘর বানিয়ে দেবে, ঠিক আছে,' ওমর বললো। 'তবে খাবার দাওয়াতটা রাখতে পারবো কিনা সন্দেহ। আসার সময় কারনেসের স্কুনার দেখে এসেছি। সত্যিই যদি তারটাই হয়, তাহলে সন্ধ্যার পর পরই পৌঁছে যাবে সে। ভোজফোজের মধ্যে না গিয়ে তার ওপর নজর রাখাটা জরুরী।'

আরেক দফা লম্বা আলোচনা হলো ডজের সঙ্গে মোড়লের। ওমরের দিকে ফিরে ডজ বললো, 'ও বুঝতে পেরেছে। কয়েকজন যোদ্ধাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবে নজর রাখার জন্যে। স্কুনারটাকে দেখা গেলেই আমাদের হুঁশিয়ার করে দেবে।...আহ্, ওই যে আসছে সাগরের হাসি, ঝিনুকের বান্ধবী।'

বছর পনেরোর এক কিশোরী এগিয়ে এলো। খুব সুন্দরী। পরনে হালকা নীল রঙের পোশাক, দ্বীপের লোকেরা যেমন পরে। ছেলে আর মেয়েতে কোনো ভেদাভেদ নেই, একই রঙের কাপড় পরে। চমৎকার স্বাস্থ্য। তেল চকচকে বাদামী চামড়া। হাসতে হাসতে এসে হাত চেপে ধরলো ডজের, কোনো জড়তা নেই, বললো, 'কাওহা, কাওহা।'

আদর করে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিলো ডজ, মেয়েদেরকে এখানে অভ্যর্থনার জবাব দেয়ার এটাই নিয়ম। বললো, 'ঝিনুককে ছাড়িয়ে আনতে যাবো আমরা।'

বন্ধুর নাম শুনে মেঘ জমলো যেন মেয়েটার বাদামী মুখে। 'ওর জন্যে আমার খুব খারাপ লাগে। কাঁদি।'

'ডজ, এসো,' ডাকলো ওমর। 'প্লেন থেকে কিছু খাবার নামিয়ে নিয়ে আসি।

আর মোড়লের জন্যে কিছু উপহার। তার পর কথা বলা যাবে যতো খুশি। এসো।'

বিমান থেকে মাল নামানো, কোনো কাজই না, কিন্তু ইচ্ছে করেই এগিয়ে এলো অনেকে, সাহায্য করার জন্যে। মানা করলেও শোনে না। বরং মুখ বেজার করে ফেলে। আপাতত মোড়লের ঘরে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো। পরে নতুন ঘর তৈরি হলে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

'তোমার দ্বীপ থেকে কত দূরে আছি?' ডজকে জিজ্ঞেস করলো ওমর।

'বিশ-তিরিশ মাইল। এর বেশি না।'

'এই দ্বীপেই আমাদের হেডকোয়ার্টার করলে কেমন হয়?'

'পেট্রোলের অসুবিধে হবে। বার বার যেতে আসতে অনেক তেল খরচ হবে, অতো নেই স্টকে। আবহাওয়া ভালো হলে ওড়ারও দরকার পড়বে না, পানিতে ট্যাক্সিইং করে চলে যেতে পারবো। রোজ সকালে রওনা হতে হবে তাহলে। রোজ এভাবে নিয়মিত যেতে-আসতে থাকলে সন্দেহ করে বসতে পারে এখানকার লোকে। সেটা উচিত হবে না। যতো কম লোক জানাজানি হয় ততোই ভালো। ওদের লোভ নেই, এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশী কোনো জাহাজ চলে আসতে পারে। ফাঁস হয়ে যেতে পারে খবরটা।'

মাথা ঝাঁকালো ওমর। 'ঠিকই বলেছো। যাকগে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগে কারনেসের ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নিই।'

হালকা খাবার খেয়ে নিলো ওরা। ঘুরতে বেরোলো কিশোর আর মুসা। উঁচু উঁচু অসংখ্য নারকেলের জটলার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি হয়েছে কুঁড়েগুলো। বেরিয়ে চলে এলো ওরা সৈকতে। শান্ত নিথর হয়ে আছে সাগর। দিগন্ত সীমায় হেলে পড়ছে সূর্য। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আকাশের ঘন নীল, মাঝেমাঝে লালচে-হলুদ রঙের ছোপ। মৃদু বাতাস বইছে, যেন সাগরের শেষ নিঃশ্বাস, থিরথির করে কাঁপছে নারকেলের ডগা। আশ্চর্য এক নীরবতা। সামনে ছড়ানো শাদা সৈকত। জীবনের কোনো চিহ্নই নেই, কিছু ঋষি কাঁকড়া বাদে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকছে, যেন বোঝাতে চাইছে—না না, আমরা জীবন্ত কিছু নই, পাথর। কিন্তু কাছে গেলেই ঝট করে বেরিয়ে আসছে দাঁড়া। বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ছে অসংখ্য গর্তের কোনো একটাতে। সৈকতের কিনার ধরে হাঁটতে হাঁটতে সামনে বাধা দেখতে পেলো ওরা। পথ রুদ্ধ করে দিয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেছে পাথরের দেয়াল। দেখলে মনে হবে হয় আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়েছে হঠাৎ করে, কিংবা ধীরে ধীরে সাগরের নিচ থেকে ঠেলে মাথা তুলেছে। বেশি দূরে যেতে ওদেরকে মানা করে দিয়েছে ডজ। থামলো ওরা। এই সময় পেছনে শোনা গেল হালকা পায়ের আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে দেখলো হাতে একটা আদিম মাছ ধরার বড়শি নিয়ে এগিয়ে আসছে সাগরের হাসি।

'অনেক টুপা,' হেসে হাত তুলে কাঁকড়াগুলোকে দেখালো সে। 'মাছও অনেক আছে। দেখবে? এসো।' দু'জনের মধ্যে হাত ধরার জন্যে মুসাকেই বেছে নিলো সে। টেনে নিয়ে চললো পাথরের দেয়ালের পাশের একটা বড় চাঙড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চললো কিশোর।

চাঙড়টা আসলে দেয়ালেরই অংশ। ওপরে উঠে বোঝা গেল, প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ে চূড়াটা কেটে চলে গেছে। জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো সাগরের হাসি। সাথে করে নিয়ে এসেছে অনেক কুঁচো চিঙড়ি। বড়শিতে সেগুলো গেঁথে পানিতে ফেলে দেখতে দেখতে অনেক মাছ ধরে ফেললো। একেকটা করে মাছ ধরে, আর সেগুলোর স্থানীয় নাম বলে, মুসাকে দিয়ে আবার উচ্চারণ করায় সেগুলোর।

শুনে কিশোরও শিখে ফেলেছে। তাকিয়ে রয়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানির দিকে। একেবারে তল পর্যন্ত দেখা যায়। যেন ভিডিওতে নেচারাল ওয়ার্ল্ড দেখছে। আজব, সুন্দর সেই জগৎ। বিশাল এক অ্যাকুয়ারিয়াম যেন। খেলে বেড়াচ্ছে নানা রকম রঙিন মাছ। কোনোটা চুপ করে ভাসছে, কোনোটা ছোটাছুটি করছে, তাড়া করছে একে অন্যকে, পাথরের খাঁজ থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসছে কেউ, কেউ বা আবার ধীরে সুস্থে গিয়ে ঢুকে পড়ছে।

মস্ত একটা বান মাছ দেখতে পেলো। পুরো পনেরো ফুট লম্বা। কুৎসিত, ভয়ংকর মুখ। পাথরের কালো গর্ত থেকে বেরিয়ে পিছলে গিয়ে যেন ঢুকে পড়লো আরেকটা পাথরের ফাটলের ভেতরে। দেখতে দেখতে এতোই তন্ময় হয়ে গেল, অনেকক্ষণ থেকেই যে নীরব হয়ে আছে সাগরের হাসি, সেটা লক্ষ্যই করলো না। করলো অনেক পরে, যখন তার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো মুসা।

পাথরের দেয়ালের গায়ে কালো বিষণ্ন চেহারার একটা গুহামুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে। মুসাও দেখেনি, কিশোরও পাচ্ছে না। তবে পেলো খুব তাড়াতাড়িই। চামড়ায় একধরনের শিরশিরে অনুভূতি হলো কিশোরের, ভয় পেলে কিংবা বেশি অবাক হলে এরকমটা হয় মানুষের। কালো কিছু একটাকে নড়তে দেখেছে।

সাগরের হাসির তীক্ষ্ণ চিৎকার ফালা ফালা করে দিলো যেন অখণ্ড নীরবতা। গাঁয়ের দিকে ফিরে মুখের ওপর দুই হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে
বলতে লাগলো, 'ফেকি! ফেকি! ফেকি!'

চিৎকার শুনেই ছুটে ঘর থেকে বেরোলো চার-পাঁচজন মানুষ। হাতে মাছ মারার বর্শা। দৌড়ে আসতে লাগলো এদিকে। কাছে এসে ওরাও চেঁচাতে শুরু করলো। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছে সাগরের হাসিকে। হাত তুলে গুহাটা দেখিয়ে মেয়েটা আবার বললো, 'ফেকি!'

পানির আরও কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো লোকগুলো, দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো গোল হয়ে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিলো কিশোর আর মুসা। কিন্তু ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। মনে হলো বিপজ্জনক কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বেশি দূরে সরলো না গোয়েন্দারা। গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে রইলো কালো গুহাটার দিকে।

ঝট করে বেরিয়ে এলো একটা লম্বা লিকলিকে বাহু। আরেকটা। তারপর আরেকটা।

মোচড় দিয়ে উঠলো কিশোরের পেট। এই জীব আগেও দেখেছে সে, তবু চমকে গেল। কিলবিলে ওই কুৎসিত শুঁড়গুলো দেখলে অনেকেরই হয় এরকম, জানা আছে তার, শুঁয়াপোকা দেখলে যেমন হয়। ঘেন্না লাগে, শিউরে ওঠে শরীর।

কাঁপতে কাঁপতে একটা শুঁড় উঠে এলো লোকগুলোর দিকে। লাফিয়ে কিশোরদের কাছে সরে এলো সাগরের হাসি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'টা-টা-টা-টা!' ছেলেদের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'ভয় লাগছে? আমরা ভয় পাই না। ও আমার ভাই।' লম্বা, জোয়ান একটা লোককে দেখালো সে। 'দুর্দান্ত সাহসী। ঠিক মেরে ফেলবে। অনেক ফেকি মেরেছে। এটাকেও মারবে।'

'জীবটা কি?' শরীরটা এখনও বেরোয়নি, আন্দাজ করতে পারছে কী, তবু জিজ্ঞেস করলো।

'ফেকি!' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে অশুদ্ধ উচ্চারণে অনুবাদ করে দিলো সাগরের হাসি, 'ডেবিল ফিশ! ডেবিল ফিশ!' ডেভিল ফিশ, অর্থাৎ শয়তান মাছ।

এই জীবের সঙ্গে লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে মুসার, অথৈ সাগর অভিযানে যখন এসেছিলো। মরতে মরতে বেঁচেছিলো সেবার। দ্বিতীয়বার আর এর কবলে পড়তে চায় না। ওই শুঁড়ের ভয়ংকর ক্ষমতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলো সেবার। ভয়ে ভয়ে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে গেল সে।

কিশোর নড়লো না। বেরিয়ে এলো শুঁড়ের চেয়ে কুৎসিত শরীরটা। জীবটাকে কেউ দেখে না থাকলে তার কাছে হরর ছবির ভয়াবহ দানব বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যাবে। মস্ত, কালচে-লাল একটা মাংসের দলা যেন। সেটা থেকে বেরিয়ে রয়েছে অসংখ্য আঁচিল, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে। মুখটা হাতির মুখের মতো, শুঁড় বাদ দিয়ে। গোল গোল বিশাল দুটো চোখ, শরীরের তুলনায় অনেক বড়, তাতে একধরনের শয়তানী উজ্জ্বলতা, এতোই কুৎসিত, না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। মোট আটটা বাহু, হাতির শুঁড়ের মতো গুটিয়ে নিয়ে আবার লম্বা করে দিচ্ছে, একেকটা চোদ্দ-পনেরো ফুটের কম হবে না। লাফ দিয়ে এসে পড়লো একটা শুঁড়ের মাথা, কিশোরের কয়েক ফুটের মধ্যে।

ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে গেল সে কয়েক পা। লোকগুলো সরছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একনাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছে ওদের পায়ের কাছে এসে পড়া শুঁড়গুলোকে।

পরোয়াই করছে না যেন বিশাল অকটোপাস। গর্ত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে পড়েছে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একটা মানুষকে ধরতে পারলেই রাতের খাবার হয়ে যাবে তার। শিকার ধরতে গেলে কিছুটা আঘাত সইতেই হয়, কাজেই বর্শার খোঁচাগুলো হজম করে যাচ্ছে সে।

পানি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেন উড়ে এসে কিশোরের পায়ের কাছে পড়লো একটা শুঁড়ের মাথা। ছুঁয়ে ফেললো পা। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল কিশোর। জড়িয়ে ধরতে পারলে আর মুক্তি ছিলো না ওই শুঁড়ের কবল থেকে। ঠাণ্ডা ভেজা স্পর্শ। নিজের অজান্তেই গলা চিরে বেরিয়ে এলো চিৎকার। তার হাত ধরে একটানে সরিয়ে নিলো মুসা, দেয়ালের কাছে, শুঁড়ের নাগালের বাইরে।

ভোজালি দিয়ে এক কোপে শুঁড়ের মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেললো একজন যোদ্ধা। টিকটিকির লেজের মতো কুৎসিত নাচ শুরু করলো কাটা অংশটা।

রাগে ব্যথায় ভীষণ খেপে গেল অকটোপাস। যে করেই হোক মানুষ শিকার করবেই, পণ করে ফেললো যেন সে। একসঙ্গে পানি ওপরে তুলে দিলো আটটা শুঁড়। এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো যোদ্ধারা। প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাগলো শুঁড়গুলো।

পানিতে মাথা তুলেছে অকটোপাস। যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কাটা শুঁড়ের মাথা থেকে। রীতিমতো হরর ছবি। অনেকটা মানুষের মতো করেই গোঙাতে আরম্ভ করেছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। শরীরের যেখানে সেখানে বর্শা বিদ্ধ হচ্ছে। আক্রমণ করছে না আর, অস্ত্রই নেই, করবে কি দিয়ে? অদ্ভুত আচরণ করছে। মুসার মনে হলো, অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, বুঝে গেছে জীবটা। গর্তের ভেতরে থেকে লড়াইয়ের সময় অকটোপাসের বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছিলো সে, তাতেই এরকমটা ভাবতে পারলো।

খোঁচানোর বিরাম নেই। যতো তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া যায়, সেই চেষ্টা করছে যোদ্ধারা।

আনন্দে নাচতে শুরু করেছে সাগরের হাসি। 'ওকে খাবো! ওকে খাবো! মজার মাংস!' মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলো সে। 'তোমরাও খাবে!'

'তুমি খেয়ো।' হাত নেড়ে বললো কিশোর, 'আমি এর মধ্যে নেই। বাপরে বাপ, কি বিচ্ছিরি! শুঁয়াপোকা এর চেয়ে অনেক সুন্দর!'

মুসা কিছু বললো না। খাবারটা কেমন হয়, না দেখে আগেই মানা করে দিতে রাজি নয়।

পানি থেকে তোলা হলো মৃত অকটোপাসটাকে। ওখানেই কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হতে লাগলো। সাগরের হাসিও যোগ দিলো সেই কাটাকাটিতে।

ঘন হয়ে আসছে গোধূলী। ঘরে ফিরে চললো কিশোর আর মুসা। কুঁড়েতে ফিরে দেখলো কথা বলছে ডজ আর ওমর। অকটোপাসের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ওদেরকে বলতে যাবে, এই সময় পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো চিৎকার, 'আসছে! আসছে!'

'জাহাজটাকে দেখতে পেয়েছে,' ডজ বললো। 'চলো, দেখি, কতোটা এগোলো।'

চার

বেশি দূরে যেতে হলো না। সৈকতেই এসে জড়ো হয়েছে গাঁয়ের লোক। উত্তেজিত হয়ে কলরব করছে। কয়েকজনের কথা শুনলো ডজ। ফিরে সঙ্গীদেরকে জানালো, 'অবাক কাণ্ড! কারনেসই এসেছে। তবে এদিকে না এসে চলে গেছে দ্বীপের আরেক ধারে। ওখানে নোঙর ফেলেছে। এটা ভাবা উচিত ছিলো আমাদের। এখানে জাহাজ ভেড়াতে সাহস করবে না, এ-তো জানা কথা। গাঁয়ের লোকে ধরে খুন করে ফেলবে। এখুনি কয়েকজনে গিয়ে কাজটা সেরে আসতে চাইছে। আমি ওদের

মানা করেছি। অন্তত আমরা যতোক্ষণ এখানে রয়েছি কোনো খুনখারাপি চলবে না।'

'তাহলে কি করা যায়?' পরামর্শ চাইলো ওমর। 'ঘুরে যেতে হলে কতদূর?'

'হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। ঘুরে যেতে হলে ক্যানুতে চড়ে। তাতে পনেরো-বিশ মাইলের কম হবে না।'

শিস দিয়ে উঠলো ওমর। 'এতো? দ্বীপের মাঝখান দিয়ে সরাসরি গেলে?'

'সাত-আট মাইল। তবে যাওয়াটা অতো সোজা না। খানিক দূর গিয়েছিলাম একবার, পুরোটা যেতে পারিনি। যাওয়া যায় না তা নয়। তবে সাংঘাতিক কঠিন। যেতে হয় পাহাড় ডিঙিয়ে, তিন হাজার ফুট উঁচু। ভয়ানক বিপজ্জনক। শুধু যে পড়ে মরার ভয় আছে তা নয়, বুনো জানোয়ারও আছে।'

'এখানে বুনো জানোয়ার?' মুসা অবাক।

'মহাসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপে জানোয়ার এলো কোত্থেকে?' কিশোরও বুঝতে পারছে না।

'এসেছে। ষাঁড় আর কুকুর। কুত্তাগুলো হলো সব চেয়ে খারাপ। আমি অবশ্য দেখিনি, শোনা কথা বলছি। একপাল শাদা কুত্তা নাকি বাস করে পাহাড়ে। হিংস্র। আগে পোষা ছিলো, ছাড়া থাকতে থাকতে বুনো হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে তিমি-শিকারীদের এক জাহাজে করে নিয়ে আসা হয়েছিলো ওগুলোকে, ফেরার সময় ফেলে চলে গেছে জাহাজের মালিক। গরুও বোধহয় অনেক আগে ওভাবেই ফেলে যাওয়া হয়েছে। আশপাশের অনেক দ্বীপে বনবেড়াল আছে, আগে পোষা ছিলো। ফেলে যাওয়ার পর বনে থাকতে থাকতে বন্য হয়ে গেছে।'

'হুঁ,' ওমর বললো। 'ওসব জানোয়ারকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাওয়া যাবে কিনা তাই বলো। কারনেসকে ঠেকাতেই হবে। ছেলেটাকে অন্তত কেড়ে রেখে দেয়া উচিত।'

'দেখি, অশান্ত সাগরকে জিজ্ঞেস করে।' মোড়লের কাছে এগিয়ে গেল ডজ। কথা বলে ফিরে এলো। বললো, 'হ্যাঁ, যাওয়া যাবে বলছে। তবে পথ খুব খারাপ। গাইড হিসেবে তার কয়েকজন লোক দিতেও রাজি হয়েছে।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। অস্ত্র-টস্ত্র নেবো নাকি? রাইফেল?'

'বেশি বোঝা নিলে অসুবিধে হতে পারে। যা দরকার শুধু তা-ই। আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। পিস্তল নিলেই যথেষ্ট।'

'বেশ। মোড়লকে বলো এখুনি রওনা হতে চাই আমরা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হলো ওরা। সঙ্গে চললো ছয়জন যোদ্ধা। মশাল জ্বেলে নিয়েছে। দেখতে দেখতে চলে এলো পাহাড়ের গোড়ায়। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। মশালের আলোয় আরো বেশি ঘন লাগছে, মনে হচ্ছে লতাপাতার দুর্ভেদ্য দেয়াল। এর মধ্যে প্রবেশ করা যাবে না।

কিছুদূর এগোনোর পর হাতে একটা আলতো ছোঁয়া পেলো মুসা। তার বাহু খামচে ধরলো নরম একটা হাত। অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সাগরের হাসি। হাসলো। মশালের আলোয় ঝিক করে উঠলো শাদা দাঁত। 'এলাম।'

মেয়েটার খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো মুসা। যে হারে ধারালো পাথর খোঁচা খোঁচা বেরিয়ে রয়েছে, তাতে জুতো না থাকলে কেটে পা ফালাফালা হয়ে যাওয়ার কথা। বললো, 'কেটে যাবে তো!'

'কাটবে না,' হেসে বললো সাগরের হাসি। 'কতো উঠলাম। প্রবালের ওপর দিয়েও হাঁটতে পারি খালি পায়ে।'

পাশাপাশি চলছে কিশোর। বিশ্বাস করলো কথাটা।

কথা শুনে ফিরে তাকিয়ে ওমর বললো, 'এই, তুমি এসেছো কেন?'

'আসুক,' ডজ বললো। 'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। বিপদে ফেলবে ভাবছো তো? ফেলবে না। বরং সাহায্য করবে। ঝিনুক ওর বন্ধু। ও যাবেই। বলেও ফেরাতে পারবে না।'

আর কিছু বললো না ওমর। মশালের আলোয় জঙ্গল দেখতে দেখতে চললো। বুনো ফুল ফুটে আছে। অর্কিডের অভাব নেই, অনেক জাতের, অনেক ধরনের। একধরনের দানবীয় পাতাসর্বস্ব গাছ জন্মে রয়েছে, এর নাম কুমারীর চুল। ওই চুলের মাঝে বিচিত্র অলংকরণ সৃষ্টি করেছে অর্কিডগুলো। কিছু লতানো অর্কিড ঝুলে রয়েছে বড় গাছের ডাল থেকে। হাজারে হাজারে গিনিপিগ রয়েছে। হুটোপুটি করছে, ছুটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে।

যতোই উঠছে খাড়া হচ্ছে আরও পথ। দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে পাহাড়ের দেয়াল, গিরিপথের মতো লাগে। কখনও হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেয়াল, তার পরে রয়েছে গভীর গিরিখাত। পড়লে ছাতু হয়ে যেতে হবে। কখনও পথ মোড় নিচ্ছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। নারকেল আর রুটিফল গাছ পড়ে আছে অনেক নিচে, এখানে উঠতে পারেনি। আরেকটু এগিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙরের ভেতরে হারিয়ে গেছে পথ। কখনো তার ভেতরে ঢোকা যায়, কখনো যায় না। তখন এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে হয়।

একটা খোলা জায়গা পেরোনোর সময় নিচে তাকালো কিশোর। অদ্ভুত একটা শৈলশিরা চোখে পড়লো। ধারের ওপরটা করাতের দাঁতের মতো হয়ে আছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছিলো ওটা একসময়, বুঝতে পারলো। আরো অনেক নিচে পানিতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে বিমানটাকে, ওটার রূপালি ডানায় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বিমান আর মনে হচ্ছে না এখান থেকে, এতোই ছোট দেখাচ্ছে। বরং মনে হয় পানিতে ভেসে আছে ডানা মেলে দেয়া কোনো নিশাচর পতঙ্গ। লেগুনের বাইরে সাগরকে লাগছে রূপালি চাদরের মতো। পানি বলে মনে হয় না। যেন এই পৃথিবীর কোনো কিছু নয় ওসব, অপার্থিব।

উঠেই চলেছে পথ। অনেক পাহাড়ে চড়েছে মুসা, কিন্তু এরকম পাহাড় আর দেখেনি। মনে হয় যেন পৃথিবীর বুকের বিশাল এক ফোঁড়া ফেটে গিয়েছিলো। পুঁজের বদলে বেরিয়ে এসেছিলো পাথর। সেসব ছড়িয়ে রয়েছে। আর ফোঁড়ার মুখের কাছটা বিকৃত হয়ে গেছে।

পথ এখানে সরু। একপাশে গভীর খাদ। পাশাপাশি চলার আর উপায় নেই। একসারিতে এগিয়ে চলেছে মশালধারীরা। শুধু তাদের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে কিশোর। পাশে খাদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না। যদি মাথা ঘুরে

পড়ে যায়?

কিশোরের মনের অবস্থা কি করে জানি টের পেয়ে গেছে সাগরের হাসি। হাসতে লাগলো সে। পাহাড়ী ছাগলের মতো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হালকা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কোনো কিছুরই পরোয়া করছে না।

একটা জায়গায় এসে সমতল হয়ে গেছে খানিকটা জায়গা। তার ওপাশ থেকে নামতে আরম্ভ করেছে পথ। দ্রুত নেমে গেছে পেয়ালা আকৃতির একটা খাদের মধ্যে। কোনো গাছপালা নেই তাতে। ওটাই মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের নিচের গহ্বর, অনুমান করতে পারলো কিশোর। ওখানে নেমে থামলো যোদ্ধারা। বিশ্রাম নিতে। মশালের আলোও নিভু নিভু হয়ে এসেছে। থামতে পেরে খুব খুশি হলো কিশোর। গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। দরদর করে ঘামছে।

কিন্তু শুয়েও সারতে পারলো না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে হলো আবার। রক্ত জমাট করা একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছে। নেকড়ের ডাকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। যোদ্ধারাও উঠে পড়েছে। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'কুকুর! কুকুর!' ভয় পেয়েছে ওরা।

'খাইছে!' বলে সাগরের হাসির হাত ধরে একটানে তাকে পেছনে সরিয়ে দিলো মুসা। পিস্তল বের করলো।

ওমরও পিস্তল বের করে ফেলেছে। 'ওই যে! এসে গেছে!' তাকিয়ে রয়েছে কুকুরগুলোর দিকে। চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে শাদা জানোয়ারগুলোকে। সোজা ছুটে আসছে এদিকেই।

গুলি করলো সে। প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়লো একটা মৃত জানোয়ার।

গুলি করেই সাগরের হাসিকে টেনে নিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে কুকুরগুলো। মানুষকে ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

কিশোর আর ডজও গুলি চালাতে লাগলো।

রুদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগলো গুলির। প্রতিধ্বনি উঠতে লাগলো। সেই সঙ্গে কুকুরের আর্তনাদ আর গর্জন। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন।

মশালগুলো জ্বালিয়ে ফেলেছে আবার যোদ্ধারা। শুকনো ঘাস জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে ঘাসের একটা চক্র তৈরি করে ফেললো ওরা। আগুন লাগালো। তার মধ্যে ঢুকে পড়তে অনুরোধ করলো অভিযাত্রীদেরকে।

ঢুকে পড়লো সবাই। আগুনের বৃত্তের বাইরে এসে থেমে গেল কুকুরগুলো। চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়লো। লম্বা টকটকে লাল জিভ বের করে দিয়েছে। ঝুলছে ওগুলো, লালা গড়াচ্ছে। কয়েক মিনিট মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওগুলো। আগুন পেরিয়ে এসে ধরতে পারবে না বুঝে অন্য কাজে মন দিলো। মরা আর আহত সঙ্গীদেরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে শুরু করে দিলো। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে মানুষদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচাচ্ছে। জানোয়ারগুলোর হিংস্রতা দেখে গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের।

'এখন কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো ওমর।

যোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ডজ। ফিরে তাকিয়ে বললো, 'ওরা বলছে, নতুন করে মশাল বানিয়ে নেবে। আগুনকে ভয় পায় কুকুরগুলো। এগোতে সাহস করবে না।'

'কিছু একটা করা দরকার,' গম্ভীর হয়ে বললো ওমর। 'এভাবে আটকে থাকলে কারনেস ওদিকে চলে যাবে।'

আরেক ধরনের মশাল বানাতে শুরু করলো যোদ্ধারা। শুকনো ঘাসকে শক্ত করে পাকিয়ে নিয়ে লাঠির মাথায় বাঁধলো। যে ঘাস তুলছে, তাকে আগের মশাল নিয়ে পাহারা দিলো অন্যেরা। তবে ওদের দিকে এখন আর তেমন খেয়াল নেই কুকুরগুলোর। ভোজে ব্যস্ত। মশাল বানানো শেষ করার পর এলো কুকুর তাড়ানোর পালা। যোদ্ধারা শুকনো ডালের মাথায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো ওগুলোর দিকে। সেই সঙ্গে পাথর। কয়েক রাউণ্ড গুলিও চালানো হলো, মেরে ফেলা হলো আরও কয়েকটাকে।

এই বার ঘাবড়ালো কুকুরের পাল। পালালো। পেছনে মশাল হাতে তেড়ে গেল যোদ্ধারা। তবে বেশি দূর গেল না। কুকুরগুলো আবার সাহসী হয়ে উঠলে মুশকিল।

রওনা হলো আবার ওরা। জ্বালামুখটা পেরিয়ে এলো দ্রুত। ঝপ করে যেন হঠাৎ নিচে নেমে গেছে পথটা। সামনে আবার আরম্ভ হয়েছে জঙ্গল। পায়ের নিচে এখন নরম শ্যাওলা। হাঁটছে ওরা আর বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। আর কোনো সাড়া নেই কুকুরগুলোর।

বেশ সুন্দর একটা ফুল দেখতে পেলো মুসা। পাঁপড়িগুলো কেমন পালকের মতো ছড়িয়ে গেছে, কোমল মনে হচ্ছে দেখে। হাত বাড়িয়ে সেটা ছিঁড়তে গেল, সাগরের হাসিকে উপহার দেয়ার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো মেয়েটা। সরিয়ে আনতে আনতে বললো, 'পাকে!'

ডজও দেখলো ফুলটা। 'ছুঁয়ো না। ওটা পাকে!'

'পাকেটা কি জিনিস?' জানতে চাইলো কিশোর।

'ছুঁয়ে দেখ, তাহলেই বুঝবে। জীবনে ভুলবে না আর। আগুনের পোড়ার মতো জ্বলতে শুরু করবে। বিছুটি এর কাছে কিছু না।'

ঠিকই বলেছিলো ডজ, স্বর্গেও সাপ থাকে—ভাবলো কিশোর। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলো খুব সুন্দর, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মাঝেও এমন সব ব্যাপার রয়েছে, যা অনেক ভালো লাগাকেই ম্লান করে দেয়।

আরও ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে হাঁটলো ওরা। শেষ দিকে নামলো হুড়মুড় করে বৃষ্টি। নারকেল গাছের এলাকা শুরু হয়েছে তখন। থেমে মশাল নিভিয়ে ফেললো যোদ্ধারা। ডজকে একজন বললো, 'এর বাইরে বেরোলেই সৈকত, শুনেছি।'

'আমি আগে যাই,' ওমর বললো। 'দেখে আসি।' বলেই হাঁটতে আরম্ভ করলো। হারিয়ে গেল নারকেল কুঞ্জের ভেতরে। ফিরে এলো একটু পরেই। 'ঠিকই। জাহাজটা দেখে এলাম। তীর থেকে শ'খানেক গজ দূরে। আলো একটা

জ্বলছে বটে, তবে কোনো সাড়াশব্দ নেই। লোকগুলো জাহাজে আছে না ডাঙায় বুঝতে পারলাম না। ছোট একটা গাঁ দেখে এলাম পানির কিনারেই। ওখানে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আমার মনে হয় না কারনেস গিয়েছে,' ডজ বললো। 'গেলে তার সাগরেদরা গিয়েছে। সে জাহাজেই রয়ে গেছে। লোকগুলো গাঁয়ে মদ খেতে গেছে।'

'মদ?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। নারকেলের ফুল থেকে তৈরি করে এখানকার লোকে।'

'তাই নাকি! নারকেলের ফুল থেকে মদ...'

'ব্র্যাণ্ডির চেয়ে কোনো অংশে খারাপ না...'

'আচ্ছা, মদের আলোচনা বাদ দাও এখন,' হাত নেড়ে বাধা দিলো ওমর। 'কাজের কথা বলো। কারনেসটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যেমন কুকুর তেমন মুগুর পেটা করা উচিত। তবে আগেই কিছু করবো না। যদি শয়তানী করে, তাহলে। সৈকতে কিছু ক্যানু দেখে এলাম। একটায় করে জাহাজে গিয়ে তাকে সোজাসুজি বলতে হবে ঝিনুককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। এক ক্যানুতে করেই আমরা সবাই যেতে পারবো। আমি কারনেসকে সামলাবো। কিশোর, তুমি আর মুসা পাহারায় থাকবে, সাগরেদগুলো ফিরে আসে কিনা দেখবে। ডজ, তুমি থাকবে নৌকায়। যোদ্ধাদেরকে বলো, আমরা না ফেরাতক যেন এখানেই থাকে।'

আবার সৈকতের দিকে রওনা হলো ওমর। নারকেল কুঞ্জের ভেতর থেকে বেরোনোর আগেই চোখে পড়ে ঝলমলে সাগর। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে গলিত রূপা। তার পেছনে এলো অন্য তিনজন।

নীরব নির্জন সৈকত। জীবনের চিহ্ন নেই। খোলা জায়গায় বেরোলো না ওরা, একধারে কয়েকটা রুটিফল গাছ জন্মে রয়েছে, তার নিচে এসে দাঁড়ালো। গাঁয়ের উঠনে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। শুধু ওই আগুন আর স্কুনারটা প্রমাণ করছে যে এখানে মানুষ আছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় নীরবে এগিয়ে চললো ওরা, ক্যানুগুলোর দিকে। বালির ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। একটা ক্যানু টেনে নামালো চারজনে মিলে। পানিতে পড়েই টলে উঠলো ওটা। জীর্ণ দশা। মেরামত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সবগুলো ক্যানুর একই অবস্থা। কিশোরের ভয়ই হলো, চারজনে উঠলে না ডুবে যায়। তবে ডুবলো না নৌকাটা। সাবধানে দাঁড় বাইতে শুরু করলো ওমর আর মুসা। জাহাজের দিকে এগিয়ে চললো যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে আর ঢেউ না তুলে। আস্তে করে এসে স্কুনারের গায়ে ভিড়লো নৌকা। মুসার তুলে রাখা দাঁড়ের পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে, তার শব্দও কানে আসছে, এতোই নীরব হয়ে আছে চারপাশ।

বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওমর। তার পেছনে উঠলো মুসা আর কিশোর। ডজ নৌকায় বসে রইলো।

'থাকো,' ফিসফিস করে বললো ওমর। 'পিস্তল তো আছে। গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।'

'দেখেশুনে করবেন,' নীরবে হাসলো মুসা। 'আমাদের গায়ে আবার লাগিয়ে দেবেন না।'

কম্প্যানিয়ন ওয়ের দিকে চললো তিনজনে। সবে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছেছে ওরা, এই সময় গর্জে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'কে?'

যে কেবিন থেকে কথা বলেছে লোকটা, একটানে ওটার দরজা খুলে ফেললো ওমর। নাকেমুখে এসে ধাক্কা মারলো যেন তামাকের ধোঁয়া আর কড়া মদের গন্ধ। হ্যারিকেন জ্বলছে। ধোঁয়ার জন্যে ছড়াতেই পারছে না হলদেটে আলো, অন্ধকার কাটেনি। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার ওপরে একটা চার্ট বিছিয়ে দেখছে কারনেস। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো সে। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওমর, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এটা। আচমকা গাল দিয়ে উঠে এক ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিলো টেবিলটা। খেঁকিয়ে উঠলো, 'এখানে কি?'

'তোমার কাছেই এসেছি,' কঠিন গলায় জবাব দিলো ওমর। 'সেই রাটুনা ছেলেটাকে চাই।'

'তাই নাকি?' রাগে ফুঁসতে শুরু করলো কারনেস।

'হ্যাঁ, তাই। আসতে বলবে, নাকি আমরাই গিয়ে ডেকে আনবো?'

'তোমাকে…তোমাকে আমি…'

'বুঝেছি। আমরাই ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। এই কিশোর, ছেলেটা কোথায় দেখ তো?'

ঝিনুকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সরু করিডর ধরে এগোলো কিশোর। কয়েকবার ডাকতেই সাড়া এলো দুর্বল কণ্ঠে। একটা দরজার সামনে এসে থামলো কিশোর। ওটার ভেতর থেকেই শব্দটা এসেছে। কিন্তু দরজায় তালা দেয়া। ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঝিনুক, তুমি ভেতরে আছো?'

'আছি।'

করিডরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে জুতোসহ একটা পা পাল্লার ওপরে তুলে দিলো কিশোর। তারপর ঠেলা দিলো। হলো না কিছু। আরো জোরে ঠেলতে লাগলো। চাপ সইতে না পেরে তালা ছুটে গিয়ে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। নাকে এসে লাগলো দুর্গন্ধ। কিছু দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললো। মেঝেয় বসে আছে একটা ছেলে।

'তোমার নাম ঝিনুক?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ। আমি ঝিনুক।'

'গুড। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এসো, ওঠো।'

দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা। ঘর থেকে বেরিয়ে কিশোরের পেছন পেছন চললো।

'এই যে, নিয়ে এসেছি,' ওমরকে বললো কিশোর।

দরজায় আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ওমর। হাতে পিস্তল।

খাঁচায় আটকা জানোয়ারের মতো আচরণ করছে কারনেস। মুখ খারাপ করে গালাগাল করছে। হুমকি দিচ্ছে বার বার।

'এবার ছেড়ে দিলাম,' ওমর বললো। 'আর যদি দেখি কখনও শয়তানী করেছো, এমন শিক্ষা দেবো তোমাকে…বুঝবে তখন।' বরফের মতো শীতল হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। 'ঘর থেকে বেরোবে না বলে দিলাম। তোমার মাথা দেখলেই

গুলি চালাবো আমি, মনে রেখো।' কিশোরকে নির্দেশ দিলো, 'ছেলেটাকে নৌকায় নিয়ে যাও।'

ডেকের কিনারে এসে দেখলো ওরা, তীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডজ। আরেকটা নৌকা নামানো হয়েছে। অনেকগুলো ছায়ামূর্তি নড়ছে তাতে। 'কারনেসের সাগরেদরা ফিরে আসছে,' নিচু গলায় বললো সে। 'কি করবো? দেখলে গণ্ডগোল করবেই।'

'না, করবে না,' বলে উঠলো আরেকটা কোমল কণ্ঠ। ক্যানুর কিনার থেকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো কিশোর, চাঁদের আলোয় সাগরের হাসির হাসি হাসি মুখটা। বললো, 'আরে তুমি। তুমি এখানে কি করছো?'

'দেখাচ্ছি,' বলেই ডুব দিলো মেয়েটা। খুব হালকা একটা আলোড়ন তুলে তলিয়ে গেল মাছের মতো।

'নৌকায় নামো,' নির্দেশ দিলো ওমর। 'সৈকতে ফেরা দরকার।'

ওদের ক্যানুটা এগোতে লাগলো সৈকতের দিকে, অন্য ক্যানুটা আসছে জাহাজের দিকে। দ্রুত। ডেকে বেরিয়ে এসেছে কারনেস। চেঁচিয়ে আদেশ দিলো তার সাগরেদদেরকে। আঞ্চলিক ভাষায়।

'কি বললো, ব্যাটা?' ডজকে জিজ্ঞেস করলো ওমর।

'আমাদেরকে ডুবিয়ে দিতে বললো।'

'চেষ্টা করেই দেখুক।'

তবে লড়াইটা আর হলো না। কারনেসের আদেশ পালন করার জন্যে ঠিকই তৈরি হয়েছিলো তার লোকেরা। নৌকার মুখও ঘুরিয়েছিলো কিশোরদের ক্যানুর কয়েক গজের মধ্যে এসে। কিন্তু হঠাৎ করেই এমন একটা কাণ্ড ঘটলো, যা কল্পনাও করতে পারেনি বিরোধী দল। পানিতে ঝপ করে একটা শব্দ হলো। মড়মড় করে উঠলো নৌকার পচা কাঠ। পরক্ষণেই কাত হয়ে গেল ক্যানুটা। একে অন্যের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো লোকগুলো। পর মুহূর্তেই পানিতে। চেঁচাতে শুরু করলো ওরা। তাদের চিৎকারকে ছাপিয়ে পানির ওপরে ছড়িয়ে পড়লো যেন মেয়েলী কণ্ঠের খিলখিল হাসি।

'টা-টা-টা-টা!' চেঁচিয়ে উঠলো ঝিনুক। অকটোপাস মারার সময় সাগরের হাসিকেও এরকম শব্দ করতে শুনেছে কিশোর, অনুমান করলো বেশি উত্তেজিত কিংবা আনন্দিত হলেই বোধহয় ওরকম শব্দ করে এখানকার লোকে। ঝিনুক বলছে, 'দিয়েছে! নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে সাগরের হাসি!' সে-ও ঝাঁপ দিলো পানিতে।

কিশোর আশা করলো, তার মাথাটা ভেসে উঠবে এখনই। উঠলো না। সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক, কারো মাথাই আর দেখতে পেলো না।

মুসাও খুঁজছে দু'জনকে। না দেখে বললো, 'খাইছে! ডজ, ঠিকই বলেছিলেন! এগুলো মানুষ না, মাছ!'

জাহাজের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেছে কারনেসের সাগরেদরা। এছাড়া আর কিছু করারও নেই ওদের, জানে। এখন ওমরদেরকে ধরতে এলে হয় বৈঠার বাড়ি খাবে, কিংবা পিস্তলের গুলি। ছুরির খোঁচা খাওয়ারও আশঙ্কা আছে। কে যায় শুধু

শুধু মরতে।

নিরাপদেই তীরে পৌঁছলো অভিযাত্রীরা। ঝিনুক আর সাগরের হাসির জন্যে অপেক্ষা করবে ভেবেছিলো, কিন্তু ডাঙায় উঠে দেখলো ওরা দু'জনই ওদের অপেক্ষায় রয়েছে।

'যাক,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। 'যা করতে এসেছিলাম, করেছি। এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

গাঁয়ের দিক থেকে এগিয়ে এলো কয়েকজন লোক। তবে খারাপ লোক মনে হলো না ওদেরকে। মারমুখো হয়ে আসেনি। ঝিনুক আর সাগরের হাসির সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আবার ফিরে চললো ওরা।

নিজের দলকে নিয়ে রওনা হলো ওমর, যোদ্ধারা যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে। ঝিনুককে দেখে খুব খুশি হলো ওরা।

অনেক পরিশ্রম করেছে। খানিকক্ষণ জিরাতে বসলো কিশোররা। সবাইকে বিস্কুট আর চকলেট ভাগ করে দিলো ডজ। খেতে খেতে ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলো, 'কারনেস শয়তানটা তোমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে, না?'

'করেছে। কোন দ্বীপে আপনাকে পাওয়া গেছে জানতে চেয়েছে বার বার।'

'বলেছো?'

'না। বলেছি, অনেক দূরে। বিশ্বাস করেনি। আমাকে মিথ্যুক বলেছে। মেরেছে। ধমক দিয়েছে, না বললে একেবারে মেরে ফেলবে।'

'হয়েছে, আর কিছু করতে পারবে না,' ছেলেটার কাঁধ চাপড়ে দিলো ডজ।

ঢাল বেয়ে যখন পাহাড়ে চড়ছে ওরা, তখনও মৃদু ভাবে কানে আসতে থাকলো কারনেসের চেঁচামেচি।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। বোধহয় একারণেই কুকুরগুলোর আর কোনো সাড়াশব্দ পেলো না এখানে এসে। যদিও মশাল জ্বেলে তৈরিই রয়েছে যোদ্ধারা। দিনের আলোয় পথ চলতেও সুবিধে। পাহাড়ের যেসব জায়গা ভয়াবহ মনে হয়েছিলো রাতের অন্ধকারে, এখন আর ততোটা বিপজ্জনক লাগছে না। চলার গতিও বাড়লো।

অবশেষে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা গাঁয়ে প্রবেশ করলো ওরা। ঝিনুককে দেখে এমন কাণ্ড শুরু করলো গাঁয়ের লোকে, এমন করে স্বাগত জানাতে লাগলো, যেন কবর থেকে ফিরে এসেছে সে।

অনেক পরিশ্রম করেছে। অভিযাত্রীরা সবাই ক্লান্ত। কারনেসের স্কুনারটা ফিরে আসতে পারে, আবার কোনো শয়তানীর চেষ্টা করতে পারে সে। অশান্ত সাগরকে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে বলে তিন সহকারীকে নিয়ে কুঁড়েতে এসে ঢুকলো ওমর। ঘুমাতে হবে। ডজ আইল্যাণ্ডে যাওয়াটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলো আগামী দিন ভোর পর্যন্ত।

পাঁচ

চমকে জেগে গেল কিশোর। কানে আসছে চিৎকার। কিছুই বুঝতে না পেরে

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে ছুটলো। মনে হচ্ছে কোনো গোলমাল হয়েছে। দরজা থেকেই সৈকত চোখে পড়ে। ভোর হয়ে গেছে। পুবের আকাশ লাল। মৃদু বাতাসে যেন অস্বস্তি বোধ করছে, এমনি ভঙ্গিতে কাঁপছে নারকেল পাতা। লেগুনের পানি শান্ত। আগের জায়গাতেই ভাসছে ফ্লাইং বোট। একটা নড়াচড়া চোখে পড়তেই ঝট করে তাকালো সেদিকে। সৈকত ধরে দৌড়ে আসছে সাগরের হাসি। 'আসছে! আসছে!' চিৎকার করছে সে, 'শয়তানটা আসছে!'

'কি হয়েছে?' ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলো ওমর। উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। জ্যাকেট চড়াচ্ছে গায়ে।

'কারনেস আসছে বলে!'

দুই লাফে দরজার কাছে চলে এলো ওমর। 'কই?'

'দেখতে তো পাচ্ছি না।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে!' পাথরের দেয়ালটার দিকে দেখালো কিশোর। লেগুনে ঢোকার মুখে খুদে একটা দ্বীপ পড়ে। ওটার পেছনে দেখা যাচ্ছে স্কুনারের পাল। সব ক'টা পালই ফুলে উঠেছে ভোরের বাতাসে। সাগরের পানিতে রাজহাঁসের মতো স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে জাহাজ। আরেকটু এগিয়ে ঘুরে গেল ওটার নাক। ঢুকে পড়লো লেগুনে। সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো সৈকতের দিকে।

'করছে কি? পাল নামায় না কেন?' কাঁধের ওপর দিয়ে বললো ডজ। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

'খাইছে! ওটা...' মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিশোরও বুঝে ফেললো। চেঁচিয়ে উঠলো, 'প্লেনটাকে ভাঙতে যাচ্ছে! ধাক্কা মারবে!'

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো সে। তারপরেই নড়ে উঠলো। 'মুসা, এসো!' বলেই সৈকতের দিকে দৌড় দিলো কিশোর। যেখানে ক্যানুগুলো রয়েছে। ওদের পেছনে ছুটলো সাগরের হাসি।

'ধরো, ধরো, হাত লাগাও!' একটা ক্যানুকে টানতে শুরু করলো কিশোর, পানিতে নামানোর জন্যে। বেজায় ভারি। বললো, 'নাহ্! নামানো যাবে না!' বলে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। কিছুই বুঝতে না পেরে মুসাও নামলো তার সঙ্গে। সাগরের হাসিও নামলো।

বিমানটার দিকে সাঁতরাচ্ছে কিশোর। পাশে চলে এলো মুসা আর সাগরের হাসি। কিশোরের চেয়ে ভালো সাঁতরায় মুসা, তার চেয়েও অনেক ভালো সাগরের হাসি, একেবারে মাছের মতো। মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবে?'

'নোঙরের দড়িটা কেটে দিতে হবে!' হাঁপাতে শুরু করেছে কিশোর। 'মুসা, জলদি!'

'আমি যাচ্ছি,' বলেই গতি বাড়িয়ে দিলো সাগরের হাসি। পানির ওপর দিয়ে পিছলে চলে যেতে লাগলো যেন। অনেক পেছনে পড়ে গেল মুসা আর কিশোর।

একশো গজ দূরে রয়েছে বিমানটা। কিশোরের মনে হলো, কয়েক মাইল। জাহাজটার আগে সে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না, বুঝে গেছে। মুসাও না। সাগরের হাসিই এখন একমাত্র ভরসা। ওরা অর্ধেক যাওয়ার আগেই পৌঁছে গেল মেয়েটা। নোঙরের দড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। কোমর থেকে ছুরি টেনে নিয়ে

কাটতে শুরু করলো দড়ি। ভোরের রোদে ঝিক করে উঠছে ছুরির ফলা। জাহাজটাও প্রায় পৌঁছে গেছে। ভালো বাতাস পেয়েছে। ফুলে উঠছে সব ক'টা পাল।

সাগরের দিক থেকে বইছে বাতাস, দড়ি কাটা হয়ে গেল। বিমানটাকে ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো তীরের দিকে। নাক ঘোরাতে শুরু করলো হোয়াইট শার্ক। ধাক্কা মারবেই, যে করেই হোক।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিশোর। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মগজে। কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা···আবার সাঁতরাতে শুরু করলো সে বিমানের দিকে। জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে চলে এলো বিমানের কাছে। নোঙরের দড়িটা চেপে ধরলো। মুসাকে বললো, 'ধরো!' দড়িটা ছেড়ে দিয়েই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো একটা উইং ফ্লোট। যেগুলোর ওপর ভর করে পানিতে ভেসে থাকে ফ্লাইং বোট। একপাশে কাত হয়ে গেল বিমান। পরোয়াই করলো না সে। মুসা দড়ি ধরেছে কি না সেটাও দেখতে গেল না। ফ্লোট থেকে এক ডানার ওপরে চড়লো। নাকের ওপর বসে জাহাজটার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের হাসি। কি করবে বুঝতে পারছে না। ডানার ওপর দিয়ে দৌড় দিলো কিশোর। মেয়েটাকে চুপ করে বসে থাকতে বললো। পিঠের ওপর দিয়ে পার হয়ে এসে নামলো আরেক ডানায়। চলে এলো ডানার একেবারে প্রান্তে। ওদিক দিয়েই এগোচ্ছে স্কুনারটা। লোহায় বাঁধানো গলুইয়ের একটা ধাক্কা লাগলেই চুরমার হয়ে যাবে ফ্লাইং বোট। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারলে সরিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু সময় নেই। কারনেসও বুঝতে পারছে সেটা। হুইল ধরে দাঁড়িয়েছে। মুখে কুৎসিত হাসি। নিশ্চিত হয়ে গেছে, তারই জিৎ হবে।

তবে একটা ব্যাপার সে জানে না, যেটা কিশোর জানে। উইং ফ্লোটের ওপর খুব হালকা হয়ে ভাসে ফ্লাইং বোট। একটা বাচ্চা ছেলেও টেনে ওটাকে সহজেই সরিয়ে ফেলতে পারে। তবে কোনো কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানোর মতো সেরকম কোনো জায়গা পায়নি কিশোর। তাই বিমানের ওপরই দাঁড়িয়েছে।

নোঙরের দড়ি ধরে রেখেছে মুসা। কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। ধাক্কা দেয়ার আগেই দু'হাত বাড়িয়ে স্কুনারের গলুইয়ের নিচেটা ধরে ফেলতে চায় কিশোর। তাহলে আর বিমানের গায়ে ধাক্কা লাগবে না। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাও সরতে থাকবে।

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে গলুইয়ের নিচের লোহাবাঁধানো জায়গাটার দিকে। ঠেকাতে পারবে তো? চট করে তাকালো একবার জাহাজের নোঙরটার দিকে। কাদা লেগে রয়েছে। পানি ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা। বলা যায় না, রেগে গিয়ে ওটা তার মাথার ওপরে ছেড়ে দিতে পারে কারনেস।

দুই পা ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো কিশোর। এসে গেছে গলুই। ধাক্কা প্রায় লাগে লাগে এই সময় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো গলুইয়ের নিচের অংশ। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লাগলো। পলকের জন্যে মনে হলো তার, পায়ের নিচ থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে বিমানের ডানা। দুলুনিতে পড়ে যাচ্ছিলো সে আরেকটু হলেই।

কোনোমতে সামলে নিয়ে জোরে এক ঠেলা মারলো জাহাজের গায়ে। জাহাজ সরলো না, সেটাকে সরানোর চেষ্টাও করেনি সে, পায়ের ধাক্কায় বিমানটাই বরং সরলো। এবার আর তাল সামলাতে পারলো না কিশোর। মাথা নিচু করে পড়ে গেল পানিতে। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো কানের ভেতর। বিশাল একটা ছায়া উঠে আসছে মাথার ওপরে। ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে যেতে লাগলো সে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস। ফেটে যাবে যেন। কিন্তু ওঠার উপায় নেই। জাহাজের তলায় বাড়ি লেগে ছাতু হয়ে যাবে খুলি। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ছায়াটার নিচ থেকে সরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো সে। সে সরলো, না ছায়াটাই সরলো, বলতে পারবে না। সুযোগ পেয়েই উঠতে শুরু করলো ওপরে। যখন মনে হলো, আর টিকবে না ফুসফুসটা, ঠিক ওই মুহূর্তে ভুস করে মাথাটা ভেসে উঠলো ওপরে। হাঁ করে শ্বাস টানতে শুরু করলো সে।

দীর্ঘ কয়েকটা সেকেণ্ড একভাবে ভেসে থেকে বাতাস টানলো সে। শক্তি ফিরে এলো খানিকটা। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো বিমানটার কি হয়েছে দেখার জন্যে। স্পষ্ট হয়নি এখনও দৃষ্টি। আবছা ভাবে দেখলো, তার দিকে সাঁতরে আসছে সাগরের হাসি। তীরের দিকে বিমানটাকে টেনে নিয়ে চলেছে মুসা। মুসার মুখটা দেখা যাচ্ছে ককপিটের জানালায়। স্টার্ট নিয়েছে ইঞ্জিন। তীরে দাঁড়িয়ে আছে ওমর আর ডজ। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

চলতে শুরু করলো বিমান।

ওটাকে ধরতে পারবে না বুঝেই যেন সমস্ত আক্রোশ কিশোর আর সাগরের হাসির ওপর এসে পড়লো কারনেসের। জাহাজের নাক ঘোরালো ওদের দিকে। মেরেই ফেলবে। গুলি আরম্ভ করলো ওমর আর ডজ। কিন্তু হুইল হাউসে কারনেসের গায়ে লাগাতে পারলো না একটা গুলিও।

বিমানটাও ছুটে আসছে।

কিশোরের হাত ধরে টান মারলো সাগরের হাসি। 'ডুব দাও!' বলেই ডুব মারলো সে।

কিশোরও ডুব দিলো। সাঁতরে চললো তীরের দিকে। কোনোমতে অল্প পানিতে চলে যেতে পারলেই হয়, যেখানে পৌঁছতে পারবে না জাহাজ। আবার যখন বাতাসের জন্যে তাগাদা দিতে লাগলো ফুসফুস, তখন ভাসলো। দেখলো, অনেকটা সরে এসেছে জাহাজের কাছ থেকে। আবার দিলো ডুব। আবার ভাসলো। আর ডুবলো না। নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছে। এখানে আর পৌঁছতে পারবে না স্কুনার। আর পারলেও ধরতে পারবে না ওকে।

তীরের অনেক কাছাকাছি চলে গেছে সাগরের হাসি। দৌড়ে আসছে ঝিনুক। পানির কিনারে এসে একটা মুহূর্ত থমকালো। দেখলো পুরো অবস্থাটা। তারপর নেমে পড়লো পানিতে। কিশোরকে সাহায্য করতে এগোলো।

ফ্লাইং বোট নিয়ে উড়াল দিলো মুসা।

তীরে উঠে ধপাস করে বালিতেই বসে পড়লো কিশোর। থু থু করে মুখ থেকে ছিটিয়ে ফেললো নোনা পানি আর বালি।

নাক ঘুরিয়ে ফেলেছে স্কুনারটা। আর কিছু করার নেই, বুঝে গেছে কারনেস।

ফিরে যাচ্ছে খোলা সাগরে।

জাহাজটা বেরিয়ে যাওয়ার পর লেগুনে নামলো আবার মুসা।

জিরিয়ে নিয়ে কাপড় পরে ডজ আর ওমরের সঙ্গে নাস্তা সেরে নিলো কিশোর ও মুসা। তারপর বিমানে করে রওনা হলো ডজ আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে। ঝিনুক আর সাগরের হাসিকেও নেয়া হয়েছে সঙ্গে। এতোগুলো মানুষ নিয়ে আকাশে উড়তে বেশ কষ্টই হলো ফ্লাইং বোটের। তবে যেটুকু অসুবিধে হয়েছে, তা ওঠার সময়। ওপরে উঠে আর কিছু হলো না। উড়ে চললো নিরাপদেই।

দশ মিনিটের মধ্যেই নজরে এলো ডজ অ্যাইল্যাণ্ড।

দ্বীপের লেগুনে বিমান নামালো ওমর। দক্ষিণ সাগরের অনেক দ্বীপেরই লেগুন দেখেছে কিশোর আর মুসা। তবে এটার মতো এতো সুন্দর আর দেখেনি। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর। জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়েছে ওরা। দারুণ খুশি। গড়গড় করে কি যেন বললো আঞ্চলিক ভাষায়। কয়েকটা শব্দ শুধু বুঝলো কিশোর আর মুসা। ডজকে জিজ্ঞেস করলো, কি বলেছে।

'ওরা বলছে,' ডজ জানালো। 'বিদেশী মানুষের কাজকারবারই আলাদা। এমন কোনো মজার কাণ্ড নেই, যা তারা করতে পারে না। বাক্সের ভেতর থেকে গান বের করে দিতে পারে। ক্যানুতে ডানা লাগিয়ে আকাশে উড়তে পারে।'

হাসলো দুই গোয়েন্দা। এসব কথায় কান দিচ্ছে না ওমর। সে তখন নোঙরের জায়গা খুঁজছে। বিমানের উইং ফ্লোট চিরে দিচ্ছে যেন লেগুনের শান্ত পানিকে, লাঙল দিয়ে মাটি ফাঁড়ার মতো করে। বিশাল ঢেউ উঠছে। 'এখানেই রাখলাম, কি বলো?' ডজের দিকে তাকালো সে।

'রাখো, যেখানে খুশি,' ডজ বললো।

'ক্যাম্পের কাছাকাছি রাখাই ভালো। চোখের আড়াল করা উচিত না। একবার করেই তো শিক্ষা হয়েছে।'

'ওই যে ওই নারকেল গাছগুলোর কাছাকাছি নিয়ে রাখো। তীরের কাছেও পানি বেশ গভীর। প্লেন থেকেই লাফ দিয়ে ডাঙায় নামতে পারবো। জুতো ভেজাতে হবে না। ওই যে, ওটাই আমার কুঁড়ে।' নারকেল পাতায় তৈরি ছাউনিটা দেখালো ডজ।

'তিনটে মাস থেকেছো ওর মধ্যে!' বিড়বিড় করলো ওমর।

'থেকেছি। বিল্ডিং আর এখানে পাবো কোথায়।'

ডজ যে জায়গাটা দেখিয়েছে ধীরে ধীরে বিমানটাকে সেখানে নিয়ে এলো ওমর। ইঞ্জিন বন্ধ করলো। পানি ওখানে এতো পরিষ্কার, মনে হয় নেইই, অবিশ্বাস্য লাগে।

প্রবালের একটা চড়ায় নামলো সে। বললো, 'এখানেই বাঁধি। জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে যাবো। যাতে সকালে উঠেই কাজে লেগে যেতে পারি।'

চোখা পাথরের মতো বেরিয়ে থাকা এক টুকরো প্রবালে বিমানের দড়ি বাঁধা হলো। ভেসে যাওয়ার ভয় নেই। টান লেগে ছুটবেও না, কারণ সামান্য ঢেউও নেই পানিতে। রসদপত্র আর পেট্রোল তীরে নামানো হলো প্রথমে। তারপর বয়ে

আনা হলো ডজের কুঁড়েতে। ঘরটা অতো খারাপ না। মেরামত করে নিলে সবারই জায়গা হয়ে যাবে। সাগরের হাসি আর ঝিনুকও অভিযাত্রীদের কাজে সাহায্য করলো। অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে ওরা আঞ্চলিক ভাষায়। ভালো লাগলো অন্যদের। ছেলেমেয়ে দুটো সহজ করে রেখেছে পরিবেশ। ডাইভিঙের পোশাক আর অন্যান্য সরঞ্জাম বিমানেই রেখে দেয়া হলো। আগামী দিন সকালে কাজে লাগবে ওগুলো।

'মুক্তো খেতটা কোনদিকে?' ওমর জানতে চাইলো।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখালো ডজ। 'কাল এই সময়ে অনেক ঝিনুক তোলা হয়ে যাবে আমাদের।'

'আচ্ছা, একটা কথা,' মুসা বললো। 'ঝিনুক খুলতে যাবে কে? যে রকম বড় বড় বললেন। ঝিনুক খোলা খুব কঠিন।'

হাসলো ডজ। 'ঠিকই। একটা দুটো হলে সম্ভব। কিন্তু আমাদেরকে যতোগুলো তুলতে হবে, অতোগুলো জ্যান্ত অবস্থায় ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খোলা…,' হাত নাড়লো সে। 'কিছুতেই পারবো না। তুলে এনে সৈকতে ছড়িয়ে রাখতে হবে, পচানোর জন্যে। ঝিনুক মরে গেলে আপনা আপনি ডালা ফাঁক হয়ে যাবে।'

'এতো ঝিনুক পচে নিশ্চয়ই খুব গন্ধ বেরোয়?' ওমর জানতে চাইলো।

'খুব মানে? ভয়াবহ! এতো দুর্গন্ধ পৃথিবীতে আর কিছুর আছে কি না জানি না। তবে ভয় নেই। আমরা ওগুলোকে ফেলবো দ্বীপের একধারে, বাতাস যেদিকে বইবে তার উল্টো দিকে। তাহলেই আর গন্ধ লাগবে না।'

আলোচনা আর খাবার তৈরি একসাথে চললো। তারপর খেতে বসলো ওরা। তখুনি একবার মুক্তো খেত দেখতে যেতে চাইলো কিশোর। ওমর রাজি হলো না। বললো, প্লেনটা একবার পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে পরে কোনো বিপদ না ঘটায়। আর ক্যাম্পেও সব কিছু গোছগাছ করা দরকার। ডজ বললো, সে ডুবুরির পোশাক আর সরঞ্জামগুলো পরখ করবে। তাকে সাহায্য করতে চাইলো মুসা।

আপাতত কিশোরের কিছু করার নেই। সে সাগরের হাসি আর ঝিনুককে নিয়ে চললো লেগুন দেখতে। ওটা কেমন, ভাবতে একটা শব্দই শুধু মাথায় এলো তার—পরীর রাজ্য। রঙের বাহার অভিভূত করে ফেললো তাকে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানিতে গাঢ় নীল আকাশের ছায়া পড়ে পানিকেও নীল করে তুলেছে। এর পটভূমিতে নারকেলের ঘন সবুজ পাতাকে লাগছে ছবির মতো। পানিতে সাঁতার কাটছে হাজার রকমের মাছ। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। রামধনুর সমস্ত রঙই রয়েছে ওগুলোর শরীরে। যেমন রঙ তেমনি ছটা। রীফের গায়ের কাছে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে প্রবালের ছড়াছড়ি। সূর্য রশ্মি তেরছা ভাবে এসে পড়েছে তার ওপর। কোথাও কোথাও এমন লাগছে, মনে হচ্ছে মেঘ করেছে পানির তলায়। কোথাও তুষার-শুভ্র প্রবাল পাথরের বিশাল চাঁইয়ের মতো মাথা তুলেছে পানির ওপরে, ভাসমান বরফখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ওগুলোকে। লেগুনের নিচেটা যেন রূপকথার এক রহস্যময় জগৎ। প্রবালের বিচিত্র আকার, আজব চেহারা। রঙও তেমনি। লালই আছে কয়েক রকম। ঘন লাল, রক্ত লাল, টুকটুকে লাল, ফ্যাকাসে লাল, গোলাপী। আছে নীল, সবুজ, হলুদ। মোট কথা একজন

শিল্পীর তুলি দিয়ে যতগুলো রঙ তৈরি করা সম্ভব, সবই আছে এখানে। অসাধারণ সুন্দর। জ্যান্ত উদ্ভিদের মতো লাগছে গোলাপী আর আশমানি রঙের প্রবালের ডালপালা। কোনোটা বড় পাতার মতো দেখতে, কোনোটা কৌণিক, কোনোটা আবার বিশাল ব্যাঙের ছাতার মতো। সে-এক উজ্জ্বল পৃথিবী। কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নেই। কঠিন অথচ দেখতে লাগে কোমল। সব কিছুতেই যেন জাদুর পরশ। অবিশ্বাস্য! এই সুন্দরের মাঝে দুই ফুট লম্বা একটা শুঁয়াপোকার মতো জীবকে বুকে হেঁটে এগোতে দেখে গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের। মনে পড়ে গেল ডজের কথা, সৌন্দর্য আর কদর্যের ঠাঁই এখানে পাশাপাশি।

জীবটাকে দেখে কিশোরের মুখ বিকৃত করে ফেলা নজর এড়ালো না সাগরের হাসির। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সে পানিতে। স্বচ্ছন্দে ডুবে গেল পানির তলায়। তুলে নিয়ে এলো জীবটাকে। কিশোরের চেহারা দেখে খিলখিল করে হাসলো। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে এলো ওপরে। কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে পানি ফেলছে।

কিশোর অনুমান করলো, দ্বীপটা তিন কি চার মাইল লম্বা। পাশে একেবারেই কম, মাত্র কয়েকশো গজ। তা-ও সব চেয়ে চওড়া অংশটায়। লেগুনের দিকটায় হ্রদের পানির মতোই শান্ত পানি, কিন্তু সাগরের দিকটায় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে ভীমবেগে। হাজারো বজ্রের আওয়াজ তুলে ফাটছে পানির পর্বত, অনবরত পানি ছিটাচ্ছে বৃষ্টির মতো। প্রবালের ওপর এসে জমা হয়েছে হাজারে হাজারে ঝিনুকের খোসা, সাগরে যতো রকম আর আকারের থাকতে পারে সব রকম—কিশোরের অন্তত তা-ই মনে হলো। আছে মাছের কঙ্কাল। বড় বড় দাঁতও পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেগুলো কোন জীবের বুঝতে পারলো না সে। তবে যারই হোক, সে-যে দৈত্যাকার প্রাণী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢেউ আসছে, আর সঙ্গে করে বয়ে আনছে ওসব।

দ্বীপে উদ্ভিদের প্রজাতি তেমন বেশি নেই। এসব অঞ্চলের প্রধান যে গাছ, নারকেল, তা আছে প্রচুর পরিমাণে। পানির ধার ঘেঁষেও জন্মেছে অনেক। ওপরের উঁচু দিকটায় জন্মেছে ঘন সবুজ ঘাস। কিছু অচেনা ঝোপ হয়ে আছে, তাতে উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটেছে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাটাও পানির সমতল থেকে পঁচিশ ফুটের বেশি উঁচু হবে না। হারিকেনের সময় নিশ্চয় ওখানেও পানি উঠে যায়। নোনা পানির এই অত্যাচারের কারণেই এসব অঞ্চলে উদ্ভিদ তেমন জন্মাতে পারে না।

ডাঙায় জীবনও অনেক কম, পানির তুলনায় প্রায় শূন্য বললেই চলে। যারা আছে তারাও বেশির ভাগই পানির জীব। বালিতে ঋষি কাঁকড়ার ছড়াছড়ি, হাজারে হাজারে, অদ্ভুত খোলাগুলো বিচিত্র শব্দ করে বন্ধ করছে, আবার খুলছে। পাথরের ওপর নুড়ি পড়লে যেরকম আওয়াজ হয়, বন্ধ করার শব্দটা অনেকটা তেমন। এছাড়া আছে কিছু সামুদ্রিক পাখি।

বিকেলের দিকে ভাটায় যখন টান পড়লো, আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেল তখন পরিবেশ। কেমন যেন গায়ে লাগে সেই নীরবতা। অসহ্য মনে হয়। বিষণ্ন করে দেয় মন। সাংঘাতিক নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে কিশোরের। এখানে তিনটে মাস একা একা থাকলো কি করে ডজ! পাগল যে হয়নি এটাই যথেষ্ট। অস্বাভাবিক

মনের জোর আর সহ্য ক্ষমতা তার। কিশোর হলে পারতো না। অনেকে তো সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাই করে বসে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সে অন্যদের কাছে। সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে আছে। পরিবেশের চাপ ওদের ওপরও পড়েছে, বোঝা যায়। এমনকি সাগরের হাসি আর ঝিনুকও অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে ঝিম মেরে রয়েছে।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলো ওমর, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পাহারায় থাকতে হবে। কারনেসকে বিশ্বাস নেই। প্রথম পালা তোমার।'

'ঠিক আছে, বস,' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো কিশোর। আগুনের দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে নেই আমরা, অন্য কোনো গ্রহে চলে গেছি! আশ্চর্য! আগেও তো দক্ষিণের দ্বীপে এসেছি, আটকা পড়েছি, পানির অভাবে মরতে বসেছি, তখন তো এরকম লাগেনি!'

'লাগেনি,' ডজ বললো। 'তার কারণ, তখন বাঁচার জন্যেই ব্যস্ত ছিলে। চুপ করে বসে থাকার সময়ই ছিলো না। ফলে বিষণ্নতাটা টের পাওনি। যে কোনো জায়গাতেই হোক, বাড়িতেও, কাজকর্ম না থাকলে, শুধু শুধু বসে থাকতে হলে মন খারাপ হয়ে যায়।'

আস্তে ঘাড় নাড়লো কিশোর। 'হ্যাঁ, তা বটে।'

ছয়

কাঁকড়ার যন্ত্রণায় রাতে ভালো ঘুমোতে পারেনি কিশোর। ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে ওগুলো, বার বার গায়ের ওপর উঠেছে। মুসা আর ওমরের ঘুম ভেঙেছে ওগুলোর জ্বালায়। তবে ডজ, সাগরের হাসি আর ঝিনুকের কিছু হয়নি। ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

ঝিনুক তুলতে যাওয়ার জন্যে ফ্লাইং বোটে চড়লো ওরা। সকালটা বেশ ভালো। ওরকম একটা কাজে যাওয়ারই উপযুক্ত। এমনকি খোলা সাগরও শান্ত।

ট্যাক্সিইং করে চললো ওমর। পাশে বসে নির্দেশ দিতে লাগলো ডজ, কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। বাইরে যদিও ঢেউ প্রায় নেই, তবু লেগুনে ঢোকার মুখটায় জোয়ারের পানি ঢোকার তীব্র স্রোত রয়েছে। বিমানটাকে এগোতে বাধা দিচ্ছে। তবে ঠেকাতে পারলো না। কারণ দুটো এঞ্জিন রয়েছে। তাছাড়া ওটার উইং ফ্লোটগুলো পানিতে তেমন ডোবে না। কামড় বসাতে পারলো না পানি। নৌকা-টৌকা হলে অবশ্য অন্য কথা ছিলো।

খোলা সাগরে বেরোতেই হাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করলো ডজ, 'ওদিকে যেতে হবে। ওড়ার দরকার নেই। সাগর যে রকম শান্ত, এভাবেই চালিয়ে চলে যাওয়া যাবে। তবে প্রবালের দেয়াল-টেয়াল আছে কি না লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব সাগরে ওসবের বিশ্বাস নেই। কোথায় যে পানির তলায় ঘাপটি মেরে থাকে, কিচ্ছু বোঝা যায় না। এমনিতে মনে হবে শুধু পানি, কিন্তু ফুটখানেক নিচেই হয়তো রয়েছে দেয়াল। লাগলে ফ্লোটের বারোটা বেজে যাবে।'

জানালার পাশে বসে দেখছে কিশোর। সাগরের ওপর দিয়ে এভাবে ট্যাক্সিইং করে ছুটে যেতে দারুণ লাগছে তার। জাহাজ কিংবা স্পীড বোট এতো জোরে ছুটতে পারে না। কোথাও কোনো বাধা নেই। শুধুই ছুটে চলা। আনন্দে বেসুরো গলায় গানই গেয়ে উঠলো সে।

পনেরো মিনিট একটানা সামনে ছুটলো ওমর। তারপর গতি কমাতে বললো ডজ। তার মনে হলো জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেছে। চেনার মতো কোনো চিহ্ন নেই। কয়েকশো গজের মধ্যে চলে এলেও বোঝার উপায় নেই। সাগরে এমনকি যন্ত্রের রিডিংও সঠিক হয় না। 'গড়' কিংবা 'প্রায়' ধরে নিতে হয়।

গতি একেবারে কমিয়ে ফেললো ওমর। ডজকে জায়গাটা খুঁজে বের করার সুযোগ দিলো।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো ডজ। বের করতে না পেরে বললো, 'আশপাশে থাকতে পারে। এক কাজ করো। গতি এরকমই থাক। চক্কর দিতে শুরু করো তো।'

যে ভাবে যা করতে বলা হলো, সে ভাবেই করতে লাগলো ওমর। সব ক'টা চোখ এখন পানির দিকে। সাগরের তল খুঁজছে।

'দেখি, রাখ তো এখানে,' ডজ বললো ওমরকে। 'ভাসুক। পেট্রোল খরচ বাঁচবে।' ডজ আইল্যাণ্ড দেখা যায় ওখান থেকে। সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে খেতটা কোন জায়গায় হতে পারে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। 'এখানেই আছে কোথাও। মুশকিলটা হলো, এখন সাগর শান্ত। আমি দেখেছি ঢেউয়ের সময়। এখন ডুব দেয়া সহজ বটে, কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করা কঠিন।'

স্টার্ট বন্ধ করলো না ওমর, তবে গতি বন্ধ করে দিলো। সাগরের ওপর ভেসে রইলো ফ্লাইং বোট। একটু একটু করে সরছে। পেরিয়ে গেল কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। এখনও সব ক'টা দৃষ্টি পানির দিকে, সাগরের তল খোঁজায় ব্যস্ত।

'আমাদের এই কাণ্ড দেখলে এখন,' হেসে বললো মুসা। 'পাগল বলতো লোকে। ফ্লাইং বোটে বসে সাগরের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা···হাহ্ হাহ্।'

'হ্যাঁ,' ওমরও হাসলো।

'তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে মনে হয়?' ভুরু কোঁচকালো ডজ। 'এখানে নেই ভাবছো নাকি?'

'না না, তা ভাবছি না। তবে যে রকম করে খুঁজছি আমরা সেটা হাস্যকর।'

'এই দেখ, ওটা কি?' আচমকা চিৎকার করে উঠলো কিশোর। 'কি যেন দেখলাম মনে হলো!'

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সাগরের হাসি। বললো, 'আমি দেখে আসি।' বলেই খুব সামান্য একটা ঢেউয়ের আঙটি তৈরি করে ডুবে গেল পানিতে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কয়েক মুহূর্ত একই জায়গায় থেকে মুখ নিচু করে নিচের দৃশ্য দেখলো সাগরের হাসি। তারপর ডুবতে শুরু করলো। মাছ যেভাবে আস্তে আস্তে পাখনা দোলায় অনেকটা তেমনি করে পা দোলাচ্ছে মেয়েটা। পানি এতো পরিষ্কার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। এক ঝাঁক মাছ চলে গেল ওর শরীরের ওপর দিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরের হাসি। আর ওঠে

না। ভয়ই পেয়ে গেল কিশোর। সাগরের এই মাঝখানে কিছু হলো না তো তার!

সাগরের হাসিকে আবার ভেসে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। মাথা তুললো মেয়েটা। হাতটা তুলে দেখালো। মস্ত একটা ঝিনুক নিয়ে এসেছে। নাক উঁচু করে দম নিতে লাগলো। শিসের মতো শব্দ বেরোতে লাগলো নাক দিয়ে। এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে কিশোর। অনেকক্ষণ পানির নিচে ডুব দিয়ে এসে এভাবেই দম নেয় দক্ষিণ সাগরের উভচর মানুষগুলো।

মেয়েটার হাতে ঝিনুক দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ডজ। 'ওই তো! পেয়েছে, পেয়েছে! সাগর এখানে বেশি হলে একশো ফুট গভীর। কেন দেখা যাচ্ছে না বুঝতে পারছি। সূর্য অনেক নিচুতে রয়েছে। খাড়া রোদ না পড়লে দেখা যাবে না তল। আমি যখন দেখেছি, তখন ঠিক দুপুর, মাথার ওপরে ছিলো সূর্য।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছো,' একমত হয়ে মাথা দোলালো ওমর।

ঝিনুকটা বিমানের ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়ে উঠে এলো সাগরের হাসি। উত্তেজিত কণ্ঠে মারকুইজান ভাষায় দ্রুত কিছু বললো ডজকে। নিচের দিকে দেখাতে লাগলো।

'ও বলছে,' অনুবাদ করে বললো ডজ। 'সাগরের তলা এখানে পাহাড়ের ঢালের মতো নেমে গেছে। আর ওদিকটায় গভীরতা কম। আমি যা ভেবেছিলাম। আসলে সাগরের তল নয় এটা, একটা ডুবো পর্বতের চূড়া। ওমর, ওদিকটায় নিয়ে যাও।'

চালাতে শুরু করলো ওমর। ফ্লাইং বোটটাকে নিয়ে এলো ডজের নির্দেশিত স্থানে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাখো এখানেই!' চেঁচিয়ে বললো ডজ। 'তল দেখতে পাচ্ছি! ওই তো! বলেছিলাম না? পানি বেশি হলে বিশ-তিরিশ ফুট হবে!'

অন্যেরাও তাকিয়ে দেখলো, ঠিকই বলছে ডজ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগরের তল। অসংখ্য ঝিনুক ছড়িয়ে আছে, ডালা ফাঁক করা।

দেরি করলো না ডজ। ডাইভিং স্যুট পরতে আরম্ভ করলো। তার দিকে তাকিয়ে মুসাও উসখুস করে উঠলো ওই পোশাক পরে ডুব দেয়ার জন্যে। কাজটা বিপজ্জনক, তার পরেও আনন্দ পায় সে। খুব ভালো ডুবুরি মুসা। কানে বাজছে ওস্তাদের কণ্ঠস্বর, 'অনেকে পেশা হিসেবে নেয় কাজটাকে। ভয়ানক বিপজ্জনক পেশা। দুনিয়ার কোনো বীমা কোম্পানিই ডুবুরির জীবন বীমা করতে রাজি নয়। কারণ যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে তার।'

ঠিক যেন সেই ওস্তাদের কথাগুলোই নকল করে বলতে লাগলো ডজ, মুসার সেরকমই মনে হলো, 'বিপদে পড়াটা এখানে কিছুই না। অনেক ব্যাপার আছে। সেগুলো এখন কোনোটাই মনে করতে চাই না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। বাথটাবের মতো বড় বড় ঝিনুক আছে সাগরে, এখানটায়ও থাকতে পারে। টন খানেক ওজন হবে। ডালা ফাঁক করে ছড়িয়ে পড়ে থাকে অনেক সময়, শিকার ধরার জন্যে। ওটার মধ্যে পা পড়লে আর রক্ষা নেই। ঝট করে বন্ধ হয়ে যাবে ডালা। টেনে খোলা অসম্ভব। কপাল ভালো হলে তখন ডাইভারের কোনো একজন সঙ্গী গিয়ে যদি পা কেটে আলাদা করে তুলে আনতে পারে। আর কোনো উপায়

নেই।' সাগরের হাসি আর ঝিনুককে দেখিয়ে বললো, 'ওরা এসেছে, খুব ভালো হয়েছে। ওরকম অবস্থায় পড়লে কি করতে হবে জানে।' দু'জনের সঙ্গে কথা বললো সে। একটা করে হাতকুড়াল তুলে দিলো ওদের হাতে। মাথা ঝাঁকালো দু'জনেই। হাসি হাসি ভঙ্গিটা দূর হয়ে গেছে মুখ থেকে।

এসব কথা কিশোরেরও জানা আছে। সে আর রবিনও মুসার সাথে একই সময়ে ট্রেনিং নিয়েছে। তবে মুসা জাতসাঁতারু, ওরা নয়। কিছুদিন দক্ষিণ সাগরের কোনো দ্বীপে মুসাকে রেখে দিলে সে-ও ঝিনুক কিংবা সাগরের হাসির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে।

'সংকেতগুলো মনে আছে তো?' কিশোর,মুসা আর ওমরের দিকে তাকিয়ে বললো ডজ। 'ঈশ্বর যেন সেরকম অবস্থায় না ফেলেন! দড়িতে চারটে টান দিলে বুঝতে হবে, ভয়ানক বিপদে পড়েছি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তখন দড়ি টেনে তুলে আনতে হবে। ওরকম করার প্রয়োজন সাধারণত পড়ে না, দশ লাখে একবার হয়তো পড়তে পারে, আমি যদ্দুর জানি। তবু, ওই একটা বার আমার কপালেও ঘটতে পারে। টানতেই থাকবে, দড়ি ছিঁড়ে যায় যাক, তবু থামবে না। তবে সংকেত না পেলে কক্ষণো ওরকম করবে না, বুঝলে?' শেষ কথাটা ওমরের দিকে তাকিয়ে বললো সে।

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' শান্তকণ্ঠে বললো ওমর।

'বেশ। এবার আমাকে সাজিয়ে দাও,' এই কথাটা কিশোর আর মুসাকে উদ্দেশ্য করে বললো ডজ।

ডাইভিং স্যুটের বেল্ট বাঁধতে তাকে সাহায্য করলো দুই গোয়েন্দা। সব শেষে হেলমেটটা মাথায় গলিয়ে সকেটে বসিয়ে দিলো। নাটগুলো টাইট করে দিলো দু'জনে। বেজায় ভারি পোশাক। পা টেনে টেনে এগোলো ডজ বিমানের দরজার পাশে ঝুলিয়ে রাখা মইয়ের দিকে, ওটা বেয়েই নামতে হবে।

নেমে গেল নিচে। পানিতে মাথা ডোবানোর আগে এক মুহূর্ত থেমে ওপরের দিকে তাকালো। হেলমেটের কাঁচের ঢাকনার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার মুখ। হাসলো। তারপর ডুবে গেল। ডাইভিং স্যুটের সঙ্গে যুক্ত এয়ারপাম্পের হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে মুসা। কিশোর ছাড়ছে লাইফ লাইন। স্ক্যুবা ডাইভিঙে যেসব পোশাক ব্যবহার হয়, ওগুলোতে এতো সব ঝামেলা করতে হয় না। তবে ওগুলো নিয়ে বেশি দূর যেমন নামাও যায় না, বেশিক্ষণ ডুবেও থাকা যায় না পানিতে। কারণ পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিণ্ডারে থাকে সীমিত অক্সিজেন। আর নিজের দায়িত্বে ঘুরে বেড়ায় ডুবুরি। কিছু ঘটলে বাইরের কেউ জানতে পারে না তার কিছু হয়েছে।

মিনিটখানেক পরে দড়ি হঠাৎ ঢিল হয়ে যাওয়ায় বোঝা গেল তলায় পৌঁছেছে ডজ। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটা তারের ঝুড়ি নামিয়ে দিলো ছেলেটা, ঝিনুক তোলার জন্যে। ওর হাতে কুড়াল। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। দড়িতে একটামাত্র টান পড়লো।

'ঝুড়ি তোলো,' নির্দেশ দিলো কিশোর।

তোলা হতে লাগলো। পানির অনেক নিচে থাকতেই দেখা গেল ঝুড়িটা। বিশ-পঁচিশটা বড় বড় ঝিনুকে বোঝাই। কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দিলো ওমর। কেবিনের মেঝেতে ওখানে ঝিনুকগুলো ঢেলে দিয়ে আবার ঝুড়িটা নিয়ে পাঠিয়ে দিলো ঝিনুক।

কয়েকবার করে চললো এরকম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনেক ঝিনুক জমে গেল কেবিনে। সেগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া হলো মেঝেতে, বিমানের ভারসাম্য সমান রাখার জন্যে। নইলে একদিকে বেশি কাত হয়ে যাবে। সবচেয়ে কম গভীর জায়গাটা প্রায় খালি করে ফেললো ডজ। তারপর সরে গেল আর একটু গভীরে। মাঝে মাঝে ওপর থেকে তাকে দেখা গেল হালকা রঙের প্রবালের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময়। কিন্তু গাঢ় রঙের প্রবালের মাঝে যেখানে অন্ধকার হয়ে আছে, সেখানে থাকলে দেখা যায় না। পানিতে বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে, কিংবা গভীর পানিতে থাকলে ডুবুরির রক্তে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। তখন তাকে তাড়াতাড়ি তোলার চেষ্টা করলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। এতে অকল্পনীয় কষ্ট পেয়ে মারা যায় রোগী। তবে ডজ এখন যে গভীরতায় রয়েছে, তাতে সেরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই।

ডজের উঠে আসার ইঙ্গিত পেয়ে হাঁপ ছাড়লো কিশোর। কয়েক মিনিট পর তার মাথা ভেসে উঠলো পানির ওপরে। দুর্বল ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠে এসে মেঝেতে বসে পড়লো সে। তার হেলমেট খুলে নেয়া হলো।

'ভালোই তুলেছি, তাই না?' ঝিনুকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো ডজ। 'জিরাতে এলাম।'

'নিচেটা কেমন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'চমৎকার। দু'একটা বিশ্রী খাঁজ আছে অবশ্য। ডাঙার ওপরের পাহাড়েও থাকে ওরকম। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আরেকটা বাজে জিনিস হলো প্রবাল, আকৃতির কোনো ঠিকঠিকানা নেই। লাইফ লাইন আর এয়ার টিউবের ওপর কড়া নজর রাখতে হয়েছে সারাক্ষণ। প্রবালে ঘষা লেগে কিংবা জড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্রোতও বেশ। জোরেই টানে।'

'দড়ি প্যাচ লাগে নাকি?'

'লাগে মানে? প্রবালে ওটাই তো বেশি লাগে। সব চেয়ে বড় ভয় এখানে।'

ডাইভিং স্যুট খুললো না ডজ। আরেকবার নামার ইচ্ছে। 'যতগুলো তুলেছি, আরও অতগুলো তুলবো,' বললো সে। ঝিনুককে বললো আবহাওয়ার দিকে নজর রাখতে। কারণ কখন বাতাস বইতে আরম্ভ করবে তার ঠিক নেই। ঝিনুকই সেটা ভালো বুঝতে পারবে। সাগরে হঠাৎ ঢেউ উঠলে বিপদে পড়তে চায় না ডজ।

তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। আগের মতোই শান্ত রয়েছে সাগর। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডজ। নেমে গেল পানিতে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরোলো। বিমানে যারা বসে আছে তাদের কাছে অনেক দীর্ঘ লাগছে। তবে ঝিনুক তোলার বিরাম নেই। কিছুক্ষণ পর পরই ঝুড়ি ভর্তি করে পাঠাচ্ছে।

'অনেক হয়েছে,' অবশেষে ঝিনুকের স্তূপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো ওমর। 'আর বেশি তুললে বিপদে পড়তে পারি।'

'বিপদ?' বুঝতে পারলো না মুসা।

'বাতাস বইতে শুরু করলে আর ঢেউ উঠলে মহাবিপদ হবে। এতো ভার নিয়ে কিছুতেই আকাশে তোলা যাবে না প্লেন। সীসার মতো ভারি হয়ে যাবে, উঠতেই চাইবে না পানি থেকে। বাঁচার তাগিদে তখন ঝিনুক ফেলেও দেয়া লাগতে পারে। এতো কষ্ট করে তুলে এনে ফেলার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে কম রাখাই ভালো।' আকাশের দিকে তাকালো সে। 'আকাশ অবশ্য ভালোই আছে। হঠাৎ খারাপ হবে বলে মনে হয় না। তবে এখানকার আবহাওয়াকে বিশ্বাস না করাই ভালো।'

সেটা খুব ভালো করেই জানে কিশোর আর মুসা। আগের বার এখানে এসে হারিকেনের রূপ দেখছিলো ওরা। ভাবলেই পিলে চমকে যায়।

ভাবতে চাইলো না কিশোর। বললো, 'আর বেশি তুলবেও না।' ঘড়ি দেখলো সে। 'উঠে চলে আসবে।' লাইফ লাইনটাকে এমন ভাবে ছুঁলো, যেন বড়শি ফেলে মাছের অপেক্ষায় রয়েছে, ফাৎনায় টান পড়লেই মারবে কষে টান।

আরও কয়েক মিনিট পেরোলো। টেনে তোলার সংকেত আর আসে না।

'অনেকক্ষণ হলো,' কিশোর বললো, 'আর কোনো ঝিনুকও তো পাঠাচ্ছে না।'

কেউ জবাব দিলো না। ধীরে গড়িয়ে চলেছে সময়, মিনিটের পর মিনট কাটছে। ঘড়ির দিকে তাকালো ওমর। তারপর ইনস্ট্রুমেন্ট বোর্ডের দিকে। 'এক ঘণ্টা হয়ে গেছে।' ঘোষণা করার মতো করে বললো।

'নড়ছে,' বললো কিশোর। 'দড়িতে টের পাচ্ছি। তবে বেশি না। ঝিনুকের খোলে পা দিলো না তো? বড়গুলোর?'

বিমানের পিঠের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের হাসি বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ কোনো কথা বলছে না। হঠাৎ কোমর থেকে একটানে ছুরিটা খুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরলো। পিছলে নেমে গেল পানিতে। মাথা নিচু করে দ্রুত সাঁতরে নেমে, যেতে লাগলো।

চট করে মুসার চোখে চোখে তাকালো কিশোর। দৃষ্টি ফেরালো ওমরের দিকে।

শ্রাগ করলো ওমর। 'বুঝলাম না কেন ওরকম করলো! নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'খাইছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'উঠে আসছে! এতো তাড়াহুড়ো করছে কেন?'

ভুস করে পানির ওপরে মাথা তুললো সাগরের হাসি। মুখ থেকে পানি ছিটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ফেকি! ফেকি !' দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললো, 'অনেক বড়!'

'ফেকি! খোদা! অকটোপাসের কথা বলছে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। 'ওমর ভাই, কি করবো? টেনে তোলার চেষ্টা করবো?'

'ও তো বললো সংকেত না দিলে না টানতে,' কঠিন হয়ে উঠেছে ওমরের মুখ।

ভাবভঙ্গিতে আর ভাঙা ইংরেজিতে মেয়েটা জানালো, অকটোপাসের সঙ্গে লড়াই করছে ডজ। সাগরের হাসি তাকে সাহায্য করতে যেতে সাহস করেনি। দড়িতে জড়িয়ে যেতে পারে। আটকে গিয়ে দম আটকে মরবে তখন।

'মুসা, থেমো না!' কিশোর বললো, 'পাম্প চালিয়ে যাও!' দড়ি টান দিলো সে। একটুও উঠলো না। টানটান হয়ে গেল দড়ি। কাঁপছে মৃদু।

'এভাবে হবে বলে মনে হয় না!' উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় ভারি হয়ে উঠেছে মুসার নিঃশ্বাস। 'অন্য কিছু করা দরকার!'

'মিনিটখানেক সময় দিয়ে দেখা যেতে পারে!' কিছু করার সিদ্ধান্ত ওমরও নিতে পারছে না। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। 'হয়তো তাড়িয়ে দিতে পারবে। প্রয়োজন ভাবলে নিশ্চয় তোলার জন্যে সংকেত দিতো।'

'হাতটাত সব জড়িয়ে ধরেছে কি না তাই বা কে জানে!' কিশোর বললো। 'হয়তো নড়তেই দিচ্ছে না! জানোয়ার তো না ওগুলো, শয়তানের চেলা!'

'দাঁড়াও! টেনো না!'

মিনিটখানেক কেউ কোনো কথা বললো না। দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। মূর্তির মতো।

'ঝিনুক,' অবশেষে বললো ওমর। 'নিচে গিয়ে দেখবে কি হয়েছে?'

হাত থেকে ঝুড়ির দড়িটা ছেড়ে দিলো ঝিনুক। কোমর থেকে ছুরিটা নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে ঝাঁপ দিতে যাবে এই সময় চিৎকার করে উঠলো কিশোর, 'টানছে!...এক...দুই...তিন... চার! তার মানে টানতে হবে, যতো জোরে পারা যায়!' টানতে শুরু করলো সে। একচুল নড়লো না দড়ি। যেন পাথরে আটকে গেছে। 'ওমরভাই! ঝিনুক! ধরো!'

দু'জনেই ছুটে এলো তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু তিনজনে মিলে টেনেও এক ইঞ্চি তুলতে পারলো না দড়ি।

'ইয়াল্লা!' বলে উঠলো ওমর। 'আর জোরে টান দিলে ছিঁড়ে না যায়!' খসখসে হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। না টেনে আর কিছু করারও নেই। মুসাকে পাম্প চালিয়ে যেতে বলে আবার টান দিলো দড়িতে।

তিনজনে মিলেই টানছে। দড়ি আর নড়ে না।

'হবে না,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করলো কিশোর। 'বোধহয় পেঁচিয়ে ফেলেছে কোনো কিছুতে। দেখি আরেকবার চেষ্টা করে। সাগরের হাসি, এসো, তুমিও ধরো।'

চারজনে মিলে টানতে শুরু করলো। ঘাম বেরিয়ে এসেছে সকলেরই। টানের চোটে একপাশে কাত হয়ে গেছে বিমানটা। তবু এক ইঞ্চি নড়লো না দড়ি। মনে হচ্ছে ওমরের অনুমানই ঠিক। পেঁচিয়ে গেছে কিছুতে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওমর। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো। 'ও বলেছে যতোক্ষণ দড়ি না ছেড়ে, টানতে। ঠিক আছে। হয় সে উঠবে, নয়তো দড়ি ছিঁড়তে যাচ্ছি আমি। এটাই ওর শেষ সুযোগ!' কিশোর যেখানে ধরেছে, তার পেছনের দড়ির অংশটুকু নিয়ে একটা সীটের পায়ায় পেঁচিয়ে বাঁধলো সে। সবাইকে দড়ি ছেড়ে দিতে বলে গিয়ে উঠে বসলো পাইলটের সীটে। থ্রটলে চেপে বসলো আঙুলগুলো।

মৃদু ঝিরঝির করে চলছিলো এঞ্জিন, সেটা রূপান্তরিত হলো গর্জনে। সামনে টান দিলো বিমান। ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে গেল দড়ি। প্রচণ্ড চাপে ডানে কাত হয়ে গেল বিমান। ডানার ডগা পানি ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু আগে আর বাড়তে পারছে না। শেষে ডানে কেটে, চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করলো।

'কতোটা দিয়েছেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হাফ থ্রটল।'

'আরো লাগবে। দড়ি নড়ছে না। চালিয়ে যান।'

'ভয় লাগছে, প্লেনটাই না উল্টে যায়!'

'যাবে না। টানুন।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন।

'উঠছে! উঠছে!' চিৎকার করে উঠলো কিশোর।

আরো জোর বাড়ালো ওমর। বুনো ঘোড়ার লাগাম পরানো হয়েছে যেন, খেপে গেছে, ওরকম আচরণ করছে বিমান। যেখানটায় ঘুরছে ওটা, সেখানে ফেনার ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে।

'আসছে!' আবার চেঁচিয়ে বললো কিশোর। দড়ি ধরে টানতে শুরু করেছে সে। ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ, পরিশ্রমে।

হঠাৎ থ্রটলের পাওয়ার কেটে দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল ওমর, কিশোরকে সাহায্য করার জন্যে। ঝিনুক আর সাগরের হাসিকেও ডাকলো। 'টানো! টানো! ছাড়বে না!'

মুসা পাম্প ছাড়ছে না।

উঠে আসছে ভেজা দড়িটা, প্রতিবারে এক ফুট করে।

'ওমাথায় ডজ ছাড়াও আর কিছু আছে,' ওমর বললো। 'ভাগ্যিস নতুন দড়ি। মোটা দেখে লাগিয়েছিলো ডজ।'

নাইলন না হলে যতো মোটাই হোক, টিকতো না,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। ঝিনুক, কুড়াল নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও।'

এক ফুট এক ফুট করে উঠে আসছে দড়ি। সাংঘাতিক কাত হয়ে গেছে বিমান। এখন শুধু কিশোর আর ওমর টানছে। সাগরের হাসিও চলে গেছে দরজার কাছে, উবু হয়ে বসে তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। হঠাৎ লফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আসছে! আসছে! ওই তো!' একটু থেমে আবার চিৎকার করে উঠলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'আসছে! ফেকি আসছে!' হাতে ছুরি, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দাঁত। চকচকে চোখ। পুরোপুরি বন্য লাগছে এখন তাকে, আদিম মানবী, ভয়াবহ শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি।

পানির ওপরে ঝটকা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শুঁড়, বীভৎস ভঙ্গিতে পেঁচালো আর খুললো, প্রজাপতির শুঁড়ের মতো করে। কিলবিল করে উঠলো।

'খবরদার! টান ছাড়বে না!' চিৎকার করে বললো ওমর।

'টেনে ডুবিয়েই না ফেলে!'

'টান ছেড়ো না! প্লেন ডুববে না। ওই তো, আরও উঠছে।' ডজকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে অকটোপাসটা। 'ধরে রাখো, ছেড়ো না।' বলে দড়ি ছেড়ে দিলো

ওমর। তুলে নিলো একটা হাতকুড়াল। সাগরের হাসিকে তখন যেটা দিয়েছিলো। কোপ মারলো পানিতে।

'দড়ি কাটবেন না! সাবধান!' চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করলো কিশোর।

'কিশোর, আমিও যাই!' হাত নিসপিস করছে মুসার। পাম্পের কাছে এভাবে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না ওর।

'না, না!' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'যা করছো করো।'

ওমর কিছুই বললো না। কুপিয়ে চলেছে। ভেসে উঠলো একটা কাটা শুঁড়। এখনও পাক খুলছে আর বন্ধ করছে। টিকটিকির লেজের মতোই যেন শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মরে না। আরেকটা শুঁড় বেরিয়ে এসে বিমানের কাঠামো পেঁচিয়ে ধরে টান দিলো। কাত করে ডুবিয়ে দেয়ার ইচ্ছে যেন বিমানটাকে। ধাঁ করে কোপ মারলো ওমর। শুঁড় কেটে প্লাইউডে বসে গেল কুড়ালের ফলা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে আনলো আবার।

কুড়াল দিয়ে কোপাতে বোধহয় ভালো লাগেনি ঝিনুকের, সেটা রেখে দিয়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা মারছে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে। সাগরের হাসিও খোঁচাচ্ছে। দু'জনে পানির একবারে কাছাকাছি চলে গেছে। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে একটা শুঁড় এসে টেনে নিতে পারে ওদেরকে পানিতে।

দড়ি ছাড়ছে না কিশোর। টেনে ধরে রেখেছে। বাঁকা হয়ে গেছে তার শরীর। টপটপ করে ঘাম ঝড়ছে কপাল থেকে।

দেখা যাচ্ছে অকটোপাসের বড় বড় চোখ, কেমন সম্মোহনী দৃষ্টি। কুড়াল রেখে দিয়ে পিস্তল বের করলো ওমর। পিরিচের মতো বড় চোখদুটোর মাঝখানে সই করে গুলি শুরু করলো। খালি করে ফেললো ম্যাগাজিন।

আচমকা ঢিল হয়ে গেল দড়ি। চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর। কোনোমতে উঠে দেখলো, পানিতে ভাসছে ধূসর রঙের একটা মাংসের দলা, তাতে যেন জোড়া লেগে রয়েছে কতোগুলো কুৎসিত শুঁড়, তার কয়েকটা আবার কাটা, আরও ভয়ংকর লাগছে। ধক করে উঠলো বুক। ডজ কি নেই! না, আছে। ওই তো, হেলমেট দেখা যায়। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো ওমর আর সাগরের হাসি। টেনে তুললো ডজকে। চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে রইলো ডুবুরি।

'হেলমেটটা খোল!' নির্দেশ দিয়েই ককপিটের দিকে ছুটলো ওমর। গর্জে উঠলো এঞ্জিন।

'ম্যাকো! ম্যাকো!' বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সাগরের হাসি। হাত তুলে দেখালো। 'ফেকিকে এবার শেষ করবে!'

সবাই দেখলো, কয়েকটা হাঙর এসে হাজির হয়েছে। কামড়াতে শুরু করেছে অকটোপাসটাকে। সাবাড় করতে সময় লাগবে না, বোঝা গেল। কেঁপে উঠলো কিশোর। ডজকে তুলতে আরেকটু দেরি হলেই…ভাবতে চাইলো না সে। মুসাকে ডাকলো তাকে সাহায্য করার জন্যে। হেলমেট খুলতে শুরু করলো। নিথর হয়ে পড়ে আছে ডজ। ছাই হয়ে গেছে মুখের রঙ। সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো মুসা, 'খাইছে! মরেই গেল নাকি!'

ছুটে গিয়ে কেবিন থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে নিয়ে এলো সে। আঙুল দিয়ে

টেনে ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতরে ঢেলে দিলো খানিকটা ব্র্যাণ্ডি।

ততোক্ষণে লেগুনের কাছে পৌঁছে গেছে বিমান। প্রায় ওড়ার গতিতেই ছুটছে পানির ওপর দিয়ে। কয়েকবার লাফিয়ে উঠেই পড়েছিলো কয়েক ইঞ্চি করে। মুখের কাছে পৌঁছেও গতি কমালো না ওমর। তীব্র গতিতে ঢুকে পড়লো সরু চ্যানেলে। নিয়ে এলো শান্ত পানিতে, যেখানে নোঙর করেছিলো। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সাহায্য করলো ডজকে তীরে নামাতে।

নারকেল গাছের ছায়ায় এনে আস্তে করে বালিতে শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। চোখ মেললো ডজ। নীল আকাশের ছায়া পড়লো তার চোখে। দুর্বল কণ্ঠে ককিয়ে উঠলো, 'ঝিনুকগুলো আছে তো?'

'নিজে যে মরতে বসেছিলে, সেটা নয়, প্রথমেই ঝিনুকের চিন্তা,' স্বস্তি মেশানো ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো ওমর। 'তোমাকে যে বাঁচাতে পেরেছি এতেই আমরা খুশি। চুলোয় যাক ঝিনুক। কিশোর, ধরো তো, স্যুটটা খুলে ফেলা যাক।' ডজকে জিজ্ঞেস করলো, 'খুলতে পারবো তো? তোমার অসুবিধে হবে?'

'না। আমি ভালো আছি। কয়েকটা আঁচড় শুধু লেগেছে।'

'কয়েকটা আঁচড়' যে কি পরিমাণ পোশাক খুলতেই দেখতে পেলো সবাই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনো জায়গা আর বাকি নেই, কালো কালো দাগে ভরা। থেঁতলে গেছে। ওসব জায়গায় শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিয়েছিলো দৈত্যটা। তবে জখম তেমন নেই, রক্ত বেরুচ্ছে না, হাতের ছুরির ক্ষতটা বাদে। কোনো কোনো জায়গা এখনও কাঁচা রয়েছে, ঘা পুরোপুরি শুকায়নি, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই এক ফোঁটা রক্ত। উঠে বসলো সে। কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়তেই আরেকটু সুস্থ হলো।

'ঝিনুক তোলার অভিযান তাহলে আমাদের শেষ?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ডজের দিকে তাকালো ওমর।

'কেন? এটা কোনো একটা ব্যাপার হলো নাকি? ডুবুরির জীবনে প্রায় প্রতিদিনই ওরকম ঘটনা ঘটে।'

হাঁ করে ডজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'তার মানে... তার মানে, আপনি আবার ওই জায়গাটায় নামবেন?'

'নিশ্চয়। আগের চেয়ে নিরাপদ ভাবলো এখন নিজেকে।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'এজন্যে, ওখানে আর ওরকম দানব নেই,' ডজ বললো। 'জানা কথা। এক রাজ্যে দুই রাজা বাস করতে পারে না। একটাই থাকে, আর সেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সাগরের আতঙ্ক ওই শয়তানগুলো, সাধে কি আর ডেভিল ফিশ বলে। অনেকেই ভয় পায় ওগুলোকে, এড়িয়ে চলে।'

'হাঙররা পাচ্ছে না,' কিশোর বললো।

'মরা বলে। জ্যান্ত হলে আসতো না।' হাসলো ডজ। এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে গেল, যেন শক্ত হয়ে গেছে পা। 'অকটোপাসটাকেও খুব একটা দোষ দিই না। গাধামীটা আমিই করেছি। কালো একটা গর্ত দেখতে পেলাম। মাছটাছ কিংবা অকটোপাসের বাচ্চা দেখলাম না তার মধ্যে। ওরকম গর্তে যা প্রায়ই

থাকে। ওগুলো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ দেখলেই বরং সরে যায়, বিশাল মাকড়সার মতো দেখতে লাগে। ভেতরে কিছু নেই দেখে অবাকই লাগলো। তবে গুরুত্ব দিলাম না। ভাবলাম, এরকম গর্তে অনেক ঝিনুক থাকবে। দেখতে গেলাম। কপাল ভালোই বলতে হবে আমার। কারণ প্রথম শুঁড়ের মাথাটা এসে আলতো করে ছুঁয়ে দেখলো আমার হেলমেট। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম ওটা কি। তারপর যা করার তা-ই করলাম। হাত দুটো তুলে ফেললাম ওপর দিকে, যাতে শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ধরে আটকে ফেলতে না পারে। ভাগ্যিস, তুলেছিলাম! আরেকটা শুঁড় এসে জড়িয়ে ধরলো আমার কোমর। তখন আমার হাত খোলা না থাকলে শেষ করে ফেলতো। লড়াই করার একটা সুযোগ অন্তত পেলাম। ছুরি বের করে ফেলেছি আগেই। খোঁচাতে শুরু করলাম। বোধহয় মিনিট বিশেক ওরকম লড়াই করেছি। তবে আমার মনে হয়েছে কয়েক যুগ। গর্তের ভেতর থেকে জ্বলজ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো জীবটা। চারটে শুঁড় ব্যবহার করেছে আমাকে কাবু করার জন্যে। বুঝলাম, বাকি চারটে দিয়ে পাথর আঁকড়ে ধরেছে, গ্যাট হয়ে বসে থাকার জন্যে। আসলে চারটে শুঁড়ই আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। বাকিগুলো আর খাটাতে যাবে কেন? আমাকে তোলার সংকেত দিয়ে তখন লাভ নেই। তুলতে পারবে না। হাত দিয়ে টেনে তো দূরের কথা, যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে টানলেও উঠতো কি না সন্দেহ। তাই জোর যাতে কমানো যায় সেই চেষ্টা চালালাম। চারটে শুঁড়ের গোটা দুই যদি কেটে দেয়া যায় তাহলে জোর কমবে। আমার বড় ভয় ছিলো, দড়ি আর এয়ার টিউবের লাইন না ছিঁড়ে ফেলে। তাহলে আর কেউ বাঁচাতে পারতো না আমাকে। দড়িটা টানটান হয়ে ছিলো বলেই পেঁচিয়ে যায়নি কোনো কিছুতে। অনেক চেষ্টা করে আমার গায়ে পেঁচানো দুটো শুঁড়ের মাথা কেটে দিলাম। আরও দুটো বের করে আনলো তখন ওটা। পেঁচিয়ে ধরলো। ভাবলাম, সংকেত দিই। তার পরে মনে হলো, না, ছিঁড়ে যেতে পারে। আরেকটু জোর কমানো যাক। কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছি ততোক্ষণে। আর সেটা বুঝতে পেরেছে জানোয়ারটা। টানতে শুরু করলো নিজের দিকে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন চোখজোড়া। শয়তানীতে ভরা। একবার ভাবলাম, যাই, গিয়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে গেলে দিই। কিন্তু ওই চেষ্টা করাটাই বোকামি। চোখের কাছে কিছুতেই পৌঁছতে দেবে না আমাকে। একটু পর পরই কালি ছুঁড়ে অন্ধকার করে দিচ্ছে পানি, যাতে ওর শরীর কিংবা শুঁড় দেখতে নাপারি আমি। প্রায় শেষ করে এনেছিলো আমাকে। পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠছিলো হাত। নড়ানোর শক্তিও পাচ্ছিলাম না আর। একটা হাত পেঁচিয়ে ফেললো শরীরের সঙ্গে। আরেকটাও আটকে ফেলবে যে কোনো সময়। দড়ি না টেনে আর উপায় নেই। আমাকে টেনে তার মুখের দুই গজের মধ্যে নিয়ে গেছে। টান দিলাম। পর পর চার বার। তার পর আর কিছু মনে নেই।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা দোলালো মুসা। 'অকটোপাসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইটা যে কেমন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। আপনাকে তো সাহায্য করার জন্যে অনেকেই ছিলাম আমরা, আমাকে করার কেউ ছিলো না। কেউ জানতোই না যে আমাকে অকটোপাসে ধরেছে।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধির জোরেই বেঁচে এসেছিলে সেদিন,' কিশোর বললো। 'আর কপাল অসম্ভব ভালো ছিলো বলে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। 'যা-ই বলো,' ডজকে বললো সে। 'আর তোমাকে ওখানে নামতে দিতে রাজি নই আমি। আমার ভালো মনে হচ্ছে না।'

'অহেতুক ভয় পাচ্ছো। একদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু হবে না আমার। আর,' হাসলো সে। 'লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে চাইলে ওরকম একআধটু ঝুঁকি নিতেই হবে। টাকা জিনিসটা তো আর সহজে পাওয়া যায় না।'

'দেখা যাক,' ওমর বললো। 'ভাবনাচিন্তা করি। ঝিনুক যা তুলে এনেছো সেগুলো কি করবো?'

'সৈকতে ফেলে রাখতে হবে। পশ্চিম দিকে। ওপরে, যাতে জোয়ারের পানি নাগাল না পায়। দিন দুয়েকের মধ্যে পচে যাবে। দেখতে পারবো, অকটোপাসের সঙ্গে লড়াই করে কি আনতে পেরেছি।' হাসলো ডজ। 'ঝিনুক খোলাটা একটা মহা উত্তেজনার কাজ, দারুণ খেলা। বোঝার উপায় নেই, কোনটা খুললে বেরিয়ে পড়বে অনেক টাকার সম্পদ।'

'হুঁ। আপাতত পেটপূজাটা সেরে নেয়া যাক। খিদে পেয়েছে। খেয়েদেয়ে তুমি রেস্ট নাও। আমরা ঝিনুকগুলো সরিয়ে ফেলবো।'

সাত

যতোটা ভাবা গিয়েছিলো, তার চেয়ে বেশি কাহিল হয়ে পড়লো ডজ। দুই দিন লাগলো তার শক্ত হতে। থেঁতলানো জায়গাগুলোতে ব্যথা। তার অবস্থা দেখে সবাই তো ভয়ই পেয়ে গেল। ওদের মনে হতে লাগলো, ঝিনুক তোলার কাজটাই বাতিল করে দিতে হবে। সেকথা বলাও হলো ডজকে।

ডজ মানতে নারাজ। তার এক কথা, এক জায়গায় বড় অকটোপাস একটাই থাকে। সেটা যখন মারা পড়েছে, নিরাপদেই এখন ডুব দেয়া যায়। তার কথা শুনতে প্রায় বাধ্য করলো সে অন্যদেরকে।

কাজেই তৃতীয় দিনে আবার চললো ফ্লাইং বোট, মুক্তো খেতের উদ্দেশে।

বেশ কয়েকবার ডুব দিলো ডজ। দুপুরের দিকে বেজায় কাহিল হয়ে পড়লো সে। সেদিনের মতো ঝিনুক তোলা স্থগিত রেখে দ্বীপে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলো ওমর।

ডজ জানালো, ঢালের অগভীর অংশটায় ঝিনুক আর বেশি নেই, তোলা হয়ে গেছে। এরপর তুলতে হলে আরও নিচের দিকে নামতে হবে। আরও বেশি পানিতে। তবে অতো নিচে নামার ক্ষমতা তার নেই। স্বীকার করলো একথা। অবশ্য আর ঝিনুক তোলার দরকারও নেই। যা তুলেছে, তাতে যদি মুক্তো পাওয়া যায়, যথেষ্ট হবে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে বড় জাহাজ ভাড়া করতে পারবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনে, অভিজ্ঞ জাপানী ডুবুরি ভাড়া করে আরও গভীর থেকে ঝিনুক তোলার জন্য নিয়ে আসতে পারবে। এই এলাকার মুক্তো সব সাফ করে নিয়ে বিদেয় হবে তখন, তার আগে নয়।

দ্বীপে ফিরে চললো বিমান। কি ভাবছিলো ডজ, হঠাৎ মুখ তুলে হাসলো। 'এই

শোনো, বিকেলটা শুধু শুধু বসে না থেকে ঝিনুকগুলো কিন্তু খুলে ফেলতে পারি। নিশ্চয় এতোদিনে পচন ধরেছে ঝিনুকগুলোতে। দুর্গন্ধ এখন ততোটা হবে না।'

কথাটা ঠিক। হুল্লোড় করে উঠলো সবাই।

ওমর বললো, 'ভালো কথা বলেছো।'

লাঞ্চ সেরে আর একটা মুহূর্ত দেরি করলো না ওরা। সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে ঝিনুকের ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। চলে এলো দ্বীপের পশ্চিম ধারে, যেখানে পচার জন্যে ফেলে রাখা হয়েছে ঝিনুক।

এসেই নাকমুখ কুঁচকে ফেললো ওমর, কিশোর আর মুসা। ওদের অবস্থা দেখে হেসে ফেললো ডজ আর দুই পলিনেশিয়ান। মরা ঝিনুকগুলোর দিকে এগোতে এগোতে ডজ বললো, 'এখনই এই, আরও পচলে কি করতে? তা-ও তো বাতাস বইছে উল্টো দিকে, সরাসরি নাকে এসে লাগে না। নইলে দুর্গন্ধ কাকে বলে বুঝতে।' হাসলো সে। তার পরেই কি মনে পড়ায় হাসি মুছে গেল। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালো সাগরের দিকে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো ওমর।

'একটা কথা,' তার দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা ঝাঁকালো ডজ। 'এতোগুলো ঝিনুক একবারে পচতে দেয়া ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। ভয়াবহ গন্ধ, কল্পনা করতে পারবে না। সাগরের বিশ মাইল দূর থেকে পাওয়া যাবে। আর এই গন্ধ একবার যার নাকে লেগেছে, জীবনে ভুলবে না সে।'

'তুমি বলতে চাইছো কারনেসও পেয়ে যাবে?'

মাথা ঝাঁকালো ডজ। 'হ্যাঁ। তারপর গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে এসে হাজির হওয়াটা কিছুই না তার জন্যে।'

'তা বোধহয় ঠিকই বলেছো।'

'অবশ্যই ঠিক বলেছি। তবে আর কিছু করার নেই এখন। ভবিষ্যতে আর এরকম ভুল করবো না। অল্প অল্প করে তুলে এনে পচাবো। মুক্তো বের করে নিয়ে হয় খোলাগুলো পুঁতে ফেলবো, নয়তো পানিতে ফেলে দেবো।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। যদি আর এভাবে তোলার দরকার পড়ে আমাদের। জাহাজ নিয়ে এলে তো অন্য রকম ব্যবস্থা হবে।'

হাতে করে একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা বিস্কুটের টিন নিয়ে এসেছে ডজ। বালতিতে পানি ভরে নিয়ে চলে এলো ঝিনুকগুলোর কাছে। গভীর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে অন্যেরা, বিশেষ করে কিশোর, ওমর আর মুসা।

একটা ঝিনুক তুলে বালতির ওপরে এনে ডালার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো ডজ। শক্ত কিছু লাগে কিনা দেখলো। তারপর ঝিনুকের ভেতরের নরম অংশটা বের করে ফেললো পানিতে। ডালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝুড়িতে রাখলো সাগরের হাসি।

একে একে চল্লিশটা ঝিনুক খুললো ডজ। যতোই খুলছে, হতাশা বাড়ছে। খোলাগুলো ছুঁড়ে ফেলছে। একটা মুক্তোও বেরোয়নি এতোক্ষণে। তবে একচল্লিশ নম্বর ঝিনুকটা খুলে ভেতরে আঙুল ঢুকিয়েই চিৎকার করে উঠলো। বের করে

আনলো ছোট নুড়ির সমান শাদা একটা জিনিস। তুলে দেখালো। রোদ লেগে ঝিক করে উঠলো যেন ওটার ভেতরের সুপ্ত আগুন।

মুক্তোটাকে চুমো খেলো সে। বললো, 'আমাদের সৌভাগ্য নাম্বার ওয়ান। এই শুরু হলো।'

হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগলো মুক্তোটা।

'দাম কতো হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। হাতের তালুতে রেখে মুক্তোটা দেখছে।

'পাঁচ হাজারের কম বললে ঘুসি মারবো পাইকারের নাকে,' হেসে জবাব দিলো ডজ।

'যে হারে চলছে,' ওমর বললো। 'তাতে এক বাটি ভরতেই অনেক সময় লাগবে। ঝুড়ি ভরতে অনেক দিন।'

'তবে ভরে ফেলবো,' জোর দিয়ে বললো ডজ। 'অতো তাড়াহুড়ো করলে চলে না। মুক্তো বের করতে হলে ধৈর্য রাখতে হয়। একচল্লিশটা খুলে যে একটা পেয়েছি, এটা অনেক বেশিই মনে হয়েছে আমার কাছে। অনেক সময় কয়েক হাজার ঝিনুক খুলেও একটা মেলে না। আবার তার পর হয়তো পর পর ছয়-সাতটা খোলা হলো, দেখা যাবে সবগুলোতেই মুক্তো রয়েছে। এটা এক ধরনের জুয়াখেলা বলতে পারো।' মরা ঝিনুকগুলোর ওপর হাত বোলালো সে। 'এগুলো হাজারে হাজারে খুলতে হবে বলে মনে হয় না। তবে হলে খুব হতাশ হবো।'

তার কথার সমর্থনেই যেন পরের ঝিনুকটাতেই পাওয়া গেল একেবারে পাঁচটা মুক্তো। তবে বেশি বড় নয়, ভালোও নয়। কমদামী জিনিস। যা-ই হোক, পাওয়া তো গেল। আশা বাড়লো ওদের। দ্রুত হাত চালালো ডজ। তার কাজ দেখেই বোঝা যায়, এই কাজে অভ্যস্ত সে।

কলরব করে উঠলো সবাই যখন অনেক বড় একটা মুক্তো বের করলো ডজ। দেখতে অনেকটা পানের মতো। 'রেফারেন্স বইতে লিখে রাখার মতো জিনিস এটা। কোনো একদিন হয়তো এটা শোভা পাবে কোনো রাজার মুকুটে, কিংবা রাজকুমারীর টায়রায়। আর পত্রিকায় যখন সেই ছবি দেখবে, কি একটা ধাক্কা খাবে, ভাবো? মনে করবে না, এটা তুমিই তুলেছিলে সাগরের তল থেকে! পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার ডলারে বিকোবে এটা।' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বললো সে।

'খুব সুন্দর,' কিশোর বললো।

'তবে এতো সুন্দর আর লাগবে না,' তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো ডজ। 'এখন যেমন লাগছে।'

কাজ চলতে লাগলো। বিস্কুটের টিনে জমা হচ্ছে একের পর এক মুক্তো। একপাশে বড় হচ্ছে ফেলে দেয়া খোলার স্তূপ। শেষ ঝিনুকটাও খুলে ছুঁড়ে ফেলা হলো। কতগুলো মুক্তো পাওয়া গেল গুনতে লাগলো ডজ। পাঁচটা বড় বড় মুক্তো, অনেক দাম হবে সেগুলোর। উনিশটা পাওয়া গেছে মাঝারী আকারের। একটা ডাবল বাটন—দুটো মুক্তো জোড়া লেগে থাকলে ওগুলোকে বলে ডাবল বাটন। আর দুই মুঠো সীড পার্ল—ছোট মুক্তো, কম দামী।

'যাক, ভালোই পাওয়া গেল,' ডজ বললো। 'অন্তত আফসোস করতে হবে না আর কিছু পেলাম না বলে। সব মিলিয়ে লাখ খানেকের বেশি চলে আসবে।'

'মুক্তো-টুক্তো তো ভালোই চেনেন, আইডিয়া আছে,' মুসা বললো। 'কালচারড পার্লের কথা কিছু বলতে পারবেন? ওগুলোর নাম বেশ শোনা যায়। জাপানীরা নাকি ছোট ছোট খামার করে ওই মুক্তোর চাষ করে। খোলা ঝিনুকের পেটের ভেতরে হঠাৎ করে বালির কণা ফেলে দেয়, যাতে রস ছাড়তে পারে ঝিনুক। মুক্তো তৈরি হয়ে যায় ওই কণার চারপাশে রস জমে শক্ত হয়ে।'

'ওগুলো মুক্তো হলো নাকি?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো ডজ। 'আসল মুক্তোর সঙ্গে ওসবের কোনো তুলনাই হয় না। আর কিছুদিন পর ওগুলো স্টেশনারি দোকানেই কিনতে পাবে। গয়নায় লাগিয়ে ফেরিওয়ালারা বিক্রি করলেও অবাক হবো না।'

'এতোই শস্তা?'

'এতোই শস্তা।'

'কেন? ঝিনুকের পেট থেকেই তো আসে।'

'এলে কি হবে? রাসায়নিক কোনো গোলমাল রয়েছে হয়তো। ঝিনুকের পেট থেকে বের করার সময় চকচকেই থাকে, আসল মুক্তোর মতো। তারপর দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাড়াহুড়োয় তৈরি অনেক জিনিসের মতোই। আসল মুক্তোর মতো আভা থাকে না ওর ভেতরে। আর খোসা ছাড়ানো যায়।'

'খোসা! মুক্তোর?' অবাক হয়েছে মুসা।

'হ্যাঁ, খোসা। পেঁয়াজের খোসার মতো। একটার ওপরে আরেকটা জড়িয়ে থাকে।' কথা বলছে, আর বালতির পানিতে হাতড়াচ্ছে ডজ, মুক্তো রয়েটয়ে গেল কিনা দেখছে।

'ভুলেই গিয়েছিলাম,' আচমকা বলে উঠলো কিশোর। 'আরেকটা আছে।'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। ওমর জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

'সেই প্রথম মুক্তোটা, সাগরের হাসি যেটা তুলে এনেছিলো। রেখে দিয়েছিলাম। একটা গাছের গোড়ায়। যাই, নিয়ে আসি।' দৌড়ে গিয়ে আধখোলা একটা ঝিনুক নিয়ে ফিরে এলো কিশোর। 'চেহারা দেখে তো মনে হয় না এর ভেতরে কিছু আছে।' ঝিনুকটা ছোট। দেখতে বিশ্রীই বলা চলে। খোলার নানা জায়গায় দাগ, নিশ্চয় কোনো রোগ হয়েছিলো। শ্যাওলা লেগে রয়েছে এখনও, শুকিয়ে গেছে। অনেক বয়েস। বালিতে বসে পচা মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো সে। শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। মুখ তুলে তাকালো সবার দিকে।

হাসলো ডজ। 'প্রথম মুক্তোটা পেলে ওরকমই হয়।'

'এটা আমার প্রথম নয়,' কাঁপা গলায় বললো কিশোর। 'বড় বলেই!' দুই আঙুলে ধরে মার্বেলের মতো বড় একটা মুক্তো বের করে আনলো সে। শাদা নয় ওটা, গোলাপী। এই জিনিস আগেও দেখেছে সে। একটা নয়, অনেকগুলো, আস্ত একটা হার। তবে সেগুলোর কোনোটাই এটার মতো বড় ছিলো না। এতো জীবন্তও নয়। হ্যাঁ, ভেতরের আগুন এমনভাবে ঝলকাচ্ছে, তার কাছে জ্যান্তই লাগছে জিনিসটা।

চুপ হয়ে গেছে সবাই। ডজ যতগুলো পেয়েছে, তার কোনোটাই এটার মতো নয়। অবশেষে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো সে, 'গোলাপী মুক্তো! নামই শুনেছি শুধু এতোদিন দেখিনি। প্যারিসে নিয়ে গেলে ঈশ্বরই জানে কতো পাওয়া যাবে!'

খোসাটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে কিছু বলতে যাবে কিশোর, এই সময় আবার চোখ পড়লো ওটার ওপর। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। অন্যেরাও তাকালো। দেখলো ডালার ফাঁকে গোলাপী একটা জিনিস চকচক করছে। সবাই চুপ। কোনো শব্দ নেই। নীরবে গিয়ে দ্রুত ঝিনুকটা আবার কুড়িয়ে নিলো কিশোর, বের করে আনলো আরেকটা গোলাপী মুক্তো। বাঁ হাতের তালুতে দুটো মুক্তোই রেখে সবাইকে দেখালো।

কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন ডজ। যখন বললো, গলা কাঁপতে লাগলো তার, 'কি সুন্দর!' ব্যাঙ ঢুকেছে যেন তার গলায়, ঘড়ঘড় স্বর বেরোচ্ছে। 'দেখ, দেখ সবাই ভালো করে! কারণ আর কোনোদিন এমন দৃশ্য দেখতে পাবে না। লক্ষ লক্ষ বছর বাঁচলেও না। বহু বছর ধরে এদিকের সাগরে মুক্তো খুঁজে বেরিয়েছি আমি। আমারই মতো অনেকেই খুঁজে বেড়িয়েছে, এখনও খুঁজছে। ওদের কেউ কেউ জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছর এর পেছনে খরচ করে দিয়েছে। তা-ও এরকম কেউ দেখেনি, অন্তত আমার জানা মতে নেই কেউ। ওরকম একটা মুক্তোই ঝিনুক থেকে বের করে দেখার ভাগ্য খুব কম মানুষের হয়, একসঙ্গে দুটোর কথা তো ভাবাই যায় না! আমার যে কেমন লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না!'

'ভালোই হয়েছে,' কিশোর বললো। 'এখন একটা করে রাখতে পারবো আমরা।'

'মানে?'

'একটা আমাদের, আর একটা সাগরের হাসির। ঝিনুকটা সে-ই তুলেছে। একটা তার পাওয়া উচিত।'

'পাগল হয়েছো!' গলা চেপে দম আটকে দেয়া হয়েছে যেন ডজের। 'ওরকম একটা জোড়া ভাঙবে? অসম্ভব! রীতিমতো অপরাধ হয়ে যাবে সেটা। একই সঙ্গে জন্মেছে মুক্তোদুটো, একই সঙ্গে থাকা উচিত। তুমি বুঝতে পারছো না দুটো একসাথে থাকার কি মানে। ওর একটা মুক্তোর দামই হবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার পাউণ্ড। আর দুটো একসাথে থাকলে যা দাম হাঁকবে তাতেই বিক্রি হয়ে যাবে। রাজা তার রাজত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যাবে ওদুটো পাওয়ার জন্যে!'

'হ্যাঁ, ওগুলোর একসাথেই থাকা উচিত,' ডজের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো ওমর।

'ঠিক আছে,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'তাহলে দুটোই সাগরের হাসিকে দিয়ে দিই। একসাথেই থাকুক।'

'আরে না না, পাগল নাকি…' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল ডজ। বোধহয় ছোট হতে চাইলো না।

ঠোঁট ওল্টালো সাগরের হাসি। সহজ কণ্ঠে বললো, 'আমার ওসব দরকার নেই। কি করবো? তার চেয়ে পিং মিনের দোকান থেকে কিছু লাল পুঁতি যদি কিনে দাও, এদুটো তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি।'

'নিশ্চয় দেবো!' তাড়াতাড়ি বললো ডজ। 'যতো চাও ততো দেবো!'

'দেবে!' খুব খুশি সাগরের হাসি। চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'যতো চাই, দেবে!'

'দেবো।'

'পাগল নাকি!' বিড়বিড় করলো মুসা। 'কয়েকটা পুঁতি কিনে দিলেই ওরকম দুটো মুক্তো...'

মুসার দিকে তাকালো সাগরের হাসি। 'ওগুলো দিয়ে কি করবো আমি? পুঁতি পেলে হার বানিয়ে গলায় পরতে পারবো। ওগুলো ফুটোও করা যাবে না, মালাও গাঁথা যাবে না।'

এরকম যুক্তির পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল মুসা।

ডজ বললো, 'এতো পুঁতি কিনে দেবো, যতো খুশি মালা বানাতে পারবে। রাটুনায় পিং মিনের দোকানে নিয়ে যাবো। তোমার ইচ্ছে মতো কিনে নিও। পাউডার, স্নো, লিপস্টিক, যা খুশি।'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে ঠকানো হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পেরে হেসে ডজ বললো, 'তুমি ভাবছো ঠকাচ্ছি। তা ঠকাচ্ছি বটে। তবে দিতে তো চাইলে, নিলো না তো। এর চেয়ে অনেক বেশি খুশি হবে ও পুঁতি পেলে। মুক্তোগুলো জোর করে দিলে হয়তো নেবে, কিন্তু একটু পরেই ফেলে দেবে। ওর কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই। তার চেয়ে ও যা পছন্দ করে সেটা দিলেই কি ভালো হয় না? মুক্তোগুলোও থাকবে।'

আর কিছু বললো না কিশোর।

উঠে দাঁড়ালো ডজ। 'হাতটাত ধুয়ে গিয়ে চা খাওয়া দরকার। বাপরে বাপ, কি পচা গন্ধ! একেবারে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে!' বিস্কুটের টিনটা তুলে নিয়ে বললো, 'এগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। প্লেনে রাখা ঠিক হবে না এখন, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। একবারে যাওয়ার সময় তুলে নিলেই হবে।'

লেগুনের ধারে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। নারকেল গাছের গোড়ায় বালির ওপরে পড়ে রয়েছে বিশাল একটা প্রবালের চাঙড়। কি করে এলো কে জানে। হয়তো ঝড়ে নিয়ে এসে ফেলেছে। যেভাবেই আসুক, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ডজের। টিনটা লুকানোর ভালো একটা জায়গা পেয়েই খুশি সে। চাঙড়ের তলায় বালিতে পুঁতে রাখলো টিনটা।

চা খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে নারকেল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে আয়েস করে টানতে শুরু করলো ওমর। পাইপ ধরালো ডজ। 'ভালোই পেয়েছি, কি বল,' বললো সে। 'বাকি ঝিনুকগুলো পচলে বের করে নিয়ে রওনা হতে পারি। যদি আবহাওয়া গণ্ডগোল না করে।'

'আর যদি রেশনে টান না পড়ে,' বললো ওমর। 'আরও তিনদিনের খাবার হবে বলে মনে হয় না। ছয়টা মুখ, কম তো নয়।'

'মাছ ধরতে পারি। পানিতে তো অভাব নেই। খাবারের অসুবিধে হবে না। তিনটে মাস কাটিয়ে দিয়েছি এখানে, কোনো সরঞ্জাম ছাড়া। এখন তো বড়শি সুতো সবই রয়েছে। কোন্ কোন্ মাছ খেতে ভালো, সাগরের হাসি আর ঝিনুক জানে।' ওদের দিকে ফিরলো ডজ। 'এই, কিছু মাছ ধরে আনো না। খাওয়ার

জন্যে।'

কথাটা মনে ধরলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো দু'জনে।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুসা বললা, 'চলো, আমরাও যাই।'

'চলো।'

পানির ধার ঘেঁষে শাদা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চললো চারজনে। মাছ ধরার জন্যে জায়গা বাছাই করতে শুরু করলো সাগরের হাসি। কয়েকটা জায়গায় থেমে দেখলো। শেষে ছোট একটা গুহার সামনে এসে থামলো সে। খাড়া নেমে গেছে প্রবালের দেয়াল। আয়নার মতো শান্ত নিথর হয়ে আছে পানির ওপরটা। স্বচ্ছ। নিচে অলস ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে নানারকম মাছ, দেখা যাচ্ছে। ছোট একটা খাঁড়ি। বিশ ফুট গভীর হবে। দেয়ালের গা থেকে নেমে গেছে সিঁড়ির মতো ধাপ। একধারে জন্মে রয়েছে কয়েকটা নারকেল গাছ, দেখে মনে হয় একটাই গোড়া, সেটা থেকে বেরিয়েছে কাণ্ডগুলো, বাঁশের মতো। মাথা নুইয়ে রেখেছে পানির ওপর। পানিতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়েছে ওগুলোর। মনে হয় যেন পানির নিচে গজিয়েছে মাথা উল্টো করে।

দেয়ালের গা কামড়ে রয়েছে অসংখ্য শামুক। কয়েকটা তুলে আনলো সাগরের হাসি। খোলা ভেঙে ভেতরের মাংস বের করে বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেললো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে টোপ গিললো মাছ।

একের পর এক মাছ তুলে বালিতে ফেলতে লাগলো সে। এতো দ্রুত, বিশ্বাসই হতে চাইছে না দুই গোয়েন্দার। মেয়েটার হাত থেকে ছিপটা নিলো কিশোর। বড়শিতে টোপ গেঁথে দিলো সাগরের হাসি। সে ছিপ ফেললো। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনটে মাছ ধরে ফেললো।

যেগুলো খেতে ভালো, বেছে বেছে সেগুলোকে আলাদা করলো ঝিনুক। কিশোর বললো, 'হয়েছে। রাতে হয়ে যাবে। আর দরকার নেই।'

এতো তাড়াতাড়ি মাছ ধরা শেষ হয়ে যাওয়ায় নিরাশই হলো মুসা। কাজকর্ম না থাকলে ভালো লাগে না। অহেতুক কতো আর বসে থাকা যায়?

'আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।' ছিপ সরিয়ে রেখে ভোঁদড়ের মতো স্বচ্ছন্দে পানিতে নেমে গেল সাগরের হাসি। মিনিটখানেক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মুসা। পানির নিচে এমন সহজ ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে মেয়েটা, দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। ডাঙার মানুষ নয় যেন, জলকুমারী। সাঁতার কাটার ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখতে পারলো না মুসা। উঠে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলতে শুরু করলো। সেদিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর, 'আর পারলে না? তোমারও এখানেই জন্মানো উচিত ছিলো। হাহ্ হাহ্।'

গাছের নিচে শুকনো নারকেল পড়ে আছে। কুড়াতে কুড়াতে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো একবার, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলো।

জুতো খুলে রেখে পানির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো মুসা। সাগরের হাসিকে দেখার জন্যে নিচে তাকালো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একেবারে তল পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েটা নেই। কোথায় গেল? অস্বস্তি বাড়তে লাগলো। হাত নেড়ে ডাকলো

ঝিনুককে। 'এই ঝিনুক, দেখে যাও।'

'কি হয়েছে?' তাড়াতাড়ি উঠে এসে মুসার পাশে দাঁড়ালো কিশোর।

ঝিনুকও এলো। পানির নিচে চোখ বোলালো একবার। অবাক হয়েছে, চেহারাই বলে দিচ্ছে তার। খোলা লেগুনের দিকে খুঁজলো একবার। নেই দেখে আবার দৃষ্টি ফেরালো গুহাটার দিকে। অস্বস্তি ফুটেছে চোখে। সেটা দেখে ভয়ই পেয়ে গেল কিশোর আর মুসা। ওরকম গুহা মানেই এখন ওদের জন্যে আতঙ্কের জায়গা। অকটোপাস কিংবা অন্য কোনো জলদানবের বাড়ি।

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝিনুক। ঢেউ উঠলো। সেটা না কমা পর্যন্ত নিচের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পারলো না কিশোর আর মুসা।

ঝিনুকও গায়েব। তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না কোথাও। এক মিনিট গেল...দুই মিনিট। পরস্পরের দিকে তাকালো দুই গোয়েন্দা। দু'জনে একই কথা ভাবছে। এমনকি পলিনেশিয়ানরাও পানির নিচে এতোক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতে পারে না। কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলো দু'জনেই। দেয়ালের ধার ধরে কিছুদূর দৌড়ে গেল মুসা। ঝিনুক কিংবা সাগরের হাসি আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলো। কিছুই নেই। সাগরের তলটা এখানে বেশ অন্ধকার, পানি বেশি গভীর হলে যেরকম হয়।

সাগরের হাসি যে গায়েব হয়েছে, পাঁচ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনো মানুষের সাধ্য নেই, পানির নিচে ডুব দিয়ে এতোক্ষণ দম আটকে রাখে। 'নিশ্চয় অকটোপাসে ধরেছে!' বিড়বিড় করলো মুসা।

ওমর আর ডজকে ডাকার জন্যে বলতে যাবে কিশোরকে, এই সময় যেন জাদুর বলে ভুস করে একটা মাথা ভেসে উঠলো। সাগরের হাসি! ফুচ্‌চ্‌ করে মুখ থেকে পানি বের করে দিয়ে খিলখিল করে হাসলো।

'কোথায় গিয়েছিলে?' মুসার প্রশ্ন। 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

জবাবে আরেকবার খিলখিল হাসি। আবার বললো, 'সাঁতার কাটতে।' পানিতে মুখ ডুবিয়ে ফুঁ দিয়ে ভুরভুর করে বুদবুদ তুলতে লাগলো।

'তুমি মানুষ না! মাছ!'

ঝিনুকও ভেসে উঠলো। দু'জনে মিলে সাঁতরে চললো লেগুনের মাঝখানে। কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসতে শুরু করলো। মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। নীরবে ওদের সাঁতার কাটা দেখছে।

মুসার দিকে হাত নেড়ে ডাকলো সাগরের হাসি, 'এসো।'

পানিতে নামার কথা ভুলেই গিয়েছিলো মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। সাঁতরে চলে এলো মেয়েটার কাছে।

'এসো আমার সঙ্গে,' মেয়েটা বললো।

'এসো, দেখাচ্ছি।' বললো ঝিনুক।

'কি দেখাবে?'

'সাগরের তল। খুব সুন্দর।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি। আর কি দেখবো?'

'এসোই না।'

কাছে এলো ঝিনুক। 'হ্যাঁ, এসো। জোরে দম নাও। ভয় লাগছে না তো?'

'না।'

'এসো তাহলে।'

লম্বা শ্বাস টেনে ডুব দিলো মুসা। নামতে লাগলো নিচের দিকে। তার দু'পাশে রয়েছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক। কিছুদূর নেমে, গুহাটার দিকে ইঙ্গিত করলো মেয়েটা। তিনজনেই সাঁতরাতে শুরু করলো ওটার দিকে। পানির বিশ ফুট নিচে রয়েছে এখন। আরও কাছে আসার পর মুসা বুঝলো, পানির ওপর থেকে প্রথমে যে গুহা দেখেছিলো, এটা সেটা নয়। আরেকটা।

সাগরের হাসি আর ঝিনুকের সঙ্গে ঢুকে পড়লো ভেতরে। ভয় ভয় লাগছে। অকটোপাস নেই তো? না বোধহয়। তাহলে ওদের দু'জনকে আগে ধরতো। ওরা যে হারিয়ে গিয়েছিলো তখন, নিশ্চয় এই গুহাতেই ঢুকেছিলো। বাতাসও আছে। নইলে কিছুতেই পাঁচ মিনিটের বেশি সময় এখানে শ্বাস নিতে পারতো না সাগরের হাসি।

ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা। ওপরে ভেসে উঠলো সে, ওদের দেখাদেখি। পানির নিচের বেশ বড় একটা গুহায় ঢুকেছে ওরা। একধারে তাকের মতো দেখা গেল। তার ওপর উঠে পা দুলিয়ে বসলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। সাঁতরে এসে মুসাও উঠে বসলো।

গুহার সৌন্দর্য দেখে থ হয়ে গেল সে। পানির বেশি ওপরে নয় ছাতটা। জোয়ারের সময় ভরে যায় কিনা কে জানে। তবে সেটা নিয়ে আপাতত ভাবছে না মুসা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এক অপরূপ পরীর রাজ্য! ঘন নীল পানি। আলো আসছে কোথা থেকে বুঝতে পারছে না। নানা রঙের প্রবালের ছড়াছড়ি চারপাশে। রঙিন মাছের ঝাঁক।

অনেকক্ষণ দেখার পর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললা মুসা। বললো, 'চলো, যাই। বেশি দেরি করলে ওরা আবার ভাববে।'

বাইরে বেরিয়ে পানিতে মাথা তুলে দেখলো; নিচের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। উদ্বিগ্ন। মুসাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'গুহার ভেতরে। দারুণ জায়গা। যাবে নাকি?'

মাথা নাড়লো কিশোর। নাহ্, আরেক দিন।'

মাছ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা।

ঝিনুক মরে পচন শুরু হতে অন্তত দুটো দিন সময় লাগবে। অযথা বসে না থেকে এই দু'দিন মুক্তোর খেত থেকে ঝিনুক তুলে আনতে পারলেই লাভ, যা পাওয়া যায়। সেই আশাতেই যেতে লাগলো অভিযাত্রীরা। আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়িই, সতর্ক সংকেত জানালো ঝিনুক। এগিয়ে আসছে ঝড়।

জায়গাটাতে অকটোপাসের ভয় আপাতত নেই, ডজের সঙ্গে এব্যাপারে একমত হলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক দু'জনেই। ডজের সঙ্গে সঙ্গে ওই দু'জনও নামতে লাগলো। ডুবুরির গোশাকের দরকার হয় না ওদের। বড় করে দম নিয়ে ডুব দেয়, খানিক পরে ভেসে ওঠে দুই হাতে করে ঝিনুক নিয়ে। দেখে মুসারও

নামার লোভ হলো। গভীর পানিতে কি করে ডুব দিতে হয়, জানা আছে তার, অভিজ্ঞতাও আছে। তবু বার বার করে তাকে শিখিয়ে দিলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। ওদের পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। এতে সুবিধেই হলো মুসার।

ঝিনুক তোলার চেয়ে পানিতে নেমে খেলা করার দিকেই আগ্রহ বেশি সাগরের হাসি আর ঝিনুকের। মুসাও ওদের সঙ্গে যোগ দিলো।

দ্বিতীয় দিনের কথা। পানিতে নেমে ওরকম খেলা করছে তিনজনে। সাঁতরে দু'জনের কাছ থেকে কিছুটা দূরে এসেছে মুসা। হঠাৎই দেখতে পেলো ওটাকে। শরীর বাঁকিয়ে ঘুরছে বিশাল এক হাঙর।

নাক নিচু করে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ওটা। লম্বায় বিশ ফুটের কম হবে না। পেটটা শাদা, বাকি শরীরও শাদাই, তবে কিছুটা ময়লা। ধড়াস করে এক লাফ মারলো মুসার হৃৎপিণ্ড। সঙ্গে ছুরিও নেই যে, বাধা দেবে। জানে যদিও, এতো বড় দানবের বিরুদ্ধে সামান্য ছুরি দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ওপরে উঠে যে পার পাবে তারও উপায় নেই। হাঙরটা নেমে আসছে ওপর দিক থেকেই। ফুসফুসের বাতাসও ফুরিয়ে এসেছে। এখন রওনা হলেও ওপরে উঠতে উঠতে শেষ হয়ে যাবে বাতাস। কি করবে?

দানবটা যদি তাকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে কোনোমতেই রক্ষা নেই। ফুসফুসে বাতাস থাকলেও না, না থাকলেও না। তবু হাত-পা গুটিয়ে না রেখে বাঁচার চেষ্টা তো অন্তত করে দেখতে হবে।

ওপরে উঠতে শুরু করলো মুসা। বোধহয় এতোক্ষণ তাকে নজরে পড়েনি হাঙরটার, কিংবা দ্বিধায় ছিলো, কোন্ ধরনের জীব, আক্রমণ করবে কিনা, এসব। এখন মনে হলো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কারণ, আবার মুসার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে ওটা। দ্রুত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

আট

এই সময় মুসা দেখলো ঝিনুক আর সাগরের হাসি নেমে আসছে। পানি এতই পরিষ্কার, মনে হচ্ছে পানিতে নয় ডাঙাতে রয়েছে ওরা। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হাঙরটার দিকে সাঁতরে যাচ্ছে ঝিনুক। এখনও উঠছে মুসা, শেষ হয়ে আসছে শক্তি। যেন দুঃস্বপ্নের মাঝে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে দৃশ্যটা। ধীরে ধীরে ঘুরছে বিশাল দানবটা, তাকে ধরার জন্যে আসছে। ওটার মাথার কাছ দিয়ে চলে গেল ঝিনুক। পলকের জন্যে মুসা দেখলো, তার হাতটা উঠল নামলো একবার দ্রুত, সাপের মত ছোবল মারলো যেন ছুরি। হাঙরের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। আবার আঘাত হানলো ঝিনুক। পাক খেয়ে ঘুরে গেল হাঙর। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বেরিয়ে পড়েছে মারাত্মক দাঁতের সারি। কাছাকাছি রয়েছে সাগরের হাসি, তাকে কামড়াতে গেল ওটা। ওপর দিকে ছুরি চালিয়ে হাঙরের পেট ফেঁড়ে দিলো মেয়েটা।

হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করেছে মুসা। পানিতে লাথি মেরে ভেসে উঠতে চাইছে ওপরে। পানি আর আগের মত পরিষ্কার নয়, রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে

গেল চোখের সামনে থেকে হাঙর। ঘোলাটে লাল পানির ভেতরে এখন কি ঘটছে, আর দেখা গেল না। একটাই ভাবনা, যে করেই হোক, ভেসে উঠতে হবে। মনে হচ্ছে এই বুঝি পায়ে কামড় বসালো হাঙরটা। ফুসফুসের বাতাস শেষ। যখন ভাবলো, আর উঠতেই পারবে না, এই সময় পানির ওপরে ভেসে উঠলো মাথা। হাত বাড়িয়েই রেখেছে ডজ আর কিশোর। একটানে তাকে তুলে নিলো ওপরে।

কয়েক সেকেণ্ড কেবিনের মেঝেতে চিত হয়ে রইলো মুসা। জোরে জোরে দম নিচ্ছে। অবশেষে কোনমতে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা উঠেছে?'

'না,' জবাব দিলো ডজ।

'কিন্তু...নিচে...একটা হাঙর...'

'জানি। দেখেছি। ওটাকে মারতেই গেছে দু'জনে।'

'ওদেরকেই মেরে ফেলবে তো!'

'তা পারবে না। এরকম লড়াই অনেক করেছে ওরা। মারকুইজানদের সঙ্গে পারে না হাঙর। পেছন থেকে না জানিয়ে হঠাৎ এসে যদি ধরে ফেলতে পারে, তো পারে, নইলে সম্ভব না। হাঙর শিকার করতে ওস্তাদ মারকুইজানরা। ওদের কাছে খেলা।'

'আমার কাছে মোটেও খেলা মনে হয়নি,' বিড়বিড় করলো মুসা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো নিচে কি ঘটছে দেখার জন্যে।

পানিতে ভাসলো সাগরের হাসির মাথা। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে এলো ওপরে। ফুচচ করে মুখ থেকে পানি ফেলে বললো, 'আউফ! ম্যাকো!'

তার পর পরই উঠে এলো ঝিনুক। কাঁধের একটা কাটা থেকে রক্ত পড়ছে। সেটা দেখে চিৎকার করে উঠলো মুসা, 'খাইছে! কামড়ে দিয়েছে!'

'নাআহ, তেমন কিছু না,' ডজ বললো। 'সামান্য আঁচড়। সিরিশ কাগজের মত ধারালো হাঙরের চামড়া, ঘষা লাগলে ছড়ে যায়।'

মেঝেতে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো দুই পলিনেশিয়ান। নিজেরা নিজেরা কথা বলছে।

'কি বলে?' জানতে চাইলো ওমর।

'বলছে, মারতে পারেনি। তার আগেই এসে হাজির হয়েছে একটা সোর্ডফিশ। ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। রক্তের গন্ধে হাজির হয়েছে। ওরা বলছে, হাঙরের চেয়ে বড় ওটা।'

'নিশ্চয় ততটা ডেনজারাস নয়, তাই না?'

'তা বলা যায় না। হাঙরের মত যখন তখন মানুষকে আক্রমণ করে না বটে, তবে যদি করে, তো বাঁচার আশাও শেষ। হাঙরের কবল থেকে ফেরা যায়, ওদের কবল থেকে না। সাংঘাতিক শক্ত তলোয়ার দিয়ে জাহাজের তলা ফুটো করে দেয়, মানুষ তো কিছু না।'

'বিশ্বাস করেন একথা?' মুসার প্রশ্ন।

'করব না কেন? অ্যাডমিরালটি রেকর্ড দেখলেই বুঝবে। প্লাইমাউথের জাহাজ দা ফরচুনকে একবার আক্রমণ করেছিলো সোর্ডফিশ। তামার পাত লাগানো ছিল জাহাজটার তলায়। পাতের ওপরে ছিলো তিন ইঞ্চি পুরু লোহাকাঠ, তার ওপরে

বার ইঞ্চি পুরু ওককাঠের তক্তা। সেসব তো ফুঁড়েছেই, ওপরে রাখা একটা তেলের ড্রামও ফুটো করে দিয়েছিলো। আরেকবার একটা ব্রিটিশ জাহাজ—নামটা ভুলে গেছি, ওটারও তলা ফুটো করেছিলো সোর্ডফিশ। সমস্ত পাম্প চালিয়ে দিয়ে পানি সেচতে সেচতে বন্দরে ফিরেছিলো জাহাজটা। সোর্ডফিশকে ছোট করে দেখো না।'

'তাহলে কেটে পড়া দরকার,' শঙ্কিত হয়ে উঠলো ওমর। 'জাহাজেরই যদি এই গতি করে, ফ্লাইং বোটের ওপর খেপে গেলে সর্বনাশ করে দেবে। এক ইঞ্চি ধাতব পাত ওটার জন্যে কিছুই না, বুঝতে পারছি।' তার কথা শেষ হতে না হতেই পানিতে জোর আলোড়ন উঠলো। 'এই, কি হল?'

সবাই তাকালো সেদিকে। পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন, সেই সাথে ফেনা।

'দেখ দেখ!' চিৎকার করে উঠলো কিশোর।

সবার চোখ পড়েছে সেদিকে। পানিতে লাফিয়ে উঠলো বিশাল এক হাঙর। মুসাকে আক্রমণ করেছিলো যেটা সেটাও হতে পারে কিংবা অন্যটা। একটা মুহূর্ত যেন ঝুলে থাকলো শূন্যে, তারপর ঝপাস করে পড়লো। মস্ত ঢেউ উঠলো পানিতে। পরক্ষণেই একটু দূরে ভেসে উঠলো সোর্ডফিশটা। নিশ্চয় ওটাই হাঙরটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'আপু! আপু! চেঁচিয়ে উঠলো ঝিনুক। 'জলদি পালান!'

'ওমর, জলদি!' তাগাদা দিলো ডজ। 'ঝিনুক যখন ভয় পেয়েছে, তার মানে...'

আর শোনার জন্যে দাঁড়ালো না ওমর। ককপিটের দিকে দৌড় দিলো। শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে সোর্ডফিশ। বিমানটাকে বোধহয় কোন শয়তান জানোয়ার ভেবে ছুটে আসতে শুরু করলো আক্রমণ করার জন্যে।

চালু হয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। তার পর পরই দ্বিতীয়টা। সবে চলতে শুরু করেছে বিমান, এই সময় প্রচণ্ড এক আঘাতে কেঁপে উঠলো থরথর করে। ঝাঁকি দিয়ে পানির ওপরে উঠে গেল কয়েক ইঞ্চি। সীট থেকে প্রায় উড়ে চলে গেল ওমর। যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের কেউ রইলো না। কোনমতে উঠে গিয়ে সীটে বসে আবার জয়স্টিক চেপে ধরলো সে।

মুহূর্ত পরেই তিরিশ ফুট দূরে ভেসে উঠলো সোর্ডফিশ। দ্রুত বিমানটাকে ওটার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো ওমর। কিন্তু ওড়ার আগেই আবার এক ভয়াবহ ঝাঁকুনি। ভোজবাজির মত যেন কেবিনের মেঝে ফুঁড়ে উদয় হলো একটা বিশাল তলোয়ারের মাথা। পলকের জন্যে। তারপরই এক হ্যাচকা টানে সরে গেল ওটা। গলগল করে পানি ঢুকতে শুরু করলো ফুটো দিয়ে। একটা তোয়ালে দিয়ে পানি বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো কিশোর। চেঁচাতে লাগলো, 'ওমরভাই, জলদি! জলদি করুন! দুই মিনিটও লাগবে না ডুবতে!'

ককপিটের দিকে ছুটে গেল মুসা। 'তাড়াতাড়ি ওড়ান! ফুটো করে দিয়েছে!'

'চেষ্টা তো করছি!'

পঞ্চাশ ফুট গিয়ে ঘুরতে শুরু করলো সোর্ডফিশ। আবার এসে খোঁচা মারার ইচ্ছে বোধহয়। 'আবার আসছে!' বলেই পিস্তল বের করে গুলি করতে লাগলো ডজ। ওটার গায়ে লাগলো কিনা বোঝা গেল না, তবে ততক্ষণে মাছটার চেয়ে

গতি বেড়ে গেছে বিমানের। কেবিনে ফিরে এসে মুসা দেখলো তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে সেখানে। পানি বন্ধ করার চেষ্টা করছে সবাই প্রাণপণে। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ভেসে গেছে মেঝে। কিশোর বললো মুসাকে, 'ওমর ভাইকে চালিয়ে যেতে বল। থামলে আরও বেশি ঢুকবে।'

ছুটে এসে ওমরকে খবরটা জানালো মুসা।

'তুলতেই পারছি না!' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বললো ওমর। 'একেতো ঝিনুকের ভার, তার ওপর পানি···উঠতেই চাইছে না!'

'কি করব?'

'সমস্ত ভার ফেলে দিতে হবে। আগে গিয়ে ডুবুরির সরঞ্জামগুলো ফেল। ওগুলোই সব চেয়ে ভারি।'

ছুটে কেবিনে ফিরে এলো মুসা। জানালা দিয়ে দেখলো, ডজ আইল্যাণ্ড প্রায় মাইল দুয়েক দূরে এখনও। তীব্র গতিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটছে বিমান। তবে ওড়ার শক্তি অর্জন করতে পারছে না কিছুতেই। 'ওমর ভাই বলেছে, ডাইভিং গীয়ারগুলো ফেলে দিতে। বোঝা কমাতে।'

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো না ডজ। টেনে নিয়ে এলো বেজায় ভারি ডাইভিং কিট, সাথে লাগানো চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের বুটসহ। দরজা দিয়ে ফেলে দিলো পানিতে। ওগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই ফেললো হেলমেটটা। তার পর একে একে পাম্প, লাইন, আর আরও যা যন্ত্রপাতি আছে, সব।

ঝিনকুগুলোর দিকে হাত বাড়ালো মুসা। তাকে বাধা দিলো সাগরের হাসি, 'না, দরকার নেই। আমি নেমে যাচ্ছি।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। তার পেছনে গেল ঝিনুক।

'ধরো! ধরো!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'ভয় নেই,' ডজ বললো। 'মাত্র এক মাইল। ওটুকু সাঁতরানো কিছুই না ওদের জন্যে।'

অনেকখানি ভারমুক্ত হয়ে গিয়ে অবশেষে উঠতে শুরু করলো বিমানটা। পানি ছেড়ে ওপরে উঠতেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো কেবিনের পানি। আরও কমে যেতে লাগলো ভার। লেগুনের ওপর যখন চক্কর মারতে শুরু করলো ওটা, সব পানি বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে।

ওমরের কাছে এসে দাঁড়ালো কিশোর। তাকে বললো ওমর, 'সবাইকে গিয়ে বলো, বেশি পানিতে নামালে আবার পানি ঢুকে ডুবে যাবে। পানির কিনারে নামিয়ে বালিতে তুলে ফেলার চেষ্টা করবো। পানি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই লাফিয়ে নেমে যায়। ভার কম থাকলে বালিতে তোলা সহজ হবে।'

ছুটে এসে সবাইকে কথাটা বললো কিশোর।

যতটা সম্ভব আস্তে পানিতে নামানোর চেষ্টা করলো ওমর। কিন্তু বিমানের পেট পানি ছুঁতে না ছুঁতেই আবার গলগল করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করলো। সোজা সৈকতের দিকে ছোটালো সে।

পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে প্রথম লাফ দিলো মুসা। বিশ মাইল গতিতে ছুটছে তখন বিমান। মাথা তুললো বিমানের পেছনে ঢেউ আর ফেনার মধ্যে। তার

পেছনে গেল কিশোর। সবার শেষে ডজ। পানিতে হাবুডুবু খেল তিনজনেই, সব চেয়ে বেশি কিশোর।

আবার যখন কেবিনে এসে উঠলো তিনজনে, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওমরকে। ঝিনুকগুলো বের করে সৈকতে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনজনকে দেখে কাজের ভার ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ককপিটে ফিরে এলো সে। একটু একটু করে ইঞ্জিনের জোর বাড়িয়ে বালিতে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো বিমানটাকে। ঝিনুক ফেলতে শুরু করেছে অন্য তিনজনে। এতে ভারও কমে যেতে লাগলো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চললো বিমান।

সমস্ত জিনিসপত্র বের করে আনা হলো বিমান থেকে। কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে বসলো ওমর। ডজের উদ্দেশ্যে বললো, 'তুমি তো মানাই করেছিলে। বললে কি দরকার। এ জন্যেই, বুঝলে, এ কারণেই ওগুলো আনতে চেয়েছি আমি। জানতাম প্রবালে ঘষা খেয়ে ফুটো হয়ে যেতে পারে। পাতগুলো এনে ভাল করেছি না, কি মনে হয়?'

নীরবে মাথা ঝাঁকালো শুধু ডজ।

'আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলো,' কিশোর বললো। 'ডজের বড়জোর তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে গিয়েছিলো মাথাটা। একটু সরে লাগলেই এতক্ষণে...,' কথাটা শেষ না করে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলো সে।

'বাপরে বাপ, যে জায়গার জায়গা,' হেসে বললো ওমর। 'বিমানের তলায় আরমার প্লেট লাগিয়ে নেয়া দরকার। যাকগে। ক্ষতি বেশি হয়নি। পাত কেটে লাগিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে ফেলা যাবে। বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত হবে, তবে ঝিনুক তোলার এখানেই ইতি।'

'আর বোধহয় দরকারও নেই,' মুসা বললো।

'না। অনেক হয়েছে,' সায় জানালো ডজ। 'যা পেয়েছি নিয়ে চলে যাই। পরে আসা যাবে।'

'ওই যে ওরা আসছে,' কিশোর বললো। 'আরেকটু দেরি হলেই ভাবনায় পড়ে যেতাম।'

একটুও ক্লান্ত মনে হলো না দুই পলিনেশিয়ানকে। স্বচ্ছন্দে সাঁতরে আসছে। কাছে এসে হাত তুলে হেসে বললো, 'কাওহা!' যেন পুরো ব্যাপারটাই একটা রসিকতা।

'ঝিনুকগুলো রোদে ফেলে রাখতে হবে,' ডজ বললো। 'আশা করি কালই খুলতে পারব। এই, হাত লাগাও,' কিশোর আর মুসাকে বললো সে। 'শেষ করে ফেলি।'

'এগুলোতেও নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে,' ঝিনুকগুলো দেখিয়ে ওমর বললো। 'স্কুনার একটা কিনে ফেলতে পারবে, ডজ। আরও মুক্তো তুলতে ফিরে আসতে পারবে।'

চোয়াল ডললো ডজ। 'কি জানি। আসতে তো চাইই। তবে মুক্তো পাওয়া এবং ধরে রাখার জন্যে ভাগ্য লাগে। আমার সেটা আছে বলে মনে হয় না। যা কিছু ভালো হয়েছে সব তোমাদের ভাগ্যে।'

'ননসেন্স!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো ওমর। 'ওসব বিশ্বাস কর নাকি। কাল বিকেলে রাটুনায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। এর মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।'

নয়

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলো ওরা। কাজে লেগে গেল। বিমানটা মেরামত করতে গেল ওমর, কিশোর আর মুসা। ধাতুর পাত কেটে টুকরো করে ফুটোটা বন্ধ করবে। ডজ, ঝিনুক আর সাগরের হাসি গেল ঝিনুকগুলো খুলে দেখতে। পানির ধার থেকে দূরে সৈকতের ওপরে বসে খুলতে শুরু করল ওরা। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো ওদের চিৎকার, মুক্তো পেলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠছে।

ভালই কাটলো দিনটা। বিকেলের শেষে আকাশের নীল যখন মলিন হয়ে এলো, মেরামতের কাজ তখন শেষ করে এনেছে ওমররা। আর মাত্র কয়েকটা ঝিনুক খোলা বাকি ডজদের। প্রথম দিনের মত এত ভাল আর বেশি ঝিনুক পাওয়া গেল না, তবে মন্দ পায়নি। ঝিনুকগুলো ঠিকমত পচার সময় পায়নি, নরম হয়নি, ফলে খুলতে সময় লাগছে।

সব মিলিয়ে ঝুড়ি না ভরলেও ডজের হ্যাটের অর্ধেকটা যে ভরা যাবে মুক্তো দিয়ে তাতে সন্দেহ নেই। নতুন সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এসে খেতের বাকি ঝিনুকগুলোও সাবাড় করে দিয়ে যাবার ইচ্ছেটা তার একটুও কমলো না, বরং বাড়লো।

মুক্তোগুলো সব একসাথে রাখতে রাখতে ডজ বললো, 'তোমরা গিয়ে কিছু মাছ ধরে আনলে পার। খাওয়া যেত।'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। হেসে বললো, 'প্রতি বেলাতেই যে হারে মাছ খাচ্ছি, শেষে না মাছের গন্ধই বেরোতে শুরু করে গা দিয়ে।'

বড়শি নিয়ে রওনা হলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। কিশোরও তাদের সঙ্গে চললো।

পশ্চিমের আকাশে বিচিত্র রঙ। প্রশান্ত মহাসাগরের অপরূপ সূর্যাস্তের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ওমর। তারপর চোখ ফেরালো আবার জায়গাটার দিকে, যেখানটা মেরামত করেছে। শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখলো সব ঠিক আছে কিনা। ককপিটে এসে ইনস্ট্রুমেন্ট বোর্ডের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। বেরিয়ে দ্রুত চলে এলো ডজের কাছে। মুসাও তখন ওখানে।

'কি ব্যাপার?' ওমরের মুখ দেখেই আন্দাজ করে ফেলেছে ডজ, খারাপ খবর আছে।

'ব্যারোমিটারের রিডিং ভাল না,' জানালো ওমর।

আকাশের দিকে তাকালো ডজ। 'কই, ভালই তো আবহাওয়া। খারাপ লাগছে না।'

'আকাশ-ফাকাশ দেখে বোঝা মুশকিল। রিডিং তিরিশের নিচে নেমে গেছে। পড়ছেই।'

চমকে গেল ডজ। 'কী!'

মাথা ঝাঁকালো ওমর। 'গিয়ে দেখ বিশ্বাস না হলে।'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ডজ। ব্যারোমিটার দেখতে গেল না। বললো, 'জলদি গোছগাছ করে নিতে হবে। যেরকম নামছে বলছো, বড় রকমের ঝড় আসবে। এখনি উড়তে হবে।'

'পারা যাবে না।'

'কেন?'

'জোয়ার না এলে পানিতে নামানো যাবে না প্লেনটাকে।'

'এতক্ষণ থাকা যাবে না। ঠেলেঠুলে নামাতে হবে। রাটুনায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে যত বড় ঝড়ই আসুক, কিছু করতে পারবে না আমাদের। কিন্তু এখানে থাকলে পাঁচ মিনিটে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে প্লেনটাকে। চল।'

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। মনে হয় খুব ভাল, আসলে তা নয়। ইতিমধ্যেই লেগুনের বাইরে দেয়ালের গায়ে বড় হয়ে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে ঢেউ। বজ্রের মত গর্জন করছে, আর সেই সাথে অনেক ওপরে ছিটিয়ে দিচ্ছে পানির কণা।

'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার,' বিড়বিড় করলো ডজ।

'এখন আর ভেবে লাভ নেই। চল দেখি নড়ানো যায় নাকি।' মুসার দিকে ফিরে ওমর বললো, 'জলদি ওদের ডেকে নিয়ে এস। মাছ আর লাগবে না।'

দৌড় দিলো মুসা। জরুরী অবস্থা এখন।

বিমানের নাকের কাছটায় রইলো ওমর। ঠেলতে লাগলো। নড়লও না বিমান। যেন বালিতে শেকড় গজিয়ে গেছে ওটার। পানির দিকে তাকিয়ে বললো, 'জোয়ার অবশ্য এসে গেছে। আর দশ মিনিট পরেই ভাসিয়ে ফেলবে।' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আল্লাহ! দেখতে দেখতে কি কাণ্ড হয়ে গেল!'

'ঢোকার মুখটা দেখুন না!' মুসা বললো।

লেগুনে ঢোকার প্রণালীটাতে এখন আর পানি আছে বলে মনে হয় না। শুধু ফেনা। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। 'হ্যাঁ, হয়ে গেছে কাজ!' ডজ বললো। 'আসছে। আর কোনই সন্দেহ নেই।'

'দশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে না পারলে,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওমর বললো। 'রাটুনায় পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। ঝড়ের মধ্যে অন্ধকার সাগরের ওপর দিয়ে ওড়ার সাহস নেই আমার। রাটুনায় ল্যাণ্ডিং লাইটও নেই যে আলো দেখে নামতে পারব। সময় থাকতে এখানে একটা জায়গা খুঁজে বের করা দরকার, যেখানে একটু আশ্রয় মিলবে।'

কিছু বলছে না ডজ। তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল ওমর। মুসা ফিরে এসেছে, একা।

'ওরা কোথায়?' জানতে চাইলো ডজ। 'আমরা এখুনি রওনা হব।'

'পেলাম না,' জবাব দিলো মুসা।

'পেলে না মানে? যাবে কোথায়? দ্বীপেই আছে।'

'সারাটা দ্বীপ খুঁজে এসেছি। ওরা নেই। কিশোরের জুতো পেয়েছি, আর বড়শি দিয়ে ধরা কিছু মাছ। ওদের চিহ্নও নেই।'

'জুতো কোথায় পেলে?'

'এই তো, কাছেই। প্রবালের ওপর পড়ে ছিলো। একটা খাঁড়ির ধারে।'

ডজের দিকে তাকালো ওমর। 'ব্যাপারটা কি? গেল কোথায়?'

মাথা নাড়লো ডজ। 'বুঝতে পারছি না। ক্ষতি হবে না কিশোরের। সাগরের হাসি আর ঝিনুক রয়েছে তার সঙ্গে। এসময় কি করতে হবে ভাল করেই জানে ওরা।'

'জানলেই ভাল। কিন্তু কথা হল, ওদেরকে না নিয়ে তো যেতে পারছি না আমরা। প্লেনটা ভাসিয়ে রাখি। তৈরি হয়ে থাকি। ওরা এলেই রওনা দেব।'

পনের মিনিট পেরিয়ে গেল। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। তার ভেতরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। কেমন যেন রহস্যময় লাগছে দৃশ্যটা। ভয় ভয় করে। ইতিমধ্যেই দিগন্ত রেখার নিচে অনেকখানি নেমে গেছে সূর্য, যেন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে যেন টুপ করে ডুবে গেল। অন্ধকার নামতে শুরু করলো।

'গেল!' হাত নেড়ে বলল ওমর। 'আজকে ফেরার আশা শেষ। রাতে আর পারব না। কিন্তু ওরা গেল কোথায়? আর তো চুপ করে থাকতে পারছি না।'

'প্লেনটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।' রীফের দিকে হাত তুলে দেখালো মুসা। 'এখুনি কিছু করতে না পারলে সর্বনাশ করে দেবে।'

এই প্রথমবার দেখলো, প্রবালের দেয়াল ছাপিয়ে লেগুনে ঢুকতে আরম্ভ করেছে সাগরের পানি। ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওপাশে, ঠেলে পানি ঢুকিয়ে দিচ্ছে লেগুনের ভেতর, ফলে ভেতরেও ঢেউ উঠছে এখন। পানি ফুলে ওঠায় বিমানটাও ভেসে উঠেছে। ভীষণ দুলছে।

'নোঙরে ভার বেঁধে দেয়া দরকার,' ওমর বললো। 'তাহলে দুলুনি কিছুটা কমতে পারে।'

'সত্যি সত্যি যদি ঝড় আসে, এক ডজন নোঙর বাঁধলেও লাভ হবে না,' ডজ বললো। 'ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাবে। চোখের পলকে।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। 'সেজন্যে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কিছু একটা করতেই হবে। বড় বড় প্রবালের চাঙড় এনে নাক আর লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখব। নোঙরের কাজ করবে।'

'এটা অবশ্য করা যায়,' ডজ বললো। 'টিকবে বলে মনে হয় না। তবু, চেষ্টা করি।'

'মুসা, আরেকবার গিয়ে দেখ কিশোরদেরকে পাও কিনা। আমি আর ডজ কাজটা সেরে ফেলি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াহুড়া করে রওনা হয়ে গেল মুসা।

আধ ঘন্টা পরেই ফিরে এল। ততক্ষণে ছয়টা নোঙর বেঁধে ফেলা হয়েছে বিমানের, ভাল সময়ে এর যে কোন একটাই বিমানকে আটকে রাখতে যথেষ্ট। 'পেলাম না,' মুসা জানালো। 'কিশোরের জুতো আগের জায়গাতেই পড়ে রয়েছে। সাঁতার কাটতে নেমেছিলো মনে হয়। ওমর ভাই, ভয় লাগছে আমার! কিছু হলো না তো?'

একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলো ওমর। 'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বললো সে। 'কিছু

একটা হয়েছে। নইলে ফিরে আসতো। পানিতেই কোন একটা ব্যাপার ঘটেছে। ডুবে মরেছে, এটা ভাবতে পারছি না। তবে কোন ভাবে বাইরের সাগরে গিয়ে পড়লে কি হবে বলা যায় না। ঢেউয়ের টানে ভেসে চলে যেতেই পারে।'

'তাহলে তো আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে,' বললো ডজ। 'হাঙরে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে...'

'তা পারবে না,' বাধা দিয়ে বললো ওমর। 'একজনকে হয়ত খেতে পারে, একসঙ্গে তিনজনকে সম্ভব না। বিশেষ করে ঝিনুক আর সাগরের হাসিকে। ওই একটা ঘটনাই ঘটে থাকতে পারে। দেয়ালে চড়েছিল হয়ত কিশোর। ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়েছে তাকে। বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে পড়েছে তখন সাগরের হাসি আর ঝিনুক। ওরাও ভেসে গেছে। ঢেউয়ের জন্যে এখন আর ফিরতে পারছে না।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'অন্ধকার না হলে উড়ে গিয়ে দেখতে পারতাম। কিন্তু এখন প্লেন নিয়ে ওঠাই যাবে না। উঠলে আর নামতে পারবো না। যা ঢেউ, নামতে গেলেই বাড়ি মেরে উল্টে ফেলবে। এক মিনিট লাগবে ডোবাতে।'

বিশাল ঢেউয়ের ভারি গর্জন যেন সমর্থন করল ওমরের কথা। ভয়ংকর গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে, তার আঘাতে কাঁপছে এখন দ্বীপটা। বাতাসের বেগ বাড়ছে। নারকেলের পাতা ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' ওমর বললো।

'করবটা কি তাহলে?' বিড়বিড় করলো ডজ। 'কিছু তো করা দরকার। চুপ থাকতে পারি না।'

'চল, সবাই মিলে আরেকবার খুঁজি,' গম্ভীর হয়ে বললো ওমর। 'ফল হবে বলে মনে হয় না। মুসা, তুমি পুবে যাও। ডজ মাঝখানটায় গিয়ে খোঁজ। আমি যাচ্ছি পশ্চিম দিকে।'

আলাদা হয়ে খুঁজতে বেরোল তিনজনে। কিশোর আর দুই পলিনেশিয়ানের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছে।

ঘন্টাখানেক পরে আগের জায়গায় ফিরে এসে ওমর দেখলো, মুসা আর ডজ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে হলো না, ওদের মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো। 'আর কিছু করার নেই আমাদের,' তিক্ত কণ্ঠে বললো সে। 'সকালের জন্যে বসে থাকতে হবে। ঝড় যদি থামে, আর প্লেনটা আস্ত থাকে তাহলে আরেকবার খুঁজতে বেরোব আরকি।' থমথম করছে তার মুখ। 'আল্লাই জানে ওদের কি হলো!'

ধীরে ধীরে কাটছে সময়।

মুসার মনে হলো, কয়েক শো বছর পরে অবশেষে হালকা হয়ে এলো পুব আকাশের অন্ধকার। ভোর যতই এগিয়ে এলো, বাড়তে থাকলো ঝড়ের বেগ। দেয়ালের ওপর দিয়ে পানি পাঠাতে আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না এখন ঢেউকে, আপনাআপনিই ঢুকে পড়ছে। সাগর আর লেগুন এখন প্রায় এক হয়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা আগেও নীরব আর শান্ত ছিলো যে সৈকত সেখানে এখন ঢেউ আছড়ে ভাঙছে। বাঁধা গরুর মতো দড়ি টানাটানি করছে বিমানটা, যেন দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইছে।

'আরেকটু জোর বাড়লে টিকবে না,' ওমর বললো। 'ব্যারোমিটারটা দেখে আসিগে।' কোমর পানিতে ভিজে এসে অনেক কায়দা কসরৎ করে বিমানে উঠলো সে। ককপিটে ঢুকলো। ইনস্ট্রুমেন্টস বোর্ড দেখে ফিরে এসে নামলো আবার পানিতে। কিংবা বলা যায় পানিতে ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে।

'কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করলো ডজ।

'উনত্রিশ।'

'ভাল। এসেই গেল তাহলে।'

'এখন উড়তে না পারলে আর কোনদিনই পারব না।' লেগুনের দিকে হাত তুললো ওমর। 'অবস্থা দেখেছ। আরেকটু পরেই বাইরের সঙ্গে এর কোন তফাৎ থাকবে না। মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কিশোররাও ফিরল না। এই ডজ, কি করি?'

'যাওয়াই উচিত,' গলায় জোর নেই ডজের। 'ঝড় থামলে আবার ফিরে আসা যাবে। খুঁজতে হবে ওদের। আর বসে থেকে এখন প্লেনটাই যদি ভেঙে যায়, আমরাও ফিরতে পারবো না। ওরা এলে ওরাও পারবে না। মোটকথা সবাই আটকা পড়বো তখন।'

'বেশ, ওঠ গিয়ে,' ওমর বললো। 'খুব সাবধান। যে হারে টানে পানি, পা ফসকে ভেসে গেলে আর আসতে পারবে না।'

একজন আরেকজনের হাত ধরে একটা শেকল তৈরি করলো ওরা। পানির টানের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনমতে যেন নিজেদেরকে টেনে তুললো বিমানে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ওমর। ইঞ্জিন, ঢেউ, বাতাস আর নারকেল পাতার মিলিত শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বললো, 'দড়ি কেটে দাও!' কণ্ঠস্বরটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো। 'ডজ, আগে সামনেরগুলো কাট। মুসা, তুমি পেছনে যাও। আমি না বললে কাটবে না। সাবধান।'

এমনিতেই টান টান হয়ে আছে দড়ি। ডজ ছুরি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই আলাদা হয়ে গেল। এক হ্যাঁচকা টানে বিমানটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল ঢেউ। এমন টানতে শুরু করলো, যেন লেজ ছিঁড়েই নিয়ে চলে যাবে। থ্রটল দিলো ওমর। চেঁচিয়ে বললো, 'মুসা, কাট।'

চাবুকের মত লাফিয়ে উঠলো কাটা দড়ির মাথা। গায়ে বাড়ি লাগলে চামড়া উঠে যেত। সরে এল সে। সাংঘাতিক দুলে উঠল বিমান। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মুসা। পড়েই থাকলো। দাঁড়ানোর চেয়ে এটা সহজ।

ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে বিমান। সামনে পানির ছিটে ফোয়ারার মত হয়ে এসে ককপিটের জানালায় লাগছে। এর ভেতর দিয়ে কিছু দেখাই মুশকিল। অনুমানের ওপরই সামনে ছোটালো ওমর। কোন ভাবে এখন দেয়ালে বাড়ি লেগে গেলে সব শেষ। পর পর দুই বার ঢেউয়ের খাঁজে পড়ল বিমান, যেন হঠাৎ করে শূন্য থেকে নিচে এসে পড়লো। ধক করে উঠলো ওমরের বুক। মনে হলো, এই বুঝি বাড়ি লাগল দেয়ালে। তবে নিতান্ত অলৌকিক ভাবেই যেন বেঁচে গেল দু'বারই।

ঢেউয়ের মাথায় উঠে সারতেও পারলো না বিমানটা, নাকের ওপর এসে ভেঙে পড়লো আরেকটা ঢেউ। চুবিয়ে মারতে চাইছে। ঘোরানোর চেষ্টা করলো ওমর।

কিছু করতে পারলো না। নিয়ন্ত্রণ নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে। আবার সাড়া দিলো বিমানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ততক্ষণে আরেকটা ঢেউয়ের খাঁজে নেমে পড়েছে বিমান। ঢেউয়ের দিকে আর নাক না ঘুরিয়ে দুটো ঢেউয়ের মাঝের খাঁজ দিয়ে তীব্র গতিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটলো ওটা। দ্রুত কমে যাচ্ছে মাঝের ফাঁক। বুঝতে অসুবিধে হলো না সাগরের দিক থেকে গড়িয়ে আসছে আরেকটা ঢেউ। যদি বিমানের পিঠে ভেঙে পড়ে, তাহলে আর বাঁচতে হবে না। মরিয়া হয়ে জয়স্টিক ধরে টান দিলো ওমর। ওড়ার এটাই শেষ সুযোগ।

মাতাল হয়ে গেছে যেন বিমানটা। ঢেউয়ের কথা শুনবে, না ইঞ্জিনের বুঝতে পারছে না। অবশেষে টলমল করে যেন ওড়ারই চেষ্টা করলো। মায়া কাটালো পানির। ফ্লোটের গায়ে এসে বাড়ি মারলো ঢেউ। কাঁপিয়ে দিলো বটে, তবে রুখতে পারলো না বিমানটাকে। জোর করতে পারলো না। মস্ত একটা উড়ুক্কু মাছের মত যেন ঢেউয়ের নিচ থেকে লাফ দিয়ে বেরোল ফ্লাইং বোট। ককপিটের জানালায় এসে পড়লো পানির ফোয়ারা। সামনের সব কিছু চোখের আড়াল করে দিল ক্ষণিকের জন্যে।

চেপে রাখা দমটা ফোঁস করে ছেড়ে সীটে হেলান দিলো ওমর। সীট বেল্টের বাঁধন শক্ত করলো। রাটুনার দিকে কোর্স ঠিক করলো বটে, তবে সরাসরি যেতে পারছে একথা বলা যাবে না। কারণ সরাসরি সেদিক থেকেই ধেয়ে আসছে বাতাস। নাকটা কোণাকোণি করতে বাধ্য হলো সে। তারমানে দ্বীপের দিকে না গিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরের দিকে, এই পথে চললে। চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ব্যারোমিটারে। সাড়ে আটাশ।

রাটুনা দেখা গেল। শাদা হয়ে গেছে সাগর। তার মাঝে যেন ফ্যাকাসে সবুজ মরুদ্যান। আতঙ্কিত হয়ে ল্যাণ্ড করার জায়গা খুঁজলো সে। শাদা আর সবুজের মাঝখানে এক জায়গায় সরু এক চিলতে পানি দেখা গেল, সাগরের সঙ্গে যেটার রঙের অমিল রয়েছে। নিশ্চয় ওটাই লেগুন। দেয়াল ডিঙিয়ে এখনও সাগরের ঢেউ ঢুকতে পারেনি ওখানে।

সেদিকেই চললো ওমর। লেগুনের ওপরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বাইরে সাগরের তুলনায় একেবারে শান্ত রয়েছে ওখানকার পানি, বলা চলে। বাতাসে উড়ছে নারকেলের ছেঁড়া পাতা। অনেক পাতা এসে পড়েছে পানিতে। সরের মত ভাসছে। কতটা পুরু হয়ে, বোঝা কঠিন। বেশি পুরু হলে বাড়ি লেগে ফ্লোটের ক্ষতি হতে পারে। তবে এখন আর বিমান বাঁচানোর কথা ভাবছে না ওমর, নিজেদের বাঁচার কথা ভাবছে। রাটুনায় যখন একবার পৌঁছতে পেরেছে, ঝড় থামলে ডজ আইল্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেই।

কোথায় নামাবে জায়গা বাছাই করে নিলো সে। গতিবেগ একটুও কমলো না, পুরো খুলে রেখেছে থ্রটল। পানিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন বিমান। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল একপাশে। নারকেল পাতার স্তূপ আঁকড়ে ধরেছে ওদিকের উইং ফ্লোট। কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই অন্য ফ্লোটটাকেও ধরল। থামাতে পারলো না। টেনেহিঁচড়ে আরও কয়েক গজ গিয়ে তারপর থামল বিমান।

আরও গজ বিশেক যেতে পারলে নামা যেত। তীরের কাছাকাছি, পানি আছে.

তবে মাটি নাগাল পাওয়া যাবে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে অন্য দু'জনের দিকে ফিরলো ওমর। 'মনে হচ্ছে কিছু সময় থাকতে হবে এখানে। তা নাহয় থাকলাম, আসল বিপদ কাটিয়ে এসেছি। কিশোরদের জন্যে ভয় লাগছে এখন।'

'ঝড় থামলে না হয় গিয়ে দেখা যেত,' ভীষণ মুষড়ে পড়েছে মুসা। তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। কিশোর মারা গেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক থাকতে, এটাও বিশ্বাস করে না। তাহলে হলোটা কি?

'এখানে থাকার চেয়ে চল গাঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি,' ডজ বললো। 'ঝড় থামলে লোক নিয়ে এসে পাতা কেটে প্লেনটা বের করে দ্বীপে যাব আবার। মুসা, ভয় পেয়ো না। সাগরের হাসি আর ঝিনুক থাকতে কিশোর মরতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও নিরাপদেই আছে ওরা। আমাদের অজানা কোনখানে।'

'এই ঝড়ের মধ্যে নামবে?' ওমরের প্রশ্ন। 'শুনেছি, ঝড়ের সময় কামানের গোলার মতো নারকেল ওড়ে এসব অঞ্চলে। মাথায় লাগলে ছাতু বানিয়ে দেবে।'

'তাই তো! ভুলে গিয়েছিলাম। বাতাস না কমলে বেরোন যাবে না।'

'ঠিক আছে, বসেই থাকি।' সীটে হেলান দিলো ওমর। 'পাতায় ঢেকে যাবে আরকি আমাদের ওপরটা। তা যাক। ভাল কথা, মুক্তোগুলো কোথায় রেখেছ?'

'মুক্তো!' চোখ মিটমিট করলো ডজ। 'তুমি আননি?'

'আমার কি আনার কথা নাকি?'

দেখার মত হলো ডজের চেহারা। মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বললো সে, 'আগেই বলেছি, আমি একটা হতভাগা! পোড়া কপাল! মুক্তো কি আর আমার মত লোকের কপালে সইবে!' দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো সে। 'রয়ে গেছে দ্বীপেই। পাথরের নিচে যেখানে রেখেছিলাম।'

ঘুরতে ঘুরতে এসে মাথার ওপরে ছাতে পড়লো একটা নারকেল পাতা।

'বাহ্, চমৎকার! এভাবে পড়তে থাকলে ছাতটাও কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে আল্লাহই জানে!' ওমরের কণ্ঠে সন্দেহ।

দশ

কোথায় যে গেছে কিশোর, মুসার অন্তত এটা বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু উত্তেজনা আর বিপদের সময় হাত-পা যতটা সহজে খেলে ততটা খেলে না তার মগজ। সে জায়গাটায় মুসা গিয়েছে, কিন্তু সেকথা বলার প্রয়োজন বোধ করেনি ওমর কিংবা ডজকে। তাহলে ওরা হয়ত অনুমান করতে পারতো।

ডজের অনুরোধে গুহার কাছে এসে মাছ ধরতে বসলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। তাদের পাশে কিশোর। দেখতে দেখতে যথেষ্ট মাছ ধরা হয়ে গেল। আগের দিনের মতই প্রস্তাব দিলো সাগরের হাসি, সাঁতরাতে নামবে। বলেই নেমে পড়ল।

ঝিনুকও কি আর বসে থাকে? নেমে পড়লো সে-ও। কিশোর ভাবলো, গুহাটা

দেখেই আসা যাক। এত সুন্দর যখন বলেছে মুসা।

সাগরের হাসি আর ঝিনুককে বললো সেকথা। ওরা তো বলতেই রাজি। ঢুকে পড়লো তিনজনে।

গুহাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল কিশোর। মুসার মত এত সহজে আগ্রহ নষ্ট হলো না তার, দেখছেই, দেখছেই। কোন দিক দিয়ে যে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, খেয়ালই রাখছে না।

অবশেষে যখন খেয়াল হলো, তাকে বসেই মুখ ফিরিয়ে দুই সঙ্গীকে বললো সে, 'চল, যাই। আর দেরি করলে রাত হয়ে যাবে।' পানির দিকে তাকিয়ে কি ভাবলো। 'দেখ, পানির রঙ কেমন বদলে যাচ্ছে। না?'

তাকের ওপর দাঁড়িয়ে সাগরের হাসি আর ঝিনুকও তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। তাকের কিনার ধরে দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করলো কিশোর। এক দোলা দিয়ে আলগোছে ছেড়ে দিতে যাবে এই সময় চিৎকার করে উঠলো সাগরের হাসি, 'ম্যাকো! ম্যাকো!'

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালো কিশোর। কিংবা বলা যায় ভীষণ চমকে গিয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো। ধপ করে বসে পড়লো আবার তাকের ওপর। 'কি বললে?'

পানির দিকে হাত তুলে রেখেছে সাগরের হাসি।

মস্ত একটা তিনকোণা পাখনা ভেসে উঠেছে পানিতে। গুহার প্রবেশ মুখের কাছে। এগিয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে।

পুরো একটা মিনিট নীরবে তাকিয়ে রইলো কিশোর। লেগুনের পানিতে এখানে এই প্রথম হাঙর দেখলো। বাধা দিতে আর একটা সেকেণ্ড দেরি করলে সাগরের হাসি কি ঘটত ভেবে শিউরে উঠলো। 'কি করবো?' প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো সে।

'বসে থাকতে হবে,' বললো ঝিনুক। 'আর তো কোনো উপায় দেখি না।'

'সাত দিনেও যদি না যায় ওটা?'

'আমাদেরও থাকতে হবে।'

তাকে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। সে যেখানে রয়েছে তার ফুট দশেক দূরে ভেসে উঠলো বিশাল হাঙরের পিঠ। এত বড় ওটা, গুহাটা যেন প্রায় ভরে গেল। ছোট ওই বদ্ধ জায়গায় তিমির চেয়ে বড় লাগলো ওটাকে। যেখানে রয়েছে ওরা, নিরাপদেই থাকবে। কারণ তাকটা পানি থেকে তিন ফুট উঁচুতে, কোন জায়গায় দুই ফুট। ওপরে থাকলে কিছু হবে না, কিন্তু পানিতে পা নামালে মহা বিপদে পড়বে। পা কামড়ে ধরে টেনে নিতে পারে হাঙরটা। আর তার অর্থ ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

'আটকা পড়লাম আমরা!' বললো সে। 'বেরোতে পারব না। কিন্তু ব্যাটা এখানে এল কেন মরতে?'

'অনেক বড় ঝড় আসছে,' ঝিনুক বললো। 'হয়ত হারিকেন। বড় বড় মাছ যখন লেগুনে ঢোকে, গুহায় ঢোকে, বুঝতে হবে বাইরের সাগরের অবস্থা খারাপ।'

'তাহলে এখন কি করব? এসব অবস্থায় কি করতে হয় তোমরাই ভাল

বোঝ।'

'থাকতে হবে, আরকি।'

'মারা যায় না? কিংবা তাড়ান? তোমরা তো হাঙরের সঙ্গে লড়াই কর।'

'সেটা খোলা জায়গায় হলে। এখানে গুহার ভেতরে পারব না। আটকে ফেলবে সহজেই। ওদের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। বুদ্ধির জোরেই কেবল কাবু করা যায়।'

বিশাল পাখনাটার দিকে তাকালো আবার কিশোর। নৌকার পালের মত খাড়া হয়ে আছে। 'ওরা খুব চিন্তা করবে। আমাদেরকে না পেয়ে।'

বসলো সাগরের হাসি। তাকের কিনারের দেয়াল থেকে আলগা একটুকরো প্রবাল খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো হাঙরটাকে সই করে। গাল দিলো আঞ্চলিক ভাষায়।

ধীরে সুস্থে শরীর নাড়লো হাঙরটা। দেখিয়ে দিলো ধূসর-শাদা পেট।

'তোমাদের দেবতাকে ডাক,' কিশোরকে পরামর্শ দিলো ঝিনুক। চিন্তিত লাগছে তাকে।

কিছু বললো না কিশোর। সে-ও ভাবছে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। কালো হয়ে গেছে নীল পানি। তার মানে সূর্য ডুবে গেছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্যেরা। পাবে না ওপরে। তখন মুসার হয়ত মনে পড়বে গুহাটার কথা। মাছ আর জুতো ফেলে এসেছে ওপরে। ওগুলো দেখে সে আন্দাজ করে ফেলবে, ওরা কোথায় রয়েছে। তখন দেখতে আসতে পারে। ওকে হুঁশিয়ার করার কোন উপায়ই নেই। সোজা এসে পড়বে হাঙরের মুখে। নিজেদের চেয়ে মুসার জন্যে এখন বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লো সে।

জীবনে অনেক বিপদে পড়েছে কিশোর। সেগুলো থেকে উদ্ধারও পেয়েছে কোন না কোন ভাবে। কখনও নিজের বুদ্ধির জোরে, কখনও অন্যের সাহায্যে। কিন্তু এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না সে। কোন বুদ্ধি বের করতে পারছে না। কতদিন থাকবে এখানে হাঙরটা, সেটা এখন আর বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, মুসা খুঁজতে আসবে।

শান্ত পানিতে কাঁপন উঠেছে এখন। হাঙরটা চুপ করে রয়েছে, আলোড়নটা তার সৃষ্ট নয়। পানি একবার উঠছে একবার নামছে। সেদিকে তাকিয়ে ঝিনুককে বললো কিশোর, 'ঠিকই বলেছ। ঝড়ই আসছে।'

'ঝড় থেমে গেলেই ম্যাকো চলে যাবে,' বললো ঝিনুক।

'ঝড়টা কতক্ষণ থাকবে?'

'দুই দিন। তিন দিন। ঠিক নেই।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো কিশোর। প্রবালের টুকরো ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ছে সাগরের হাসি। যেন ঝাল মেটাচ্ছে হাঙরের ওপর। গায়েই যেন লাগছে না এই আঘাত, কিংবা অপমান গায়ে মাখছে না হাঙর। চুপ করে রয়েছে ওটা। দ্রুত অন্ধকার হয়ে গেল। আলোর কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। তার মানে সারাটা রাত এই গুহার ভেতরে অন্ধকারে কাটাতে হবে, যদি মুসা না আসে। 'আল্লাহ্, না আসুক,' প্রার্থনা শুরু করলো কিশোর। 'না আসুক! অন্ধকারেই থাকব আমরা!'

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পানির ওঠানামার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। হাঁটুতে থুতনি রেখে রাত কাটাতে তৈরি হলো কিশোর। জীবনের দীর্ঘতম রাত।

রাত যেন আর শেষই হতে চায় না। ভোরের আলো আসতে এত দেরি হচ্ছে, একসময় কিশোরের মনে হল দেয়াল ধসে পড়ে গুহার মুখটাই বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। পানির ওঠানামার শব্দ বাড়ছে। তার মানে বাইরে ঝড়ও বাড়ছে। ঘুমানো তো দূরের কথা, চোখের পাতাও এক করতে পারছে না সে। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাকিয়ে রয়েছে তবু।

অবশেষে দেখা গেল আলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। নাহ্, গুহার মুখটা খোলাই আছে, দেয়াল ধসে পড়েনি। কিন্তু আলো বাড়লেও পানির রঙ আর নীল হলো না। ধূসর, একঘেয়ে, বিষণ্ন। আবার দুশ্চিন্তা হতে লাগলো মুসার জন্যে। রাতের অন্ধকারে পানিতে নামেনি বটে, কিন্তু এখন আলো ফুটেছে। নিশ্চয় দেখতে আসবে।

গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক। যেন ঘরের ভেতরে রয়েছে। ভাবনার কিছুই নেই এখানে। কোন বিপদ নেই, ভয় নেই। আস্তে করে ঝিনুকের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল সে। জেগে গেল ঝিনুক। সাগরের হাসিও। পানির রঙ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল, পাখনাটা দেখা যাচ্ছে না। তার মানে কি হাঙরটা নেই?

ভালো করে দেখে ঘোষণা করলো সাগরের হাসি, নেই, চলে গেছে। স্বস্তির কাঁপা নিঃশ্বাস পড়লো কিশোরের। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাবে, এই সময় গম্ভীর মুখে ঝিনুক বললো, 'ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না বটে। হয়ত নিচে ডুবে রয়েছে। নামলেই ধরবে।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল যেন কিশোর। এটা ভাবেনি। সত্যি, নিচে ডুব দিয়ে থাকতেই পারে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন হাঙরটা ভাসলো না, উঠে দাঁড়ালো ঝিনুক। বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

'হাঙরটা যদি থাকে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'লড়াই করবো। হয় ম্যাকো মরবে। নয়তো আমি।'

মাথা নাড়লো কিশোর। তবে নিষেধ করতে পারলো না ঝিনুককে। করতে হলে অন্য কোন উপায় বাতলে দিতে হবে এখান থেকে মুক্তির। সেটা যখন পারছে না, কি আর বলবে।

'আমি যাই,' আবার বললো ঝিনুক। 'তোমরা থাক। ম্যাকো না থাকলে ফিরে আসব।'

এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে চলেছে কেন ঝিনুক, বুঝতে পারছে কিশোর। মুসার কথা ভেবে। তাকে যেতে না দেয়াই উচিত। কিন্তু এবারও মানা করতে পারলো না। ভাবলো, সে নিজেও যাবে। সাহায্য করবে ঝিনুককে। পরক্ষণেই বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। বদ্ধ জায়গায় উপকার তো করতেই পারবে না, গিয়ে আরও সমস্যা বাড়াবে ঝিনুকের। অসহায় দৃষ্টিতে সাগরের হাসির দিকে তাকালো সে। পানির দিকে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা। বোধহয় ম্যাকোকে খুঁজছে।

ওই মুহূর্তে ছুরি কামড়ে ধরে পানিতে ঝাঁপ দিলো ঝিনুক। কোমরের ছুরির বাঁটে হাত ছোঁয়ালো সাগরের হাসি। তৈরি রয়েছে। দরকার হলেই যাতে ঝাঁপ দিতে পারে।

কয়েকটা সেকেণ্ড পানির দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা। তারপর আচমকা কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বের করে দাঁতে কামড়ে নিয়ে দিলো ঝাঁপ। কিশোর কিছু বলার সময়ও পেল না, বাধা দেয়া দূরে থাক। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো পানির দিকে।

বেশ আলোড়ন উঠতে লাগলো। যেন হঠাৎ করেই সাংঘাতিক তোলপাড় শুরু হয়েছে তলায়। গুহামুখের কাছে কালো ছায়া দেখতে পেল বলে মনে হলো তার। মিনিট কাটছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। ভেসে উঠলো ঝিনুকের মাথা। ডেকে বললো, 'জলদি এস!'

'ম্যাকো গেছে?'

'জলদি এস! বড় বড় ঢেউ!'

একবার দ্বিধা করলো কিশোর। তার পরই ঝাঁপ দিলো পানিতে। নেমে চললো ঝিনুকের পিছু পিছু। ভয়ে বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি এসে পা কামড়ে ধরলো হাঙরটা।

ঠেলে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরতে চাইছে তাকে স্রোত। ঢোকার সময় এই স্রোত ছিলো না। এখন এলো কোথা থেকে? হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো ঝিনুক। সুড়ঙ্গের মুখের ভেতরে ঢুকতেই যেন অদৃশ্য এক দানবের হাত হ্যাঁচকা টানে বাইরে বের করে নিয়ে গেল তাকে। তারপর ছুঁড়ে দিলো ওপর দিকে।

কি করে ডাঙায় উঠলো কিশোর, বলতে পারবে না। শুধু মনে আছে, পেছন থেকে তাকে ঠেলছে ঝিনুক, আর চুল ধরে তাকে টেনে তুলছে সাগরের হাসি। হাঁটু পানিতে থাকতেই পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারলো মস্ত এক ঢেউ। তিনজনকেই প্রায় ছুঁড়ে ফেললো সৈকতে।

ধপ করে বসে পড়লো কিশোর। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো ঝিনুক। হাত তুলে দেখালো ঢেউয়ের দিকে। মস্ত একটা পাখনা ভেসে উঠেছে। শিউরে উঠলো কিশোর। ওরা যখন বেরিয়ে আসছে তখনও কাছাকাছিই ছিল হাঙরটা।

'গুহায় অসুবিধে হচ্ছিলো,' ঝিনুক বললো। 'অনেক বড় তো। হাঁসফাঁস লাগছিলো হয়ত। তাই বেরিয়ে পড়েছে।'

চারপাশে তাকানোর সুযোগ পেলো এতক্ষণে কিশোর। অনুভব করলো ঝড়ের শক্তি। বাতাসের অদৃশ্য থাবা তার দেহ আঁকড়ে ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কাত হয়ে যাচ্ছে নারকেলের পাতা, ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে ডালের গোড়া থেকে। লেগুনের দেয়ালের নিচে যেন কয়েক কোটি দৈত্যের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে। এমন করে ফুঁসছে সাগর। শাদা ফেনায় ভরে গেছে লেগুনের পানি। দেখে বিশ্বাসই হয় না, ঝলমলে রোদের সময় ওটা নীল ছিলো। কালচে-ধূসর আকাশের মতই এখন রঙ হয়ে গেছে পানির।

বিমানটাকে খুঁজতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেল কিশোর। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। নেই। সে ভাবলো, প্রচণ্ড ঢেউ নোঙর ছিঁড়ে নিয়ে গেছে

ওটাকে, ডুবিয়ে দিয়েছে। মুসারা কোথায়? সাগরের হাসি আর ঝিনুককে বললো সে, দেখতে যাচ্ছে। বাতাসের মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলো কতটা ভয়ংকর ঝড়। প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে যেন লড়াই করতে করতে এগোতে হলো তাকে। যেখানে ক্যাম্প করেছিলো ওরা সেখানে এসে দেখলো কোন মানুষ নেই। মাটিতে বিছিয়ে রয়েছে নারকেল পাতা। ইতস্তত পড়ে থাকা কয়েকটা কাঠের বাক্স প্রমাণ করছে এখানে ক্যাম্প ছিলো। হতাশ কণ্ঠে চিৎকার করে যেন নিজেকেই বোঝালো সে, 'ওরা চলে গেছে!'

সৈকতের দিকে তাকালো। যেখানে বিমানটা বাঁধা ছিলো। বিড়বিড় করে বললো, 'নিশ্চয় ঝড় শুরু হতেই চলে গেছে।'

ওসব নিয়ে পরে ভাববে। আপাতত মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দরকার। দ্বীপের মাঝখানের দিকে চললো সে। ওখানে নারকেল গাছের জটলার ভেতরে ঢুকে বসার ইচ্ছে। কিন্তু এমন ভাবে ছোটাছুটি করছে নারকেলের পাতা, নিরাপদ মনে করতে পারলো না জায়গাটাকে।

সাগরের হাসি আর ঝিনুকের দিকে তাকালো। হাত নেড়ে সেদিকেই যাওয়ার ইঙ্গিত করলো ওরা। ওরাও সেদিকে চলেছে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এসব ঝড় দেখে অভ্যস্ত পলিনেশিয়ানরা। ঝড়ের সময় আত্মরক্ষা করতে হয় কিভাবে জানে।

নারকেলের জটলার ভেতরে পৌঁছে গেল ওরা। মুখের কাছে দু'হাত এনে কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ঝিনুক বললো, 'বাতাস পড়ে গেলেই আসবে বড় জোয়ার।'

বোধহয় জলোচ্ছ্বাসের কথা বলছে ঝিনুক। পাগল হয়ে যাওয়া বিশাল ঢেউয়ের দাপাদাপির দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, 'এর চেয়ে বড়?'

'হ্যাঁ। দ্বীপ ভাসিয়ে দেবে। এস।' যেন ঝিনুকের কথার সমর্থনেই বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো সৈকতে, পানি উঠে চলে এল অনেকখানি ওপরে।

'এস এস!'

নারকেল উড়ছে না আর। কারণ ওড়ার মত নেইই। সব পড়ে গেছে, বিছিয়ে রয়েছে গাছের তলায়। মোটা একটা গাছ বেছে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলো সাগরের হাসি। গাছের চারপাশ ঘিরে খাঁজ কাটছে। কাটা শেষ করে নিজের শরীর পেঁচিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলো গাছের সঙ্গে, দড়িটা বসিয়ে দিয়েছে খাঁজের মধ্যে। ক্যাম্পের কাছে দড়ি পড়ে ছিলো, ওখান থেকে তুলে এনেছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো গাছে ওঠার জন্যে। তার সঙ্গে একই গাছে।

ঠিক কি করতে চাইছে সাগরের হাসি তখনো বুঝতে পারছে না কিশোর। যা করতে বলা হলো করলো সে। মেয়েটার কাছে উঠে এলো। আরেকটা খাঁজে দড়ি বসিয়ে কিশোরের চারপাশে পেঁচিয়ে বাঁধলো সাগরের হাসি।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিশোরের কাছে। বাতাসে দুলছে নারকেলের কাণ্ড, মাঝে মাঝে এত বেশি নুয়ে পড়ছে তার ভয় লাগছে ভেঙেই না যায়। মাটি থেকে অনেক ওপরে রয়েছে। দড়ি ছিঁড়ে গেলে কি হতে পারে কল্পনা করতে চাইলো না সে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে ঢেউ, পানি উঠছে দ্বীপে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠতেও দেরি হবে না, বুঝতে পারছে কিশোর। এখনও গুহার ভেতরে থাকলে কি অবস্থা হতো ভেবে গায়ে কাঁটা দিলো তার। হাঙরে না খেলেও পানিতে ডুবেই মরতে হতো। নিশ্চয় এতোক্ষণে পানিতে ভরে গেছে গুহাটা।

মাথা ঘুরিয়ে তাকালো কিশোর। আরেকটা গাছে উঠে একই ভাবে নিজেকে বেঁধেছে ঝিনুক। এই বাতাসের মধ্যে নারকেলের কাণ্ড আঁকড়ে থাকা যে কতটা কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। ওই মুহূর্তে তার মনে হলো এসব অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে গোয়েন্দাগিরি অনেক ভালো এবং সহজ।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো ঝিনুক।

'বাপরে, বাপ! সাহস আছে ওদের!' ভাবলো কিশোর।

গাছের কাণ্ড আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কখন থামবে সেটা ঝড়ের ইচ্ছে।

এক ঘন্টা পেরোল, দুই ঘন্টা। তারপর আচমকা নীরব হয়ে গেল সব কিছু। বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি মাথার ওপরে নীল আকাশও চোখে পড়লো একটুকরো।

যাক, ঝড়টা তাহলে গেল। হাঁপ ছাড়লো কিশোর।

কিন্তু মাথা নাড়লো সাগরের হাসি। 'উঁহু! শেষ হয়নি। এটা ঝড়ের মধ্যিখানটা। আবার আসবে বাতাস।'

মেয়েটা কি বলছে বুঝতে পারলো কিশোর। মনে পড়ল অথৈ সাগর অভিযানের কথা। সেবারেও হারিকেনের মাঝে পড়েছিল জাহাজ। ঝড়ের মধ্যিখান বলতে কেন্দ্রবিন্দু বোঝাচ্ছে সাগরের হাসি। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাস থাকে না, সেটা পেরোলেই আবার আগের মত জোরালো তুফান শুরু হবে।

বেশিক্ষণ থাকলো না ওই নীরবতা। হঠাৎ যেমন থেমে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎই আবার এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো বাতাস। মাথার ওপর থেকে হারিয়ে গেল নীল আকাশ। ধেয়ে এল ঢেউ।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে একটানা বয়ে চললো ঝড়। বিকেল চারটের দিকে কমে এলো বাতাসের বেগ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে একবারে কাহিল হয়ে পড়েছে কিশোর। গাছ জড়িয়ে ধরে রাখার শক্তিও যেন নেই।

পানি নেমে যেতে শুরু করলো। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো সূর্য। দিগন্তসীমার কাছাকাছি নেমে গেছে। বিরাট এক আগুনের গোলার মত লাগছে এখন ওটাকে।

নামবে কিনা জিজ্ঞেস করলো কিশোর। মাথা নাড়লো সাগরের হাসি। এখনও সময় হয়নি।

সূর্য ডুবলো। সাগরের হাসি ঘোষণা করলো, এবার নামা যেতে পারে। নেমেই ভেজা মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো কিশোর। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ব্যথা হয়ে গেছে। লবণে শক্ত হয়ে গেছে চুল এমনকি ভুরু পর্যন্ত।

সাগরের হাসি আর ঝিনুকের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। তবে সকলেই খুশি। ঝড়টা কাটাতে পেরেছে। আর বেঁচে তো রয়েছে এখনও। কোন কিছু

নিয়েই একটুও উদ্বিগ্ন হলো না দুই পলিনেশিয়ান।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠলো ওরা। এগোল ক্যাম্প এলাকার দিকে। দ্বীপের চেহারা বদলে দিয়ে গেছে ঝড়। প্রবালের অনেক চড়া গায়েব হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় মাটি খুবলে নিয়ে গেছে ঢেউ। পানিতে ভেসে গেছে অনেক পাতা, কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখনও। তবে তার চেয়ে বেশি জমে রয়েছে সামুদ্রিক আগাছা। আর রয়েছে ঝিনুক। অগুনতি। নানা জাতের, নানা আকারের। ওসবের মাঝে কিলবিল করছে কাঁকড়ার দল। আরও নানা রকম জলজ প্রাণী উঠে এসেছিলো ঢেউয়ে, নামার সময় আর যেতে পারেনি, আটকা পড়েছে বালিতে।

ক্যাম্প এলাকাটা সব চেয়ে উঁচু ওই দ্বীপে। ওখানে পানি ওঠেনি। কাছাকাছি ঝাপটা দিয়ে গেছে শুধু ঢেউ। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখে গেছে। প্রবালের চাঙড়ের খাঁজে একটিন গরুর মাংস আটকে থাকতে দেখলো কিশোর। কয়েক টিন কনডেনসড মিল্ক, আর এক টিন বিস্কুট পাওয়া গেল, বালিতে অর্ধেক গাঁথা অবস্থায়। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। তর সইছে না আর। সাগরের হাসির কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে মাংস আর বিস্কুটের টিন কাটলো সে। মুখে দিয়ে চিবুতে গিয়ে টের পেল জিভই নাড়তে পারছে না। শুকিয়ে যেন আঠা হয়ে লেগে গেছে মুখের ভেতরে। পানি দরকার। ঝর্নাটার দিকে চলল সে। কিন্তু গিয়ে অবাক হয়ে গেল। যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই ওটা। বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে।

দুই পলিনেশিয়ানও এসেছে তার পিছু পিছু। তাদের দিকে চেয়ে গুঙিয়ে উঠলো কিশোর, 'পানি নেই! এবার মরব!'

হেসে উঠলো সাগরের হাসি। 'না, মরব না। পানি অনেক আছে।' পড়ে থাকা অনেক ডাব দেখালো সে।

তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলো কিশোর। চিন্তা দূর হলো।

একটা ডাব তুলে নিলো সাগরের হাসি। ছুরি দিয়ে মুখটা কেটে ছিদ্র করে তুলে দিলো কিশোরের হাতে।

মিষ্টি পানিতে ভরে গেল কিশোরের মুখ। জিভ নাড়তে কষ্ট হচ্ছে এখনও। আস্তে আস্তে ভিজিয়ে নরম করে আনলো। পানি খাওয়ার পর ডাবটাকে দুই টুকরো করে ভেতরের নরম মিষ্টি শাঁস খেলো সে। অনেকটা বল ফিরে পেলো শরীরে।

ভেজা মাটিতে বসে নীরবে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চালিয়ে গেলো ওরা। ধীরে ধীরে খাচ্ছে। গরুর মাংস, বিস্কুট আর নারকেল।

শেষ হলো খাওয়া। চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। সাগরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিশোর, ওমররা প্লেন নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে পেরেছে তো? নাকি ডুবে মরেছে সাগরে? কালকের মধ্যে যদি ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে বেঁচে নেই ওরা।

বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করার সুযোগ পেলো না কিশোর। এতো ক্লান্ত হয়েছে শরীর, বসেও থাকতে পারছে না আর। শুয়ে পড়লো বালিতে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

এগারো

সকালে আগে ঘুম ভাঙলো কিশোরের। চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো নীল আকাশের দিকে, পুরো দুই মিনিট। কি যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে, অনুভূতি বলছে। হঠাৎ মনে পড়লো। গণ্ডগোলটা আর কিছু না, আগের দিনের ঝড়। বিপদে রয়েছে ওরা। নড়তে ইচ্ছে হলো না। বাতাস তাজা। গায়ে পরশ বোলাচ্ছে যেন ভোরের কাঁচা রোদ। বেশ আরাম। মাথার নিচে হাত দিয়ে চিত হয়ে থেকে ভাবতে শুরু করলো সে।

কি করেছে ওমর ভাই? তার জায়গায় সে নিজে হলে কি করতো? ওদেরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি, কারণ ঝড় আসছিলো, বিমানটাকে বাঁচানোর জন্যে শেষে মুসা আর ডজকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে। অবশ্যই ফিরে আসবে আবার। ঝড়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা, ভাবতেই পারলো না কিশোর। এত সহজে মরবে না। যে কোন মুহূর্তে এখন ফিরে আসতে পারে।

চোখ মেললো সাগরের হাসি। উঠে বসে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। লেগুনের দিকে ফিরলো। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। বলে উঠলো, 'সর্বনাশ! কারনেস!'

লাফিয়ে উঠে বসলো কিশোর। লেগুনে ঢোকার প্রণালী দিয়ে ঢুকছে স্কুনারটা। ঝড়ে পড়েছিলো, অবস্থা দেখেই বোঝা যায়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত। একটা পালও আস্ত নেই। কারনেসের হোয়াইট শার্ক, কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত জাহাজটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো কিশোর, কি করবে? ঝিনুকের পা ধরে ঝাঁকানি দিলো, 'এই ঝিনুক, ওঠ।'

উঠে বসলো ঝিনুক। জাহাজটা দেখে দূর হয়ে গেল ঘুম। ভয় দেখা দিলো চোখে।

'নড়ো না,' হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'হয়ত আমাদেরকে দেখেনি। এসেছে কোন কারণে। আমাদের না দেখলে চলে যাবে শীঘ্রি।'

মাথা নাড়লো ঝিনুক। 'না, যাবে না। ঝড়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষতি হয়েছে জাহাজের। এখানে থেমে মেরামত করবে।'

'ঠিক,' সাগরের হাসি বললো। 'না হলে আসছে কেন?'

'নিশ্চয় পানি আর খাবারের খোঁজে,' কিশোর বললো। দ্রুত একবার চোখ বোলালো দ্বীপটায়। লুকানোর জায়গা খুঁজলো। 'চল, ওদিকটায় চলে যাই।' নারকেল কুঞ্জের অন্য পাশটার কথা বললো সে।

উঠে দাঁড়াতে গেল সাগরের হাসি আর ঝিনুক। বাধা দিলো কিশোর। কারনেসের চোখে পড়ে যেতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ওরা কুঞ্জের দিকে। ভেতরে বালির একটা ঢিবি আছে। তার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকলে জাহাজ থেকে দেখা যাবে না।

গাছপালার ভেতরে ঢুকেই উঠে দাঁড়ালো কিশোর। দৌড় দিলো ঢিবির দিকে।

ওটার আড়ালে আসার আগে পেছন ফিরে তাকালো না একবারও। বসে হাঁপাতে হাঁপাতে তাকিয়ে দেখলো লেগুনে ঢুকে পড়েছে জাহাজটা। নোঙর ফেলছে। ডেকে লুটোপুটি খাচ্ছে ছেঁড়া পাল। ওগুলো মাড়িয়েই হাঁটাচলা করছে নাবিকেরা। কারনেসের গলাকাটা সাগরেদের দল। হুইল ধরে থাকতে দেখা গেল কারনেসকে।

কিছুই করার নেই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া। তা-ই করলো কিশোর আর দুই পলিনেশিয়ান। কিশোর ভাবছে, কারনেস কি করবে? আশা করলো, একটুক্ষণ থেকেই নারকেল নিয়ে চলে যাবে জাহাজটা। তবে যতই সময় যেতে লাগলো, নিরাশ হতে থাকলো সে। ডেকটা যতটা সম্ভব গোছগাছ করলো নাবিকেরা। তার পর ডিঙি নামানোর আদেশ দিলো কারনেস। পানির ওপর দিয়ে স্পষ্ট ভেসে আসছে তার কণ্ঠ। ডিঙি নামানো হলো। তাতে চড়ে বসলো কারনেস আর দুই সাগরেদ। দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে কিশোর। 'কপালে মনে হয় দুঃখ আছে আমাদের। কারনেস নিশ্চয় অনুমান করেছে, এই দ্বীপের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে মুক্তোর খেত। দ্বীপে নেমে ঝিনুকের খোসাগুলো দেখলে শিওর হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে, যে আমরাও উঠেছি দ্বীপে। খুঁজতে শুরু করবে।'

জবাব দিলো না সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক। তাকিয়ে রয়েছে।

তীরে নামলো কারনেস। চোখ বোলালো দ্বীপের লেগুনের দিকের অংশটায়। পরিত্যক্ত ক্যাম্পটা চোখে পড়লো। দাঁতের ফাঁকে সিগার। কি ভেবে এগিয়ে গেল কয়েক পা। থামলো। দেখলো। আবার এগোল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলো একটা জিনিস। ঝিনুকের খোলা। এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছে কিশোর।

ব্যস, হয়ে গেছে কাজ! অস্বস্তি বেড়ে গেল কিশোরের। ক্যাম্প দেখতে পেয়েছে কারনেস। ঝিনুকের খোলা পেয়েছে। ওটা কিভাবে কিজন্যে খোলা হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হবে না পাকা মুক্তো শিকারীর।

হাত নেড়ে দুই সঙ্গীকে ডাকলো কারনেস। ওরা কাছে এলে খোলাটা দেখালো।

ঘন্টাখানেক দ্বীপে থাকলো ওরা। তারপর ফিরে গিয়ে উঠল ডিঙিতে। জাহাজের দিকে রওনা হলো। তীর থেকে একশ গজ দূরে নোঙর করা হয়েছে।

আশা হলো আবার কিশোরের। তীরে নেমে ক্যাম্প আর ঝিনুকের খোলা পাওয়ার পরেও যখন কিছু করেনি, আর করবে না। ফিরে যাবে কারনেস।

কিন্তু নড়লো না জাহাজটা। নোঙর তোলার কোন লক্ষণই নেই। জাহাজ আর পাল মেরামতে ব্যস্ত নাবিকেরা। যতই সময় যাচ্ছে উৎকণ্ঠা বাড়ছে কিশোরের। বিমানটা কখন এসে হাজির হয় কে জানে। তাহলে শুরু হবে বড় রকমের গণ্ডগোল।

সারাটা দিন গেল। পশ্চিমে ঢলতে শুরু করলো সূর্য। তখনও দেখা নেই বিমানের। আসেনি বলে বরং স্বস্তিই বোধ করছে কিশোর। ভালই হয়েছে। কারনেস চলে যাওয়ার পর আসুক। তাহলে অহেতুক গোলমাল এড়ানো যাবে।

কিন্তু জাহাজটার নড়ার কোন লক্ষণই নেই।

ঝিনুকের দিকে ফিরলো কিশোর। 'আচ্ছা, ছোট একটা নৌকায় করে এখান থেকে রাটুনায় যেতে কতোক্ষণ লাগবে?'

এক মুহূর্ত ভাবলো ঝিনুক। 'একদিন। বড় জোর দু'দিন।'

জাহাজের পাশে বাঁধা ডিঙিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওই নৌকাটা হলে?'

ঝিনুক জানালো, রাতের বেলা রওনা হতে পারলে পরদিন গিয়ে তার পরদিন সকালে রাটুনায় পৌঁছতে পারবে। পথ চিনে যেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলো না কিশোর। সে নিশ্চিত, একটুও ভুল না করে চলে যেতে পারবে সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক।

'তাহলে,' ঘোষণা করলো যেন কিশোর। 'রাতে কারনেসরা ঘুমিয়ে পড়লে নৌকাটা চুরি করবো আমরা।'

কিশোরের কথা শুনে খুব খুশি সাগরের হাসি আর ঝিনুক। উত্তেজনা ফুটলো চেহারায়। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো ডিঙিটার দিকে, যেন ওটা মহামূল্যবান একটা বস্তু।

ভাবছে কিশোর, ডিঙি চুরি করাটা কিছুই না। অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে যেতে পারবে ওটার কাছে। তারপর বাঁধন খুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেই হল। ভয় একটা আছে অবশ্য, হাঙরটার। ওটা এখনও লেগুনে রয়েছে কিনা কে জানে। সারা দিনে একবারও ওটার পাখনা দেখা যায়নি যদিও। তবু থাকতে পারে। কিছু করার নেই। ডিঙিটা পেতে চাইলে ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

এখানকার গোধূলি খুব সংক্ষিপ্ত। এসেই চলে যায়। সেদিনও গেল। অন্ধকার নামলো। একটামাত্র আলো জ্বলছে জাহাজে। নাবিকদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রইলো কিশোর। অন্ধকারে এখনও যেতে পারে, ডেকের ওপর দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কিন্তু বলা যায় না। বেরিয়ে আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে অযথা বিপদে পড়ার কোন মানে হয় না।

কোন শব্দ নেই জাহাজে। ডেকে একবারের জন্যেও আর কেউ আসেনি। সারাদিন খেটেছে নাবিকেরা। সন্ধে হতে না হতেই তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে দাঁড়াল কিশোর। চাঁদ ওঠেনি এখনও। তবে তারার আলো আছে। আকাশটাকে লাগছে বিশাল এক গম্বুজের মতো। ভেতরের দিকে যেন ঝুলে রয়েছে তারাগুলো।

সাগরের হাসির দিকে ফিরে বললো সে, 'একসাথে সবার যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। তুমি নারকেল কুড়িয়ে নাও, যত বেশি পার। আমি আর ঝিনুক গিয়ে নৌকাটা নিয়ে আসি।'

লেগুনের কিনারে চলে এলো ঝিনুক আর কিশোর। পানিতে পা দিলো। কোমর পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করলো। অন্ধকারে পানির ওপরে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে জাহাজটা। কালো বিশাল একটা ভূতুড়ে অবয়ব। নিঃশব্দে সাঁতরে চললো দু'জনে।

আলোটার দিকে কিশোরের চোখ। ওটা কারনেসের কেবিন। সে জেগে থাকতে পারে। হয়ত বসে বসে মদ গিলছে। খোলা বাতাসের জন্যে বেরিয়ে আসতে পারে। বলা যায় না। সতর্ক থাকা দরকার। ওকে দেখলেই ডুব মারতে হবে।

মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে ডিঙিটা। নীরব হয়ে আছে জাহাজ। কোন শব্দ নেই। কেউ বেরোচ্ছে না ডেকে। ডিঙির কাছে পৌঁছে আস্তে হাত দিয়ে খামচে ধরল সে ওটার কিনারা। কান পেতে রইল। না, কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। আস্তে করে দু'হাতের সাহায্যে টেনে তুললো নিজেকে। ডিঙির পাটাতনে নামতে গিয়ে পড়লো নরম কিছুর ওপর। ভয়ানক চমকে গেল সে। নরম জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছে। মানুষ!

ডিঙিতে ঘুমিয়েছে লোকটা। অন্ধকারে কোন ফাঁকে নেমেছে ও, ঢিবির আড়ালে বসে দেখতে পায়নি কিশোর। জেগে গেল লোকটা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো। জাপটে ধরলো কিশোরকে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো কিশোর। কিন্তু অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে। তাকে পেড়ে ফেলে গলা টিপে ধরলো। ছটফট করতে লাগলো কিশোর। বাতাসের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ফুসফুস। কানে আসছে অনেক লোকের চেঁচামেচি। ডেকে বেরিয়ে এসেছে নাবিকেরা।

আরেকবার ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করলো কিশোর। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগলো চোয়ালে। হাজারটা তারা জ্বলে উঠলো যেন মাথার ভেতরে। জ্ঞান হারালো সে।

বেশিক্ষণ অচেতন থাকলো না। হুঁশ ফিরলে দেখলো ডেকে পড়ে আছে। প্রায় চোখের কাছে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে।

চোখ মেলতেই তার দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসলো কারনেস। 'ওঠ ওঠ।' নরম গলায় ডাকলো সে। কিশোরের মনে হলো বেড়ালের ঘড়ঘড়ে স্বর বেরোল লোকটার গলা দিয়ে।

উঠে বসলো কিশোর। এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে কল্পনাই করতে পারেনি। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে এখনও। মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করলো। সে একাই ধরা পড়েছে? নাকি ঝিনুকও? তবে পালিয়ে গেলেও বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না। সকাল হলেই ধরা পড়তে হবে।

'আবার তাহলে দেখা হলো, অ্যাঁ?' দাঁত বের করে হাসলো কারনেস।

জবাব দিলো না কিশোর।

'তোমার দোস্তরা কোথায়?' শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলো কারনেস।

'জানি না,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর।

'মিছে কথা বলবে না বলে দিলাম!'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, মিথ্যে বলছি না। ঝড়ের সময় হারিয়ে গেছে ওরা। দ্বীপের নিচে একটা গুহার ভেতরে আটকা পড়েছিলাম আমি। হাঙর ঢুকেছিলো গুহায়। ওটার জন্যে বেরোতে পারছিলাম না। সকালে বেরিয়ে দেখি, নেই। জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার জন্যে তখন নারকেল গাছে চড়ে বসে রইলাম।'

এমন ভঙ্গিতে বলেছে কিশোর, বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো কারনেস। মসৃণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'অনেক মুক্তো পেয়েছে, না?'

'অল্প কিছু,' অস্বীকার করার কোন কারণ দেখতে পেলো না কিশোর। 'বেশি তুলতে পারিনি। একটা সোর্ডফিশ প্লেনের তলা ফুটো করে দিয়েছিলো। ডুবুরির

সাজসরঞ্জাম সব পানিতে ফেলে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি আমরা।'

'মুক্তোগুলো কোথায়?'

'ওদের কাছে।'

'খেতটা কোথায়, জান?'

'মোটামুটি।'

'ঠিক আছে। সকালে আমাকে দেখাবে।'

'আচ্ছা।' কথা দিলো বটে কিশোর, তবে দেখাবে কিনা ভাবতে হবে। আসলে সময় চাইছে সে। এখনই কারনেসের বিরোধিতা শুরু করে মার খেতে চায় না।

কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করলো কারনেস। ইচ্ছে করেই চোখা মাথাটা তুললো কিশোরের দিকে। হুমকি দেয়ার জন্যে। বললো, 'সাবধান, চালাকির চেষ্টা করবে না। তাহলে কি করবো জানো? দিয়ে দেব তোমাকে। আমার সাগরেদদের হাতে। ওরা নিয়ে গিয়ে জবাই করবে। কেটে মাংস খাবে তোমার। অনেক দিন মানুষের মাংস খায় না। পেলে খুব খুশি হবে।'

কিশোরকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো কারনেস।

প্রায় টেনেহিঁচড়ে কিশোরকে নিচে নামিয়ে আনলো দু'জন নাবিক। একটা ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো ওরা। বোঁটকা গন্ধ। গন্ধেই চিনতে পারলো কিশোর, এই ঘরেই বন্দী করে রাখা হয়েছিলো ঝিনুককে।

বারো

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে কিশোরের। দপদপ করছে চোয়ালের যেখানটায় ঘুসি খেয়েছে। তার পরেও ঘুম এলো।

ওপরে ডেকে চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। আঞ্চলিক ভাষায় অনর্গল কথা বলছে নাবিকেরা। মুখ খারাপ করে গালাগাল করছে কারনেস। কাকে, কেন, কিছুই বোঝা গেল না। গোল একটা ফুটো দিয়ে আলো আসছে। ভোর হয়ে গেল? অবাকই লাগলো কিশোরের। ঘুম কত দ্রুত সময় পার করে দেয়।

বাইরের করিডরে পায়ের আওয়াজ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দু'জন নাবিক ঘরে ঢুকলো। আগের রাতে যারা কিশোরকে এখানে রেখে গেছে তারা। দু'দিক থেকে এসে চেপে ধরলো তাকে। আবার টেনে নিয়ে চললো ওপরে।

ডেকে পায়চারি করছে কারনেস। কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। পিচিক করে থুথু ফেললো ডেকের ওপরেই। ধীরে ধীরে এগোল শিকারি বেড়ালের মত। হাতের আঙুল একবার খুলছে, একবার মুঠো করছে। 'তোমার সাথে দ্বীপে আর কে ছিল?' লোহা ঘষলো যেন শিরিষ দিয়ে এমনই কণ্ঠস্বর।

চুপ করে রইলো কিশোর।

ফেটে পড়লো কারনেস। 'কে নৌকা চুরি করেছে?'

লম্বা দম নিলো কিশোর। তাহলে এই ব্যাপার। ডিঙিটা নেই। নিশ্চয় তাকে

ধরে আনার পর ফিরে এসেছিলো ঝিনুক। নৌকাটা নিয়ে চলে গেছে। আশা হলো মনে। তবে সেটা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিলো না। কিন্তু তার পরেও কি করে যেন বুঝে ফেললো কারনেস। ঠাস করে চড় মারলো।

মাথা সরানোরও সুযোগ পায়নি কিশোর। আরেকটু হলেই উল্টে পড়তো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছলো সে।

'আর কে ছিলো তোমার সাথে?' আবার গর্জে উঠলো কারনেস।

আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। লাভ হবে না। নৌকা যখন চুরি হয়েছে, কেউ না কেউ ছিলোই দ্বীপে এটা বুঝে ফেলেছে কারনেস। অস্বীকার করে অযথা মার খেতে হবে। বললো, 'ঝিনুক।' মনে মনে আশা করলো, এতক্ষণে নিশ্চয় সাগরের হাসিকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে ঝিনুক।

তীব্র ঘৃণা দেখা দিলো কারনেসের চোখে। শুঁয়াপোকার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় মানুষ সেভাবে তাকালো কিশোরের দিকে। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলতে চায় যেন। 'ওই নোংরা কানাকাটা!' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে করসিকান। 'কোথায় গেছে?' এত জোরে চিৎকার করে উঠলো সে, চমকে গেল কিশোর। পিছিয়ে গেল এক পা।

'গেলে রাটুনাতেই গেছে, আর কোথায়।'

আকাশের দিকে নজর চলে গেল কারনেসের। তার মনে কি ভাবনা চলেছে অনুমান করতে পারলো কিশোর। রাটুনায় পৌছার আগেই নৌকা-টাকে ধরতে পারবে কিনা ভাবছে সেকথা। পারবে না। এক বিন্দু বাতাস নেই। সাগরের পানিও লেগুনের মত শান্ত, এক বিরাট আয়নার মত লাগছে। এক রত্তি মেঘ নেই আকাশে। বাতাস যে আসবে তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সেটা বুঝে আরও রেগে গেল কারনেস। মাথায় আগুন ধরছে তার, বুঝতে পারছে কিশোর। ভয় পেয়ে গেল। এখন বেফাঁস কিছু করে বসলে মরতে হবে।

কিশোরের গলা চেপে ঠেলতে ঠেলতে মাস্তুলের কাছে নিয়ে গেল কারনেস। ছুরি বের করে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'আমার সঙ্গে চালাকির মজা দেখাচ্ছি!'

মাথা গরম করলো না কিশোর। গলায় চাপ রয়েছে। ফ্যাসফ্যাস করে কোনমতে বললো, 'আমাকে মেরে ফেললে মুক্তোর খেতটা আর খুঁজে পাবেন না।'

দ্বিধা করলো কারনেস। গলার চাপ বাড়িয়েই আবার ঢিল করে ফেললো। কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো এক পা। 'হ্যাঁ, মুক্তো। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।' ফিরে তাকিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় আদেশ দিলো নাবিকদেরকে।

লোকটাকে যে কি ভীষণ ভয় পায় সেটা নাবিকদের আচরণেই বোঝা গেল। লংবোট নামাতে দৌড়ে গেল ওরা। দেখতে দেখতে নামিয়ে ফেললো জাহাজের পাশে পানিতে। তাতে চড়ে বসলো ছ'জন লোক, দাঁড় তুলে নিলো।

'এসো আমার সঙ্গে,' কিশোরকে বললো কারনেস। ওরা উঠলে দাঁড় বাইতে শুরু করলো লোকগুলো। তীরে পৌছলো।

অবাক হয়ে কিশোর ভাবছে, কি করবে লোকগুলো? একটু পরেই বুঝতে পারলো। ঢেউয়ের সঙ্গে যে ঝিনুকগুলো তীরে এসে পড়েছে, সেগুলো কুড়াতে

এসেছে ওরা। অনেক ঝিনুক পড়ে থাকতে দেখলো কিশোর। শুকনোয় তো আছেই, পানিতেও আছে। অল্প পানিতে ছেয়ে রয়েছে লেগুনের নিচে। তবে ওগুলোর প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করলো না সে। চারজন লোক ঝিনুক কুড়িয়ে এক জায়গায় করছে, একজন বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলছে নৌকায়। ছয় নম্বর লোকটা নারকেল কুড়াচ্ছে।

কিশোরকে নিয়ে ক্যাম্পের কাছে চলে এলো কারনেস। যেখানে যা পেলো, কাজে লাগার মত, তুলে নিতে আরম্ভ করলো। অভিযাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। মাঝে মাঝে কথা বলছে কিশোরের সঙ্গে, প্রশ্ন করছে। পারলে জবাব দিচ্ছে কিশোর।

তাড়াহুড়া করছে কারনেস। কেন, সেটা বুঝতে পারলো কিশোর। কারনেসের ভয়, ঝিনুক পালিয়েছে। গিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে। তাই পালাতে চাইছে কারনেস, লেগুন থেকে বেরিয়ে দূরে চলে যেতে চাইছে।

পাথরের নিচে, শ্যাওলার ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে কারনেস। নীল আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে সূর্য। বেলা যতই বাড়ছে, গরমও বাড়ছে। নিরাসক্ত চোখে তার কাজকর্ম দেখছে কিশোর। সে একটা কথাই ভাবছে, কি করে পালাবে। কিন্তু কোন উপায়ই বের করতে পারছে না। এক কাজ করতে পারে। দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। চলে যেতে পারে দ্বীপের নিচের সেই গুহায়। তবে তাতে হাঙরের ভয় আছে। আর কারনেসের লোকেরাও যে গুহাটা খুঁজে বের করতে পারবে না তা নয়। তার ওপর রয়েছে গুলি খাওয়ার ভয়। সে দৌড় দিলেই কোমর থেকে রিভলভার নিয়ে গুলি চালাবে কারনেস। গুহায় ঢোকার ভাবনাটা বাতিল করে দিলো সে।

একটা পাথরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কারনেস। ওটার নিচেই মুক্তোর টিনটা লুকিয়ে রেখেছিল ডজ । এইবার কিছুটা আগ্রহী হলো কিশোর। পাথরের চারপাশে শ্যাওলার স্তূপ জমে রয়েছে। টেনে টেনে কিছু সরালো কারনেস। কিছু সরালো পা দিয়ে। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে এই সময় একটা জিনিস চোখে পড়লো তার।

ধক্ করে উঠলো কিশোরের বুক। মনে হলো হৃৎপিণ্ডের গতিই বুঝি থেমে যাবে। এত গরমেও ঠাণ্ডা শিহরণ জাগলো শরীরে। চিকণ ঘাম দেখা দিলো কপালে। জিনিসটা সে-ও দেখতে পেয়েছে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে টিনের একটা অংশ। সেই বিস্কুটের টিনটাই, চিনতে অসুবিধে হলো না তার। ওপরের বালি অনেকখানি ধুয়ে নিয়ে গেছে পানি, ফলে বেরিয়ে পড়েছে টিনটা।

কিশোর আশা করলো, দেখতে পেলেও টিনটা ছোঁবে না কারনেস। কারণ পুরনো একটা জিনিস বালিতে দেবে রয়েছে, কোন মূল্য নেই ওটার। কিন্তু কারনেসের কাছে আছে। এখানে কিশোরদের আনা জিনিস যা-ই পাচ্ছে তুলে নিচ্ছে লোকটা। কি করবে আল্লাহই জানে। লাথি দিয়ে টিনের ওপরের বালি আরও সরালো কারনেস। তারপর টেনেটুনে বের করে আনলো ওটা বালির নিচ থেকে। ওই সময় একবার কিশোরের মুখের দিকে তাকালেই তার কাছে ফাঁস হয়ে যেত ব্যাপারটা। কারণ একেবারে শাদা হয়ে গেছে তার মুখ।

টিনের অবস্থা দেখে পছন্দ হলো না কারনেসের। ছুঁড়ে ফেলে দিলো। হাঁপ

ছাড়তে যাচ্ছিলো কিশোর, ছাড়া আর হলো না। টিনের মুখটা হয় ঠিকমত লাগেনি, নয়তো জোর ঝাঁকুনিতে গেল খুলে। ছড়িয়ে পড়লো ওটার ভেতরের জিনিস।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন কারনেস । ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো জিনিসগুলোর দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরই জোরে এক চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলো। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মুক্তোগুলোর কাছে। কাঁপা হাতে তুলে রাখতে শুরু করলো আবার টিনের মধ্যে। একবার তাকালো কিশোরের দিকে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। ঘামছে দরদর করে। দৌড়ে এলো তার সাগরেদরা। উত্তেজিত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় কিচির মিচির করে কি বলতে লাগলো ওরা বুঝতে পারছে না কিশোর।

অসহায় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। টিনটা যে কেন ফেলে গেছে ডজ,মাথায় ঢুকছে না কিশোরের। এত কষ্ট করলো ওরা ওগুলোর জন্যে, সব শেষ, কোনই লাভ হলো না। এসব জিনিসের লোভ নেই তার, নির্দ্বিধায় ওই একটিন মুক্তো দান করে দিতে পারে, কিন্তু এখন তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কারণটা আর কিছু না, অভিযানের ব্যর্থতা। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। রাগ হতে থাকলো ডজের ওপর, আর কারনেসের প্রতি তীব্র ঘৃণা। ওই মুহূর্তে বুঝতে পারলো কেন এসব মূল্যবান রত্নের জন্যে মানুষ মানুষকে খুন করে।

কারনেস মুক্তোগুলো পাওয়ার খানিক আগে ঝিনুকের প্রথম চালানটা নিয়ে রওনা হয়েছিলো লংবোট। জাহাজের কাছে পৌঁছে গেছে। দু'জন লোক গেছে সঙ্গে। চিৎকার করে জানতে চাইলো, কি হয়েছে। তীর থেকে জানালো ওদের সঙ্গীরা। দ্রুত ঝিনুকগুলো ডেকে ছুঁড়ে ফেলে নৌকা নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

অনেক ঝিনুক পড়ে রয়েছে এখনও। সেগুলো তোলার নির্দেশ দিল কারনেস। লোকটার লোভ দেখে আরও তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। এতগুলো মুক্তো পেয়েছে, তার পরেও আরও পাওয়ার লোভে ঝিনুক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ বোঝাই করে মুক্তো দিয়ে দিলেও হবে না, আরও চাইবে, আরও।

নিজে দাঁড়িয়ে ঝিনুক তোলা দেখতে লাগল কারনেস। তদারক করছে। কোনটা বাকি রয়ে গেল কিনা দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে। কিশোরের গম্ভীর হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, খুব মজা পাচ্ছে যেন। ক্ষোভ, রাগ সব দূর হয়ে গেছে তার। খোশমেজাজে আছে। একবার জিজ্ঞেস করলো, 'এগুলো যে আছে বলনি কেন?'

'জানতাম না।'

কণ্ঠের তিক্ততা চাপতে পারলো না কিশোর। তাতে আরও মজা পেল লোকটা। হেসে উঠলো। 'অনেক কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিলো তোমার বন্ধুরা। এতগুলো মুক্তো রেখে গেল।' কিশোরের দিকে একটা ডাব ছুঁড়ে দিলো সে। ছুরি দিয়ে আরেকটা ডাবের মুখ কাটলো নিজে খাওয়ার জন্যে।

ডাবটা দেখে পিপাসার কথা মনে পড়লো কিশোরের। কারনেসের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে মুখ কাটতে লাগলো। গলা শুকিয়ে গেছে।

শেষ ঝিনুকটা যখন নৌকায় তোলা হলো, পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে তখন সূর্য। নৌকায় উঠলো দাঁড়ীরা। যার যার জায়গায় বসলো। কিশোর ভাবলো, তাকে ফেলেই চলে যাবে কারনেস। তাতে বরং খুশিই হবে কিশোর। কারণ ওমররা ফিরে আসবেই। কিন্তু তাকে নিরাশ করলো কারনেস। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। এক ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। নৌকায় ওঠার ইশারা করলো।

উঠলো গিয়ে কিশোর। তার পেছনেই বসলো কারনেস। নৌকা ছাড়তে বলার আগে শেষবারের মত সৈকতে চোখ বোলালো সে, কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখলো। আরেকবার ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই তার। নৌকা ছাড়তে বললো সে।

জাহাজের দিকে এগিয়ে চললো নৌকা। একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে কিশোর। সারাটা দিন বিমানের অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে এই বুঝি এলো, এই বুঝি এলো। শব্দ শোনা গেল। কিন্তু এলো না ওটা। এখন রাত হয়ে আসছে। আজ আর আসবে না বিমানটা। এলেও আগামী দিন।

জাহাজের গায়ে এসে ভিড়লোনৌকা। ডেকে উঠতে বলা হলো কিশোরকে। উঠলো সে। সাগরের দিক থেকে ধেয়ে এলো একঝলক বাতাস। আলোড়ন তুললো লেগুনের পানিতে। মৃদু দুলতে লাগলো জাহাজ। আনন্দে চিৎকার করে উঠলো কারনেস। তার খুশির কারণ বুঝতে পারলো কিশোর। প্রকৃতিও যেন কারনেসের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। প্রথমে পাঠিয়েছে ঝড়, মুক্তোগুলো দ্বীপে ফেলে রেখে বিমানটাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। সেগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে কারনেসকে। এখন পাঠিয়েছে বাতাস। স্কুনারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পরদিন ওমররা আসতে আসতে অনেক দূরে চলে যাবে ওটা। ধরার আর কোন উপায়ই থাকবে না হয়তো।

মুক্তোর টিনটা বগলে চেপে নিচে চলে গেল কারনেস। ফিরে এলো একটু বাদে। ওটা ছাড়া। অন্য কোন পরিকল্পনা ছিলো হয়ত তার, বাতাস আসায় সেটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিচু গলায় নির্দেশ দিতে আরম্ভ করল তার নাবিকদের। ওরা ফিরে তাকালো কিশোরের দিকে। ওদের দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। নিশ্চয় তার ব্যাপারেই কিছু আলোচনা হয়েছে।

'আমার জাহাজটা তোমার পছন্দ হয়নি,' কিশোরকে বললো কারনেস। 'ভাল কথা। এখানেই থেকে যাও। রেখে যাওয়া হবে তোমাকে।'

এতে বরং খুশিই হলো কিশোর। এটাই চাইছিলো। বললো না কিছু।

'তবে,' কারনেস বললো, 'অনেক কিছু জেনে ফেলেছ তুমি। বলে দিলে বিপদে পড়বো আমি। তাই যাতে বলতে না পার সেই ব্যবস্থা করে যাব।' আবার নাবিকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো। রওনা হয়ে গেল হুইলের দিকে।

ক্যাপস্টানের দিকে দৌড়ে গেল চারজন নাবিক। নোঙর তোলার সময় ঝনঝন করে উঠলো শেকল। দ্রুত কালো হয়ে আসা আকাশের পটভূমিতে দুলে উঠলো একটা শাদা পাল।

দু'জন নাবিক রয়ে গেল কিশোরের পাশে। ফুলে উঠলো পাল। লেগুনের মুখের দিকে রওনা হয়ে গেল জাহাজ। কি করতে বলা হয়েছে লোকগুলোকে?

সতর্ক নজর রাখলো কিশোর। রেখেও কিছু করতে পারলো না। জোর করে তাকে ধরে শুইয়ে ফেললো লোকগুলো। কারাত আর জুডোর সাহায্যে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করলো সে। কিছুই করতে পারলো না। অসম্ভব শক্তি লোকগুলোর গায়ে। চেপে ধরে রেখে সাহায্যের জন্যে ডাকলো অন্যদেরকে। একজন একটা দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধলো তার কোমর। আরেক মাথা বাঁধলো একটা লোহার পাইপের সঙ্গে। আতঙ্কিত হয়ে পড়লো কিশোর। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে।পানিতে ফেলে দেয়া হবে তাকে, হাত-পা বেঁধে। লোহার পাইপের ভার তাকে টেনে নিয়ে যাবে লেগুনের তলায়। কিছুতেই ভেসে উঠতে পারবে না ।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। দু'একজনের নাকে ঘুসিও মারলো। লাভ হলো না কিছু। এতগুলো শক্তিশালী হাত থেকে মুক্তি পেলো না। উপুর করে ফেলে মুচড়ে তার হাত নিয়ে আসা হলো পিঠের ওপর। দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। আরেকজন পা বেঁধে দিলো। শিকারীর হাতে অসহায় খরগোশ যেন সে, কিংবা কসাইয়ের কাছে ছাগল। বয়ে নিয়ে আসা হলো রেলিঙের কাছে। খিকখিক করে তার কানের কাছে হেসে উঠল একটা লোক। দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে তুলে দোলা দিয়ে তাকে রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো। ঝপাং করে পানিতে পড়লো সে।

পড়েও সারতে পারলো না। টেনে নিয়ে চললো তাকে লোহার পাইপ। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলো ছাড়া পাওয়ার জন্যে। সব দিক থেকে চেপে ধরতে শুরু করেছে যেন কালো পানি।

অবশেষে শেষ হলো নিচের দিকে টানা। তার মানে তলায় পৌঁছে গেছে লোহার পাইপ, বালিতে ঠেকেছে। চারপাশে শুধুই ঘন অন্ধকার।

তেরো

রাটুনাতেই রয়েছে ওমর, মুসা আর ডজ। কিশোরের মতো মারাত্মক বিপদে নেই ওরা, তবে অসুবিধেয় পড়েছে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোরদের জন্যে। উৎকণ্ঠাও খুব খারাপ জিনিস। শরীরের ওপর ভীষণ চাপ দেয়।

ওমর আশা করেছিলো লেগুনে থাকলে ঝড়ে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না বিমানটার। ভেবেছে, কিছু পাতাটাতা এসে পড়তে পারে, তাতে আর কি এমন হবে? কল্পনাই করতে পারেনি সে কতটা ক্ষতি হবে। প্রথমেই ধরা যাক, বড় একটা নারকেলের ডালের কথা। তুমুল গতিতে উড়ে এসে একটা ডানার ওপর আছড়ে পড়েছে ওটা। যদিও খসে যায়নি ডানাটা, তুবড়ে গেছে। ওড়া অসম্ভব, যতক্ষণ না ওটা মেরামত হয়। আর শুধু পাতাই যে কি করতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঝড়ের মধ্যে উড়ে এসে বৃষ্টির মত অঝোরে ঝড়ে পড়েছে যেন। হারিকেন শেষ হতে হতে পাতার নিচে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল বিমানটা।

সেই পাতা সরানোই এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। সরিয়ে বেরোনোর পথ তো পরিষ্কার হলো, কিন্তু তীরে যাবে কি করে? পানির ওপরে পাতার স্তর এতটা পুরু

নয় যে ওদের ভার রাখতে পারবে। হেঁটে যাওয়া যাবে না। আবার সাঁতরে যাওয়াও মুশকিল। একটা কাজই করা যায়। চারপাশ থেকে লতাপাতা জোগাড় করে ফেলে ফেলে একটা সাঁকোমত তৈরি করে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। পাতা ঠেলে সাঁতরে যাওয়ার চেয়ে সেটা কোন অংশেই সহজ মনে হলো না ওদের কাছে।

রাত হয়ে গেল। তীরে পৌছতে পারলো না ওরা। বিমানের মধ্যে বসে বসে একটা বিনিদ্র রাত কাটাতে হলো ওদের। কিশোরদের ভাবনা না থাকলে এতটা কষ্ট পেতে হতো না। শরীরের কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্ট অনেক বেশি। তবে শারীরিক কষ্টও কিছু কম হলো না। বিমানটা যেখানে নেমেছে তার কাছেই রয়েছে একটা খাঁড়ি। তার ওপাশে জলাভূমি। সেখান থেকে এসে হাজির হলো মশার ঝাঁক। ছেঁকে ধরলো। কিছুই করার নেই ওগুলোর বিরুদ্ধে। মসকুইটো কয়েল কিংবা স্প্রে কোনটাই নেই বিমানে।

ভোরের আলো ফুটতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ওরা। মশার যন্ত্রণা অন্তত কমবে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। সাঁকো তৈরি শেষ হয়নি তখনও। ক্লান্ত শরীর নিয়েই কাজে লাগলো ওরা। অনেক কষ্ট আর কায়দা কসরৎ করে ভাসমান সেই পাতার সাঁকো দিয়ে এসে নামলো তীরে। রওনা দিলো গাঁয়ের দিকে। সেটাও কম দূরে নয়। পাঁচ ছয় মাইল তো হবেই। সাধারণ সময়ে ভালো রাস্তা পেলে ঘন্টা দুয়েকের পথ। কিন্তু গায়ে জোর নেই। তার ওপর ঘন জঙ্গল। জীবনে অনেক জঙ্গল দেখেছে ওমর, এত ঘন দেখেনি। প্রতিটি ইঞ্চি পথ লতাপাতা কেটে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তার ওপরে রয়েছে ভয়ংকর গরম। দ্রুত শরীরকে অবসন্ন করে দেয়।

শত শত মশার কামড়ের দাগ একেকজনের শরীরে। দিনের বেলা এখন জঙ্গলে হামলা চালালো এক ধরনের মাছি, স্যাণ্ড ফ্লাই। কামড়ে ভীষণ জ্বালা। রক্ত বেরিয়ে যায়। এতো বাধার পরেও এগোনো থেমে থাকলো না। তবে পানির কিনার থেকে পোয়াটাক মাইল পেরোনোর পরেই এমন আরেকটা বাধা পড়লো সামনে, দিশেহারা হয়ে গেল ওমর।

একটা নদীর মুখ। নদী না বলে সাংঘাতিক জলাভূমি বললেই ঠিক হয়। পাহাড়ের গোড়ায়। যদি খালি পানি থাকতো, তেমন অসুবিধে হত না। সাঁতরে পেরিয়ে গেলেই চলতো। একশ গজের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু পানিতে জন্মে রয়েছে কচুরীপানা। বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। অন্য সময় হলে বরং মুগ্ধই হতো ওমর, দেখে চোখ জুড়াতো। এখন সে অবস্থা নয়। ঘন হয়ে জন্মানো শুধু কচুরীপানা পেরোনোই এক অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর তার ভেতরে যদি থাকে এক ফুট লম্বা হাজার হাজার বিষাক্ত শতপদী তাহলে তো কথাই নেই। না যায় সাঁতরানো, না ওপর দিয়ে হেঁটে পেরোনো।

স্তব্ধ হয়ে কয়েক মিনিট বসে রইলো ওখানে ওরা। কি করা যায়? সরাসরি পার হওয়ার আশা ছাড়তেই হলো। জলার পাশ দিয়ে জঙ্গল কেটে ঘুরে এগোনো ছাড়া বিকল্প নেই। শেষে তা-ই করতে লাগলো। জানে না কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে জলাটা। তবে আশার কথা, কাছেই পাহাড় রয়েছে। উপত্যকার পরে যেখান থেকে

ঢাল শুরু হবে, সেখানে আর নদী থাকতে পারবে না। এটা অবশ্য ডজের অনুমান। ঠিকই অনুমান করেছে সে। আস্তে আস্তে সরু হয়ে আসছে নদী। শেষে এতই সরু হয়ে গেল, খাল বলা চলে এখন। তার পরেও পার হওয়া গেল না, শতপদীর ভয়ে। এগোতে থাকলো ওরা। যতটুকু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আর সরু হচ্ছে না নদী। অবশেষে ভাগ্য কিছুটা সদয় হলো ওদের ওপর। একটা জায়গায় ঝড়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে একটা রুটিফল গাছ, আর পড়েছে একেবারে খালের ওপর লম্বা হয়ে, এপার থেকে ওপারে যাবার সাঁকো তৈরি করে দিয়ে।

খাল পেরোলো ওরা। ততক্ষণে রাত হয়ে এসেছে। অন্ধকার নামতে দেরি নেই। সারাটা দিন কাটিয়ে জঙ্গলে ঘুরে মরে গাঁয়ের দিকে মাত্র একটা মাইল এগোতে পেরেছে।

সাঁকো পেরিয়ে এসে দেখলো, এখানকার জঙ্গলও একই রকম ঘন। রাতে এগোনো সম্ভব না। দিনের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু বসে থাকতে চাইলো না ওমর। বললো রাতেই চলবে। ডজ রাজি হলো না। সে এখানকার জঙ্গল চেনে। বললো সেই চেষ্টা করাটাই স্রেফ পাগলামি। সামনে অনেক বাধা থাকতে পারে। আরও জলা থাকতে পারে। চোরাকাদা থাকতে পারে। আর যদি কিছু না-ও থাকে, সারারাত পথ হারিয়ে অযথা ঘুরে মরতে হতে পারে বনের ভেতর।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে গেছে ওরা। গড়িয়ে পড়লো বনের ভেজা মটিতে। একধরনের অদ্ভুত ফাঙ্গাস জন্মে রয়েছে। অন্ধকারে জ্বলে। বাতাসে একধরনের সোঁদা গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে গেলে মনে হয় ফুসফুসে চাপ লাগছে। বিমানে থাকতে বন থেকে মশা গিয়ে হামলা চালিয়েছিলো, আর এখানে তো মশার রাজত্বেই এসে ঢুকেছে ওরা। কাজেই কামড়ানোর পরিমাণটা অনেক বেশি। ভয়াবহ আরেকটা রাত কাটাতে তৈরি হলো তিনজনে।

'এখন বুঝতে পারছি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো ওমর। 'মুক্তো কেন এত দামী।' দুহাতে একনাগাড়ে চাপড় মারছে শরীরের যেখানে সেখানে।

রাত বাড়তেই মশার অত্যাচারও এতই বেড়ে যেতে লাগলো যে আগুন জ্বালাতে হলো ওদেরকে। ধোঁয়ার ভেতরে গা ডুবিয়ে বসতে হলো। সেই ধোঁয়ার ঝাঁজে পানি এসে গেল চোখে, গলার ভেতরে জ্বালা ধরালো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো। মশার কামড়, না সেই ধোঁয়া কোনটা যে ভাল বোঝাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

'এতেও এত কষ্ট হত না,' ওমর বললো। 'হাসিমুখে সহ্য করে নিতাম, যদি জানতাম কিশোররা ভাল আছে।'

জবাব দিলো না ডজ কিংবা মুসা। খারাপ সম্ভাবনাগুলোই কেবল আসছে মনে। সেগুলো আর প্রকাশ করতে চাইলো না।

স্থির হয়ে আছে যেন সময়, কাটতেই চাইছে না। মাঝে মাঝে জলার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। শিউরে উঠছে। আলোজ্বলা ফাঙ্গাস ওখানেও আছে। নড়ছে চড়ছে থেকে থেকে। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। কোন প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ওপর দিয়ে। বনের ভেতর থেকে আসছে বিচিত্র ডাক, চলাফেরার আওয়াজ।

সেগুলো যে কিসের ডজও বলতে পারলো না। ধোঁয়ার ওপাশে উড়ছে বড় বড় মথ। ডানা মেলে দিয়ে উড়ছে, গিয়ে বসছে পাতার ওপর। নিঃশব্দে উড়ে এল একটা বিশাল বাদুড়। ড্রাকুলার গল্প পড়া আছে মুসার। ভূতের ভয়ে এমন এক চিৎকার দিলো, লাফিয়ে উঠলো ওমর আর ডজ। বাদুড়টাও চমকে গেল। কাছেই একটা গাছের ডালে গিয়ে ঝুলে রইলো।

এত অন্ধকারও আর কখনও দেখেনি মুসা। মনে হচ্ছে ভারি নিরেট কোন জিনিসের মত চেপে বসেছে ওদের ওপর। এত অত্যাচারের মাঝেও ঢুলতে শুরু করলো সে। দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। পায়ে কিসের ছোঁয়া লাগতে টুটে গেল তন্দ্রা। আগুনের আলোয় আতঙ্কিত চোখে দেখলো লালচে-বাদামী একটা শতপদী এসে পায়ে উঠেছে। দশ ইঞ্চি লম্বা। জুতোর ওপরে অনেকখানি উঠে এসেছে প্যান্ট। পায়ের সেই খালি জায়গাটায় উঠেছে ঘিনঘিনে প্রাণীটা। চিৎকার দিয়ে উঠে থাবা মেরে ওটাকে ফেলে দিলো সে। পায়ের চামড়ায় দেখতে পেলো দুটো লাল বিন্দু। দেখতে দেখতে ফুলে উঠলো জায়গাটা। অকল্পনীয় ব্যথা। ডজ বললো, কয়েক দিন ধরে থাকবে ব্যথাটা।

একনাগাড়ে পাইপ টেনে চললো ডজ। সমস্ত সিগারেট শেষ করে ফেললো ওমর।

'আল্লাহ, ভোর মনে হয় হচ্ছে,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'আর একটা রাত যদি এই জঙ্গলে কাটাতে হয়, সোজা পাগলা গারদে পাঠাতে হবে আমাকে। আগের বার এসে দক্ষিণ সাগরের এই দ্বীপগুলোকে মনে হয়েছিলো বেহেশত, এখন মনে হচ্ছে দোজখ।'

উঠে দাঁড়ালো ওমর। শক্ত হয়ে গেছে শরীর, নড়তেই চায় না। ঝাড়াঝুড়া দিয়ে হাত-পাগুলোকে সচল করলো। 'চল, রওনা হওয়া যাক।'

ভোর তখনও হয়নি। শুধু অন্ধকার ফিকে হয়েছে কিছুটা। এরই মাঝে বন কেটে এগোতে শুরু করলো ওরা।

গত দু'দিনে শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর সহ্য করতে পারছে না শরীর। বন থেকে বেরোতে যদি বেশি দেরি হয়, তাহলে আর বেরোতেই পারবে না। তবে বন আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখলো না ওদের। পাতলা হয়ে এলো। বাইরের খোলা অঞ্চলে বেরিয়ে ধপ করে বসে পড়লো মুসা। চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বালিতে। চারপাশে তাকাচ্ছে ডজ। পানি খুঁজছে। একপাশে জলা ছাড়া পানির আর কোন উৎস চোখে পড়লো না। সেই জলার পানি ছুঁয়েও দেখলো না। গিজগিজ করছে জীবাণুতে। খেলেই মরবে।

কয়েক মিনিট শুয়ে বিশ্রাম নিলো ওরা। তারপর উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে ওমর বললো, 'আর বেশিক্ষণ লাগবে না। গাঁয়ের কাছে চলে এসেছি। গিয়েই পানি খেতে পারব।'

পা টেনে টেনে এগিয়ে চললো তিনজনে। প্রথম নারকেল গাছটার গোড়ায় এসেই দাঁড়িয়ে গেল। ঝড়ে অনেক নারকেল পড়ে রয়েছে। তর সইলো না আর। খেতে বসে গেল। প্রথমে খেল পানি, তার পরে শাঁস। লোভীর মত।

গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মুসা। তাকিয়ে রয়েছে সামনের

দিকে। সে কি দেখেছে দেখার জন্যে অন্য দু'জনও তাকালো। ঘন গাছের আড়ালে ছায়ার মত মিশে যেতে দেখলো একজন আদিবাসীকে। ঝিনুকদের গাঁয়ের মানুষের চেয়ে অন্য রকম মনে হলো লোকটাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শাদা চক কিংবা কাদা দিয়ে অদ্ভুত সব দাগ আঁকা।

'আমার ভাল্লাগছে না,' বিড়বিড় করে বললো ডজ। 'কিছু একটা ঘটছে এখানে।'

'কি ঘটছে?' জানতে চাইলো ওমর।

'লোকটাকে দেখলে? কেমন রঙ মেখেছে। যুদ্ধের সাজ। হাতের মুগুরটাও লড়াইয়ের সময় ব্যবহার করে। বহু দেখেছি ওরকম। আইনের বিরুদ্ধ কাজ এটা। তার পরেও লেগে যায় ওরা।' ডজের কথার সমর্থনেই যেন দিড়িম দিড়িম করে ঢাক বেজে উঠলো। কয়েকবার বেজে থেমে গেল। দূর থেকে শোনা গেল আবার। থামলো। বিরতি দিয়ে আবার বেজে উঠলো এপাশে। 'শুনছো? মেসেজ পাঠাচ্ছে। সংবাদ আদান প্রদান করছে। আমরা এখান থেকে যাওয়ার পর নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে, যার ফলে খেপে গেছে লোকগুলো। আমাদের ওপর এখন কোন কারণে খেপে না গেলেই হয়। তাহলে সোজা ধরে কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেলবে।'

'এখন তো আর নরখাদক নয় ওরা,' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

তার দিকে তাকালো ডজ। 'জোর দিয়ে বলতে পার না। কেউ স্বীকার করে না বটে। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোকে অবশ্য বাদ দেয়া যায়। তবে বুড়োগুলোকে বিশ্বাস নেই। মানুষের মাংসের লোভ আছে ওদের। আগে খেয়েছে তো। কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রেখেছে ওদেরকে ঠেকানোর জন্যে। তার পরেও বলা যায় না।'

'ওসব ভেবে লাভ নেই,' ওমর বললো। তবে গলায় জোর নেই তার। 'চল, গিয়ে দেখি কি হয়েছে।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন আদিবাসী। ওদের ঠিক সামনে। দু'জনের গায়েই রঙ মাখা, হাতে মুগুর। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো অভিযাত্রীদের দিকে, তারপর ছুটে পালালো।

গাঁয়ে এসে ঢুকলো অভিযাত্রীরা। কোন পুরুষমানুষ চোখে পড়লো না। শুধু দু'তিনজন মহিলা। ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে না আর।

সব চেয়ে বয়স্ক মহিলাটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। জিজ্ঞেস করলো, 'গাঁয়ের লোক কোথায়?'

জবাব দিলো না মহিলা। আরেক দিকে মুখ ফেরালো।

ঝোপের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো তখন ওমর, 'অশান্ত সাগর, আমি জানি আপনারা কাছাকাছিই আছেন। আমাদের ওপর চোখ রাখছেন। বেরিয়ে আসুন।'

ঝোপ ফাঁক করে বেরিয়ে এল একটা ছিপছিপে শরীর। এক তরুণ। শাদা রঙ দিয়ে বন্ধনী আঁকা হয়েছে কপালে। সারা শরীরে দাগ।

বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ওমর। 'ঝিনুক, তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি,' এগিয়ে এলো ঝিনুক।
'যুদ্ধ ঘোষণা করেছ কার বিরুদ্ধে?' ডজ জিজ্ঞেস করলো।
'ওই শয়তানটার।'
'কোন শয়তানটার?'
'গুড্ডু কারনেস।'

চোদ্দ

দম ফুরিয়ে এসেছে কিশোরের। মৃত্যু অবধারিত। ছটফট করছে না আর মুক্তি পাওয়ার জন্যে। লাভ নেই। ভাবছে, মরতে কি খুব কষ্ট হবে? কতোক্ষণ লাগবে প্রাণ বেরোতে?

হালকা একটা ছোঁয়া লাগলো শরীরে। চমকে উঠলো সে। হাত চেপে ধরলো নরম আরেকটা হাত। না না হাত আসবে কোথা থেকে? হাতের মত কিছু। হয়ত অকটোপাসের শুঁড়। এসে গেছে তাহলে খুন করার জন্যে! ভাল। সরে গেল চাপটা, পেটের কাছে। হাত বুলিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছে কোনখান থেকে খাওয়া শুরু করবে। খুঁজে পেলো কোমরে পেঁচান দড়িটা, যেটার সঙ্গে লোহার পাইপ বাঁধা রয়েছে। তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে যেন পোঁচাতে শুরু করলো দড়িতে।

ফুসফুসের বাতাস প্রায় শেষ। আর কয়েক সেকেণ্ড টিকবে বলে মনে হয় না। দড়িটা কাটা হয়ে গেল। তার হাতের বাঁধনে পোঁচ মারা শুরু হলো এবার। অলৌকিক কাণ্ডই হোক আর যা-ই হোক, কার কাজ বুঝতে পারলো সে। মানুষ। ছুরি দিয়ে প্রথমে পাইপের দড়ি কেটেছে, এখন হাতেরটা কাটছে। পায়েরও কেটে দেয়া হলো। ওঠার কথা আর বলতে হলো না কিশোরকে।

ওপরে ভেসে হাঁ করে বাতাস টানতে লাগলো কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে অন্ধকারেও দেখতে পেলো আরেকটা মাথা ভেসে উঠেছে তার পাশে। 'কে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

ফিসফিস করে জবাব এলো, 'আমি, সাগরের হাসি।'

'তুমি! যাওনি?'

'না। চল, ডাঙায় চল। কারনেস দেখে ফেলবে।'

তীরে এসে উঠলো দু'জনে। চলে এলো নারকেল গাছের আড়ালে।

'তুমি এলে কোত্থেকে?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর।

'আমি যাইইনি। এখানেই ছিলাম।'

'কোথায়?' কিশোর অবাক।

'কারনেসের জাহাজে। পালের নিচে লুকিয়ে ছিলাম।'

আনমনে মাথা নাড়লো কিশোর। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে মুক্তি পেয়ে যাবে। 'ঝিনুক কোথায় তাহলে?'

'রাটুনায় চলে গেছে।'

'কিন্তু জাহাজে গেলে কি করে তুমি? উঠলে কখন?'

'তুমি ধরা পড়তেই ডুব দিয়ে সরে এলো ঝিনুক। আমাকে বললো। সাঁতরে

গিয়ে লুকিয়ে জাহাজে উঠলাম, দেখতে লাগলাম তোমাকে নিয়ে কি করে ওরা। ওরা ঘুমাতে যাওয়ার পরেও জাহাজ থেকে নামলাম না। রাতে নৌকা নিয়ে চলে গেল ঝিনুক। আমাকে থাকতে বলে গেল। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে।'

'ভাগ্যিস থেকেছিলে! নইলে এতোক্ষণে শেষ হয়ে যেতাম!'

হেসে উঠলো সাগরের হাসি। জানালো, 'ঝিনুক লোক নিয়ে ফিরে আসবে। অশান্ত সাগরকে বলে অনেক যোদ্ধা নিয়ে আসবে, বলে গেছে। এবার আর ছাড়বে না কারনেসকে। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে সে।'

'ও চলেই গেছে, না?' অন্ধকার সাগরের দিকে তাকালো কিশোর। জাহাজটা চোখে পড়লো না।

'হ্যাঁ। ঝিনুক এসে ওকে খুঁজে বের করবে।'

'কারনেসের জাহাজে রয়েছে ওরা?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো ওমর। 'মুশকিল হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো মুসা। 'জাহাজ থেকে কিশোর আর সাগরের হাসিকে উদ্ধার করা কঠিনই। কারনেস মেরেই ফেলে কিনা ওদেরকে কে জানে!'

'কি করা যায়, বল তো?' ওমরের দিকে তাকালো ডজ। 'নৌকা নিয়ে গিয়ে জাহাজটাকে ধরা যাবে না।'

'বিমানটা নিয়ে যেতে হবে।'

'কি করে? মেরামত করতেই তো অনেক সময় লেগে যাবে। ততোক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে কারনেস।'

'উড়তে পারবো না, কিন্তু ট্যাক্সিইং করে যেতে অসুবিধে কোথায়? পাতার দঙ্গল থেকে ওটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে খোলা পানিতে ফেলতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

'তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি।'

অভয় পেয়ে বেরিয়ে এসেছে গাঁয়ের লোকে। যুদ্ধে যাওয়ার আর দরকার নেই, ওদেরকে বোঝাল ওমর। অশান্ত সাগরকে অনুরোধ করলো, কিছু লোক দিতে, যাতে নৌকা নিয়ে গিয়ে বিমানটাকে সরিয়ে আনতে পারে। ওটার চারপাশের জঞ্জাল সাফ করে দিতে পারলেই হলো, এর বেশি আর কিছু করা লাগবে না।

খুশি হয়েই লোক দিলো অশান্ত সাগর। ওদেরকে নিয়ে রওনা হলো আবার ডজ, ওমর আর মুসা। তবে অবশ্যই খাওয়া-দাওয়ার আর খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর। তাদের সঙ্গে চললো ঝিনুক।

বনের ভেতর দিয়ে গেল না আর। অত্যন্ত দুর্গম পথ, বললো অশান্ত সাগর। পারতপক্ষে ওই বনে কেউ ঢুকতে চায় না, একথাও জানালো। সৈকতে চলে এলো দলটা। সাথে এসেছে তিরিশজন অদিবাসী, সবাই যুদ্ধের সাজে সেজেছে। ঝিনুকের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে চেয়েছিলো। যেতে পারলো না বলে কিছুটা নিরাশ হয়েছে যেন।

কয়েকটা ক্যানুতে চড়লো সবাই। যুদ্ধে যেতে পারেনি তাতে কি হয়েছে, আরেকটা বিশেষ কাজ তো করতে যাচ্ছে। সেটাকে লড়াইয়ের সামিল ধরে নিলো

বোধহয় যোদ্ধারা, দাঁড় বাইতে বাইতে বিচিত্র ভাষায় সুর করে যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে চললো।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিমানের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পাতার দঙ্গল যতই পুরু হোক, এতগুলো মানুষের কাছে টিকতে পারলো না বেশিক্ষণ। পরিষ্কার করে ফেলা হলো আশপাশের অনেকখানি জায়গা। তারপর বিমানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তিনটে ক্যানু টেনে সরিয়ে আনলো ওটাকে পরিষ্কার পানিতে।

রাত হয়ে গেল কাজ সারতে সারতে। পুরোপুরি অন্ধকার। কিন্তু ভোরের অপেক্ষায় আর থাকতে চায় না ওমর। তখুনি রওনা দেবে ডজ আইল্যাণ্ডে। তার পরিকল্পনার কথা খুলে বললো সে। বড় একটা শক্ত ক্যানু বাঁধা হলো বিমানের পেছনে। দশজন আদিবাসীকে উঠতে বলা হলো তাতে। ঝিনুক ও আরও চারজন আদিবাসী সহ মুসা আর ডজকে নিয়ে বিমানে উঠলো ওমর। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো খোলা সাগরের দিকে। টেনে নিয়ে চললো ক্যানুটাকে।

চাঁদ উঠলো। নারকেল কুঞ্জের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর আর সাগরের হাসি। দ্বীপের সেদিকটায় চললো যেখানে থেকে সাগরের অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালো। ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো কিশোরের বুক। লেগুন থেকে সাগরে বেরোনোর মুখটার কাছে রয়েছে স্কুনারটা। যায়নি। থেমে আছে। ওদের কাছ থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে।

ঝপ করে বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লো সাগরের হাসি। 'কারনেস ফিরে এসেছে!' ফিসফিস করে বললো সে।

কিশোরও বসলো তার পাশে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। এটা আশা করেনি।

একটা চিৎকার উঠলো জাহাজে। যতই লুকাক, চোখে পড়ে গেছে ওরা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাগরের হাসি। 'দৌড় দাও! যত জোরে পার!' চিৎকার করে বললো কিশোর। বলেই ছুটলো।

পেছনে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল। কাছেই একটা প্রবালের চলটা তুলে দিয়ে বিইইং করে সাগরের দিকে উড়ে গেল বুলেট। ফিরেও তাকালো না কিশোর। আবার গুলি হলো। কয়েক গজ দূরে আরেকটা প্রবালের চলটা তুললো বুলেট। চাঁদের আলোয় ছুটন্ত নিশানার গায়ে গুলি লাগানো সহজ নয়।

কয়েকটা নারকেল গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দু'জনে। তাকালো জাহাজটার দিকে। নোঙর তুলে ফেলেছে ওটা। প্রণালী দিয়ে লেগুনে ঢুকেছে।

কিছু দূর এগিয়ে লেগুনের শান্ত পানিতে এসে আবার থামলো জাহাজ। লংবোট নামাতে ব্যস্ত হলো নাবিকেরা। চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে কারনেস। ভীষণ রেগে গেছে সে। এবার ধরতে পারলে গুলি করে মারবে, কোন সন্দেহ নেই।

কি করা যায়? ভাবতে শুরু করলো কিশোর। নৌকা নিয়ে দ্বীপে পৌঁছতে দেরি হবে না লোকগুলোর। ধরে ফেলবেই। তবে যতক্ষণ দেরি করিয়ে দেয়া যায়। সকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে, আর ওদের কপাল ভাল হলে ওমর ভাই এসেও যেতে পারে। কিংবা লোকজন নিয়ে ঝিনুক। দ্বীপের সরু অংশটায় রয়েছে ওরা। চওড়া দিকটায় যাবে বললো সাগরের হাসিকে। ছুটলো। ওদিকে উঁচুনিচু অনেক

টিলাটক্কর রয়েছে। লুকানোর জায়গা মিলতে পারে।

গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটছে দু'জনে। যাতে গুলি করতে না পারে কারনেস। ঝড়ে নানারকম জঞ্জাল এনে ফেলেছে বালিতে। নারকেল পাতা, শ্যাওলা, ঝিনুকের খোসা। সেসবের জন্যে কঠিন হয়ে যাচ্ছে দৌড়ান। কিন্তু কোন কিছুই ঠেকাতে পারলো না ওদেরকে। চলে এলো দ্বীপের চওড়া দিকটায়। বেশ উঁচু একটা টিলা রয়েছে ওখানে। ঢালের গায়ে মিশে থেকে আস্তে মুখ বাড়িয়ে তাকালো কিশোর। দেখলো, পৌঁছে গেছে লংবোট। টেনে সৈকতে তুলছে নাবিকেরা। রাইফেল বগলে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারনেস।

'চলেই তো গিয়েছিল,' বিড়বিড় করে বললো কিশোর। 'আবার ফিরে এলো কেন ব্যাটা?'

চুপ করে রইলো সাগরের হাসি।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। এই দ্বীপে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। জায়গাই নেই তেমন। নারকেল গাছে চড়ে বসে থাকতে পারে। বড়জোর রাতটা টিকতে পারবে তাতে। আলো ফুটলেই চোখে পড়ে যাবে। জ্যান্ত নামার আর সুযোগ পাবে না তখন। গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে গাছ থেকে। লুকানোর আরেকটা জায়গা হলো দ্বীপের নিচের গুহাটা। ওতে লুকালে হয়তো কয়েকদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, যদি নাবিকেরা ডুব দিয়ে খুঁজতে না আসে। ওখানে লুকানোর সব চেয়ে বড় বিপদ হল হাঙর। ঝড়ের সময় ঢুকেছিলো। এখনও লেগুনেই আছে, না বেরিয়ে গেছে? থাকলে ওদেরকে ধরলো না কেন? কয়েকবার তো লেগুনে নামতে হয়েছে ওদেরকে। থাকুক না থাকুক, ওখানেই গিয়ে লুকানোর সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর। কারনেসের হাতে ধরা দিলেও মরতে হবে। তার চেয়ে গুহায় ঢোকার ঝুঁকিটাই নেয়া যাক। ভাগ্যে যদি থাকে হাঙরের পেটে যাওয়া, ঠেকাতে তো আর পারবে না।

কিন্তু এগোতে গিয়ে থমকে গেল সে। কি করে আন্দাজ করেছে কারনেস, কে জানে। কিংবা এমনিই হয়তো একজন লোককে পাহারায় রেখেছে ওদিকটায়, যেদিক দিয়ে গুহায় যেতে হয়। অন্যখান দিয়ে পানিতে নেমেও যাওয়া যায়। তবে যেদিক দিয়েই যাক, চাঁদের আলোয় কারনেসের লোকের চোখে পড়ে যাবেই ওরা।

কিশোরের মত একই ভাবনা চলেছে সাগরের হাসির মাথায়। বললো, 'নারকেল গাছে চড়তে হবে। তার পর সুযোগ বুঝে চলে যাব গুহায়। সকাল হতে দেরি আছে। অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

তা ঠিক। টিলার পাশ দিয়ে চলে এলো দু'জনে একটা নারকেল কুঞ্জের ভেতরে। দু'জনে দুটো গাছ বেছে নিয়ে চড়তে শুরু করলো।

কিশোরের অনেক আগেই উঠে গেল সাগরের হাসি। পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসলো। একেবারে মিশে গেছে। কিশোরও দেখতে পাচ্ছে না। ভালমত আলো না ফুটলে তাকে বের করতে পারবে না কারনেসের লোকেরা।

সাগরের হাসির মত একই ভাবে পাতার আড়ালে ঢুকলো কিশোর। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন পুরো দ্বীপটা। খোঁজাখুঁজি করছে নাবিকেরা। রাইফেল হাতে পায়চারি করছে কারনেস।

ওদের গাছের নিচে চলে এলো একজন। ওপরের দিকে তাকাল। কিশোরের ভয় হতে লাগলো দেখে ফেলবে। পা বাড়াতে গিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠলো লোকটা। ধক করে উঠলো কিশোরের বুক। দেখে ফেললো? না। বসে পড়েছে লোকটা। পায়ের পাতা উল্টে দেখার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ভাঙা শামুকে পা কেটে গেছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে গেল লোকটা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো কারনেস। 'চেঁচালে কেন?'

'পা কেটে ফেলেছি।'

'ওরা কোথায়?'

'দেখিনি।'

'হুঁ। যাবেটা কোথায়? দিনের বেলা খুঁজে বের করবো।'

একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসলো কারনেস। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে সিগারেট ধরালো। খুঁজেই চলেছে তার লোকেরা।

ধীরে ধীরে মাথার ওপরে উঠল চাঁদ। ঢলতে শুরু করল পশ্চিমে। মলিন হয়ে আসছে জ্যোৎস্না। কিশোরের মনে হচ্ছে বড় বেশি দ্রুত যেন ডুবতে চলেছে চাঁদটা। কেটে যাচ্ছে রাত। অনেকবার বিপদে পড়েছে জীবনে। রাত যেন তাড়াতাড়ি কাটে সেই প্রার্থনা করেছে তখন। আজ করতে লাগলো, না কাটার জন্যে। কারণ রাত ফুরিয়ে গেলেই মরতে হবে।

পনের

কিছুক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিলো কিশোরের। বিমানটা আসছে ভেবে বার বার আকাশের দিকে তাকিয়েছে। কিছুই চোখে পড়েনি। কারনেসকেও চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখেছে। কয়েকবার করে পাথরের ওপর থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েছে।

আরও বাড়লো শব্দ। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলো ওটাকে। পুব আকাশে তখন ভোরের আলোর আভাস। আকাশ দিয়ে নয়, জলপথে ছুটে আসছে বিমানটা। ট্যাক্সিইং করে।

এইবার আর স্থির থাকতে পারলো না কারনেস। একজনকে পাঠালো জাহাজে, কিসের শব্দ দেখে আসার জন্যে। দরকার হলে যেন মাস্তুলে চড়ে দেখে, সেকথাও বলে দিলো।

দাঁড় বাওয়ার জন্যে আরেকজন নাবিককে সঙ্গে করে রওনা হলো লোকটা। লংবোট নামিয়ে তাতে চেপে বসলো। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল জাহাজে। মাস্তুলে ওঠা আর লাগলো না তার। জাহাজের ডেক থেকেই দেখতে পেলো বিমানটাকে। চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। আঞ্চলিক ভাষায় চেঁচিয়ে জানালো কারনেসকে কি দেখতে পেয়েছে।

নৌকা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো কারনেস।

ফিরে এলো লংবোট। তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে গিয়ে তাতে চাপলো

কারনেস। জাহাজে গিয়ে উঠলো। দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখলো বিমানটাকে। পেছনের ক্যানুতে বসা লোকগুলোকেও দেখলো। প্রমাদ গুণলো সে। বুঝতে পারলো সামনাসামনি লড়াইয়ে পারবে না ওদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলো সে।

লেগুনের মুখের কাছে যাওয়ার আগেই পৌঁছে গেল বিমানটা। নারকেল গাছ থেকে নামলো না কিশোর আর সাগরের হাসি। ওখানে বসে বসেই সমস্ত ঘটনা দেখতে লাগলো।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। গুলি করতে করতে জাহাজের দিকে এগিয়ে এলো বিমান। কারনেস এতই ভয় পেয়ে গেছে, গুলি চালানোর কথাও যেন ভুলে গেল। তার লোকেরা গিয়ে ঢুকেছে জাহাজের খোলে। আদিবাসীদের যুদ্ধের সাজই ঘাবড়ে দিয়েছে ওদেরকে। তাছাড়া জেনে গেছে অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বিমানে। শুধু কারনেসের একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওদেরকে। তাছাড়া লোকবলও বেশি বিমানের। ফলে যা করার তাই করেছে ওরা। লুকিয়েছে গিয়ে।

জাহাজের কাছে চলে এলো বিমান। দড়ি খুলে ক্যানুটাকে নিয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে ভেড়ালো আদিবাসীরা। উঠে গেল জাহাজে।

মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল, ডেকে তুলে আনা হয়েছে কারনেসের গলাকাটা ডাকাতদের। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হলো।

কিন্তু পালের গোদাটা গেল কোথায়? খুঁজছে কিশোরের চোখ। দেখতে পেলো। জাহাজের পাশের একটা দড়ি ধরে ঝুলে রয়েছে, পেছন দিকটায়। পানির একেবারে কাছাকাছি। তবে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারলো না। আদি-বাসীদের চোখে পড়ে গেল।

'ধর! ধর!' কলরব উঠলো। দড়ি থেকে হাত ছেড়ে দিলো কারনেস। পড়লো পানিতে। সাঁতরাতে শুরু করলো তীরের দিকে।

এই সময় পাখনাটা ভেসে উঠতে দেখলো কিশোর। লেগুনের পানি কেটে দ্রুত ছুটে চলেছে ত্রিকোণ পাখনাটা, পালের মতো উঁচু হয়ে আছে। হাঙর! ছুটে যাচ্ছে কারনেসের দিকে। যেন ওরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো এতোক্ষণ ওটা। তাহলে কিশোররা যখন পানিতে নেমেছিলো তখন ছিল কোথায়? নিশ্চয় গুহার ভেতরে, ভাবলো কিশোর, এর আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

জাহাজে যারা রয়েছে তারাও দেখতে পেয়েছে। একসঙ্গে হৈ চৈ করে উঠলো ওরা। অনেক পরে দেখতে পেলো কারনেস। আতঙ্কে বিকট চিৎকার করে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত পা ছুঁড়ে তীরে পৌঁছার চেষ্টা করলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তীর অনেক দূর।

তার কাছে চলে এসেছে হাঙরের পাখনা। ডুবে গেল। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে নিচে ডুবে গেল কারনেসের মাথা। আবার ভাসলো। চিৎকার করে উঠলো। আবার ডুবলো। ভাসলো। চিৎকার। ডুবলো।

অপেক্ষা করে রয়েছে দর্শকেরা। কিন্তু আর ভাসতে দেখা গেল না তাকে।

'উচিত সাজা হয়েছে!' পাশের গাছ থেকে বললো সাগরের হাসি।

কিশোর কিছু বলতে পারলো না। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। কারনেসের মত লোকেরও এই পরিণতি মেনে নিতে পারছে না সে। ভীষণ খারাপ লাগছে।

হৈ হৈ করে উঠল জাহাজে দাঁড়ানো আদিবাসীরা। চেঁচিয়ে বলছে, 'ঠিক হয়েছে! উচিত সাজা হয়েছে! শয়তানটাকে খেয়েছে ম্যাকো!'

বন্দিদেরকে লংবোটে নামাতে শুরু করলো ওরা। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো না কিশোর। সব ক'জনকে নামিয়ে নিজেরাও নেমে এলো ক্যানু আর লংবোটে। একজন বাদে। সে চলে গেল নিচে।

একটু পরেই বুঝতে পারলো, কেন জাহাজটা থেকে সবাইকে নামিয়ে আনা হয়েছে। শেষ লোকটাও বেরিয়ে এসে তাড়াহুড়া করে নৌকায় নামলো। সরে আসতে লাগলো দুটো নৌকাই। ক্যানু থেকে চেঁচিয়ে কিছু বললো ঝিনুক। বিমানটাও সরে আসতে লাগলো জাহাজের কাছ থেকে।

কারণটা বুঝতে পারলো এতক্ষণে কিশোর। ধোঁয়া দেখা গেল। জাহাজে। আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। গাছের মাথায় থেকেই চিৎকার করে বললো সে, 'ওমরভাই! জলদি! আগুন নেভাতে বলুন!'

কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দের জন্যেই বোধহয়, লোকের হট্টগোলের জন্যেও হতে পারে, তার চিৎকার কানে গেল না কারও। আগুন নেভাতে গেল না কেউ।

পিছলে গাছ থেকে নামতে গিয়ে দুই উরু ছিলে গেল কিশোরের। কেয়ারই করলো না। গোড়ায় নেমেই দিলো দৌড়। সৈকতের কিনারে পৌঁছতে পৌঁছতেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো অনেকখানি। ডেকের নিচে বোঝাই করা নারকেলের ছোবড়ায় নিশ্চয় আগুন লাগানো হয়েছে।

কিনারে এলে ডজকে যখন বোঝাতে সমর্থ হলো কিশোর, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত জাহাজে জড়িয়ে গেছে আগুন। ওটাতে এখন গিয়ে ঢোকা আর আত্মহত্যা করা সমান কথা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে ডজ। তার চোখের সামনে পুড়লো জাহাজটা, ডুবে গেল, কিছুই করলো না সে। একেবারে চুপ। পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন। চেয়ে চেয়ে দেখলো তার অত সাধের মুক্তোগুলো নিয়ে তলিয়ে গেল জাহাজটা।

কিশোরের কানে বাজতে লাগল ডজের কথাঃ যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে গেল মুক্তো, রাখতে আর পারলাম না।

পাশে এসে দাঁড়ালো সাগরের হাসি। এইমাত্র গাছ থেকে নেমে এলো।

নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্যাম্পের কাছে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে কিশোরকে জানালো ওমর আর মুসা, কেন আসতে দেরি হয়েছে ওদের।

কিশোর বলতে লাগলো, সে কি করে মরতে মরতে বেঁচেছে।

'খাইছে!' শুনতে শুনতে বলে উঠলো মুসা। 'সাগরের হাসি না থাকলে তো…'

'হ্যাঁ, না থাকলে এতক্ষণে হাঙরের পেটে চলে যেতাম।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলো কিশোর। 'কিন্তু এত কিছু করেও লাভ হলো না। যার জন্যে

এসেছিলাম তা আর নিয়ে যেতে পারব না। আগুনে পুড়ে নিশ্চয় চুণাপাথর হয়ে গেছে সব মুক্তো।'

'দুঃখ করে লাভ নেই,' যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিলো ওমর। 'মুক্তো তোলার জন্যে দরকার হলে আবার আসা যাবে, টাকাপয়সা জোগাড় করে। তবে যে অ্যাডভেঞ্চারটা হল, তাতেই আমি খুশি। এই একটিবার অন্তত আমার টাকা খোয়ানোর জন্যে একলা ডজকে দায়ী করতে পারছি না।' হাসলো সে। নিষ্প্রাণ দেখালো হাসিটা।

'কিসের কথা বলছেন?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সাগরের হাসি। একটু দূরে বসে ওদের কথা শুনছিলো।

'মুক্তো। যেগুলো তুলেছিলাম,' ওমর বললো। 'কিশোর বলছে, টিনটা পেয়ে গিয়েছিলো কারনেস। জাহাজে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলো। পুড়ে সব নষ্ট হয়েছে। আর পাওয়া যাবে না।'

'না, হয়নি,' সাগরের হাসি বললো।

'হয়নি!' একসাথে বলে উঠলো ডজ, ওমর আর দুই গোয়েন্দা।

'না, হয়নি। আমি নিয়ে এসেছি।'

'নিয়ে এসেছ!' ডজ বললো।

'কিভাবে?' জানতে চাইলো ওমর।

'জাহাজে উঠলাম,' বললো সাগরের হাসি। 'পালের নিচে লুকিয়ে রইলাম। কারনেস দলবল নিয়ে দ্বীপে গেল। একটু পরে ওদের চিৎকার শুনলাম, মুক্তোর টিনটা পেয়ে গেছে। ওটা নিয়ে ফিরে এলো জাহাজে। ডেকের একটা জানালা দিয়ে দেখলাম টিনটা কোথায় রাখছে কারনেস। ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলে এক সুযোগে জানালা দিয়ে ঢুকে চট করে নিয়ে চলে এলাম ওটা।'

'কোথায় রেখেছ?' উত্তেজনায় কাঁপছে ডজ।

'লেগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি,' শান্তকণ্ঠে বললো সাগরের হাসি।

চিৎকার করে উঠলো ডজ। 'শুনলে! কি বললো শুনলে! পানিতে ফেলে দিয়েছে!' চুল খামচে ধরলো সে। 'এজন্যেই। বুঝলে, এজন্যেই ফিরে এসেছিলো কারনেস। জাহাজ ছাড়লে কেবিনে গিয়ে টিনটা খুঁজে পায়নি। তার হয়তো সন্দেহ হয়েছে, দ্বীপে আরও কেউ আছে। যে টিনটা চুরি করেছে। সেটা নেয়ার জন্যেই ফিরেছিলো সে।'

সবাই উঠে দাঁড়ালো। তাদের ভাবভঙ্গিতে অবাক হলো সাগরের হাসি। তাকাতে লাগলো একেক জনের মুখের দিকে। মুক্তো নিয়ে এরকম করে বিদেশী মানুষ, ব্যাপারটা খুব বিস্মিত করে তাকে।

'হ্যাঁ, এই মুক্তোর জন্যেই ফিরে এসেছিলো কারনেস,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সাগরের হাসিও একমত হলো।

'তখন আমাকে বলনি কেন?'

'বলার সময় পেলাম কোথায়? আর...আর...'

'ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দাওনি, এই তো?'

'কোথায় ফেলেছ ওটা?' জানতে চাইলো ডজ।

দ্বিধা করলো সাগরের হাসি। 'আসুন, দেখাচ্ছি।'

আবার উত্তেজনা দেখা দিলো অভিযাত্রীদের মাঝে। আদিবাসীদের অনুরোধ করলো ডজ, ক্যানুটা দিতে। সেটাতে করে চলে এলো লেগুনের সেইখানটায় যেখানে নোঙর করে ছিলো হোয়াইট শার্ক। সবাই নিচে তাকাতে শুরু করলো। ওপর থেকেই দেখতে চায় লেগুনের তলায় কোথায় পড়ে আছে মুক্তোর টিনটা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরের হাসি। ডুব দিলো।

'হাঙরটা যদি আসে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'এলে ওটার কপালে দুঃখ আছে। মেয়েটার জন্যে ভাবছো তো। ভেবো না।'

দাঁড় বেয়ে ওদের সঙ্গে এসেছে ছয়জন আদিবাসী। তাদের মুখের দিকে তাকালো কিশোর। মনে পড়লো রাটুনায় অকটোপাস শিকারের কথা। বুঝতে পারলো, হাঙরটার কাপালে দুঃখ আছে কেন বলছে ডজ। সাগরের হাসির সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ছুরি হাতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা।

ভেসে উঠলো মেয়েটা। ঝাড়া দিয়ে চুল থেকে পানি ফেললো। 'দেখেছি,' বললো সে। মিনিট দুয়েক ক্যানুর ধার খামচে ধরে দম নিলো সে। তারপর লম্বা শ্বাস টেনে গভীর পানিতে ফুসফুসটাকে বেশিক্ষণ ডুবে থাকার উপযুক্ত করে আবার ডুব দিলো।

সবাই তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। টানটান উত্তেজনার মাঝে কাটতে লাগলো দীর্ঘ মুহূর্তগুলো। অবশেষে শেষ হল উত্তেজনা। ভাসলো আবার সাগরের হাসি। ডান হাতটা তুলে ধরলো। টিনটা বাড়িয়ে দিলো নৌকার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে টিনটা নিয়ে নিলো ডজ। খুলে ফেললো ডালা। ঝকঝক করে উঠলো মুক্তোগুলো। 'আছে! সবই আছে!' উত্তেজনায় খসখসে হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।

'পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে!' ওমর বললো। 'এই অভিযানের পর কোন ঘটনাকেই আর অসম্ভব মনে হবে না আমার কাছে!'

নৌকায় উঠলো সাগরের হাসি। হাঙরটা আসেনি। দেখাও যায়নি ওটাকে। হয়ত কারনেসকে দিয়ে ভূরিভোজের পর সাগরে বেরিয়ে গেছে। কিংবা আবার গিয়ে গুহায় ঢুকেছে ঘুমানোর জন্যে।

তীরে ফিরে এলো ক্যানু। টিনটা শক্ত করে ধরে রেখেছে ডজ। আর কোন ভাবেই এটাকে হাতছাড়া করতে চায় না।

'আর থেকে কি হবে,' ওমর বললো। 'রওনা হওয়া দরকার। রাতের আগেই ফিরে যেতে চাই রাটুনায়।'

বিমানে এসে উঠলো অভিযাত্রীরা। সাগরের হাসি আর ঝিনুকও উঠলো ওদের সঙ্গে। দুটো নৌকাকে বাঁধা হলো এখন বিমানের লেজের সঙ্গে। এত বোঝা টেনে নিতে অসুবিধে তেমন হবে না ওটার, তবে গতি কমে যাবে। কমুক। ভাবলো ওমর। তার পরেও ঠিক সময়ে ফিরে যেতে পারবে রাটুনায়, যদি আর ঝড়টড় না ওঠে। আকাশের দিকে তাকালো। ঘন নীল রঙ। মেঘের চিহ্নও নেই। সহসা আর হারিকেনের সম্ভাবনা নেই।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ওমর। চলতে শুরু করলো বিমান।

মিনিট পনের পরে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকালো কিশোর। নারকেলের পাতা দুলতে দেখলো বাতাসে। ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ওগুলো। ততক্ষণ চেয়েই থাকলো সে। অদ্ভুত এক বিষণ্নতায় ভরে গেছে মন। ভাবছে আর কোনদিন দেখতে পাবে না দ্বীপটা।

'আবার আসব,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'আবার ফিরে আসব এ দ্বীপে!'

তার কথাটা শুনে ফেললো ডজ। হাসলো। 'হ্যাঁ, এইই হয়। আশ্চর্য এক আকর্ষণ এসব দ্বীপের। কাছে টানে। কিছুতেই যেন এর মায়া কাটাতে পারে না মানুষ। বার বার ফিরে আসতে চায়।'

-ঃ শেষ ঃ-